কুশদহ

(কুশদহ সমিতির মুখপত্র।)

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।





কার্য্যালয়।

৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

——:•:——

নব পর্য্যায়, ১ম বর্ষ। | বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৵০ প্রতি সংখ্যা ৵০ | বৈশাখ, ১৩২৮, ১ম সংখ্যা।

"কুশদহ"র নিয়মাবলী।

১। "কুশদহ"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ২।৵০। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য তিন আনা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে বৈশাখ হইতে কাগজ লইতে হইবে। মূল্য "সম্পাদক, কুশদহ" এই নামে প্রেরিতব্য। নমুনার জন্য সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠান প্রয়োজন।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোনও মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের শেষ তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাক ঘরে ও পত্রিকা কার্য্যাধ্যক্ষকে জানান আবশ্যক।

৩। রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৪। "কুশদহ"র জন্য প্রবন্ধাদি—সাধারণতঃ কুশদহ সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারের অনুকূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কুশদহ সমিতির নিয়ম বিরুদ্ধ বিষয়ের কোনও প্রবন্ধ বা আলোচনা "কুশদহে" প্রকাশিত হইবে না।

৫। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা বা প্রসঙ্গ "কুশদহে" প্রকাশিত হয় না।

৬। অমনোনীত রচনা ফেরৎ চাহিলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

৭। পুরাতন গ্রাহকগণ যে কোনও পত্র লিখিবার সময় স্বীয় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৮। নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত।

৯। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে গ্রাহকনম্বর সহ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৌছান আবশ্যক।

'কুশদহ'র বিজ্ঞাপনের মূল্য।

১। মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা—

পূর্ণ পৃষ্ঠা—১২৲। ½ পৃষ্ঠা—৭৲। ¼ পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা।

২। মলাটের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা—

পূর্ণ পৃষ্ঠা - ১০৲; ½ পৃষ্ঠা ৬৲; ¼ পৃষ্ঠা ৩।০ টাকা।

৩। বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা—

১ পৃষ্ঠা	৬৲ টাকা।
½ ,,	৩।০ টাকা।
¼ ,,	২৲ টাকা।

৪। বিজ্ঞাপনের ফর্ম্মার ১ম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা—

১ পৃষ্ঠা	৭৲ টাকা।
½ ,,	৪৲ টাকা।
¼ ,,	২॥০ টাকা।

৫। উক্ত বিজ্ঞাপনের হার সমস্তই মাসিক।

৬। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৭। এক বৎসরের চুক্তিতে শত করা ৫৲ টাকা কম করা হয়।

৮। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

"কুশদহ"—কার্য্যাধ্যক্ষ

৮৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Cover Printed at the FINE ART PRESS, 2, Latoo Babu Lane, Calcutta.

কুশদহ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

নবপর্য্যায় ১ম বর্ষ।	বৈশাখ ১৩২৮।	১ম সংখ্যা।

সূচনা।

"কুশদহ" আবার প্রকাশিত হইল। পরম মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা সফল হউক। তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি।

"যে শক্তি এতদিন একাকী ছিল, আজ তাহা সমিতি যোগে বহুর মধ্যে বহুর সহিত মিলিয়া বিশেষ ভাবে বহুর বেদনা বহিয়া বিকাশ লাভ করিতে চাহিতেছে"—"কুশদহ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় তাঁহার "বিদায়" সম্ভাষণে এই কথা লিখিয়াছিলেন।

এই কথাই সত্য। সত্যেরই জয় সর্ব্বত্র। তাই আজ দশ বৎসরকাল ধরিয়া শ্রদ্ধাস্পদ যোগীন্দ্রনাথ তাঁহার ভগ্নকণ্ঠের অবিশ্রান্ত অস্ফুট চিৎকারধ্বনিতে দেশবাসীর কর্ণে জাগরণের মন্ত্র শুনাইয়া আসিতেছিলেন—শত দুঃখ, দৈন্য, বাধা বিঘ্ন, তাঁহাকে নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। তাঁহারই সেই অবিশ্রান্ত চিৎকারধ্বনি বুঝি আজ দেশবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে—তাঁহারই সেই অকান্ত পরিশ্রম ও শ্রমক্লান্তস্বেদবিন্দুপাত বুঝি সার্থক হইয়াছে।

তাঁহার সে শক্তি আজ বহুর সঙ্গে মিলিয়া নূতন মুর্ত্তিতে উষার অরুণালোকের ন্যায় সকল দিক ছাইয়া ফেলিয়াছে।

"অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করিবার জন্য" তিনি বিদায় লইয়াছিলেন। নবীন আশার আলোকে জাগ্রত দেশবাসী আত্মশক্তির উদ্বোধন দ্বারা আপন আপন কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হউন—সেই অপূর্ণতা দূর করুন। তাই "কুশদহ" নব পর্য্যায়ের ১ম সংখ্যায় কেবল সেই কথাই মনে পড়িতেছে।

[illegible] দিয়াছে আশার আলোক—নিরাশার ঘনতিমির ভেদ করিয়া তাহার রশ্মি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সেই নবজাগরণময় সুপ্তোত্থিত-প্রথম প্রভাতের সকল মঙ্গলময় বাণী—সকল আশা সাফল্যের সম্ভার—আজ [illegible] ও সেবার শিশিরবিন্দু বহন করিয়া—"কুশদহ" আবার আজ দেশবাসীর দ্বারে উপস্থিত।

নববর্ষ।

—•—

আজ নতুন বৎসরে পা দিয়ে নবপর্য্যায় "কুশদহ"র জন্য কিছু নতুন সংবাদ দিতে পারব কি? কিন্তু এ সংবাদ ত বাহিরের নয়—এ যে অন্তরাত্মার ভেতরকার কথা—কুশদহবাসী গ্রহণ করবেন কি? করুন আর না করুন, দেওয়ার হুকুম যার প্রতি আসে, সে দিয়ে খালাস, গ্রহণ করানোর কর্ত্তা সে নয়।

হে মানুষ, তুমি যে দিনরাত "আমি" "আমি" করছ একটু ভেবে দেখো তুমি একা "তুমি" নও। তুমি, কোটী কোটীর অংশ নিয়ে "তুমি"। এই দেখো আজ'নববর্ষ'কথাটা মনে হতেই তুমি যেখানেই থাকো না কেন, সেই বৎসর বৎসরের নতুন ভাবটী মনের দরজায় এসে হাজির। রাত পোহাতেই নহবতের আওয়াজ তোমার কাণে এসে লাগল! ঐ শোনো সাধক গান ধরেছেন—

"তোমারি নামে নয়ন মেলিনু
পুণ্য প্রভাতে আজি—"

কেন বলো দেখি, প্রাণের নিভৃত স্থান থেকে বলে উঠল "আজ নববর্ষ"—আর ঐ বাবদটার সঙ্গে সঙ্গে হুড় হুড় করে কত ভাব আসতে লাগল! কি নবজীবনের সাড়া পড়ে গেল! যেন উৎসব আরম্ভ হলো! যে এখনো ঘুমুচ্ছে সে বঞ্চিত হলো। কিন্তু যে চোখ চেয়ে দেখতে চাইছে, তার কাছে একি সংবাদ!—এ যে একটা ঝড়ের মত!

হে মানুষ, এই যে ভাবপ্রবাহ বলো আর জ্ঞান প্রবাহই বলো, কিম্বা শক্তির খেলাই বলো, বিশেষতঃ যা ঘটনার সঙ্গে, স্থানের, কালের সঙ্গে জমাট বেঁধে আছে তা' কি তোমার আমার সৃষ্টি করা? তা'ত নয়! এ সকল যে আমাদের পৈতৃক, বহু তপস্যায় অর্জ্জিত। একটা নতুন খাতা করলে তো তোমার চলে না, প্রতি বছর, প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেক দিনে তোমার নতুন খাতা, নতুন হিসাব করতে হয়! তুমি যে রোজের নতুন মানুষ হতে চাচ্ছ! রোজ রোজ টাট্‌কা ফুলে তোমাকে পূজায় আয়োজন করতে হয়। একটু চোখ চেয়ে দেখো তোমার ভিতরেই বহুর শক্তি রয়েছে। বহুর শক্তিতেই তোমার ব্যক্তিত্ব! তাই, তবে আজ "নববর্ষে" নতুন ব্রত গ্রহণ করো, আর পুরোণো মানুষ থেকো না। আমিত্ব, স্বামীত্ব, কর্ত্তৃত্ব—তুচ্ছ অহঙ্কার ছাড়, বহুর সঙ্গে আপনাকে দর্শন করো। এক কর্ত্তার মধ্যে সকলকে দেখে, সকলকে ভাই বলে গ্রহণ করো।

—পুরাতন ভৃত্য

—•—

আহ্বান।

—•—

ওই পোহাই'ছে নিশি,—
আলোকের রেখা ঐ ফুটে ওঠে দেখ চেয়ে দিশি দিশি।
আর ঘুমা'য়ো না ভাই,—
সুপ্রভাতের শুভ অবসরে নব জাগরণ চাই!
তিমির বিদারী আলোর অভ্যুদয়,
নব জীবনের নবীন বারতা কয়।

শোনো সেই মহাবাণী,
লাঞ্ছিত আর-ধিক্কৃত প্রাণে মুক্তির কথা জানি
হ'তে হ'বে সবে এক,
জাতীর জীবনে, এ যুগক্ষণে হ'তে হ'বে জয়যুক্ত;
জড়তার মোহ কর সবে পরিহার,
নব শক্তিতে হয়ে চল আগুসার।

ভোলো নিরাশার কথা,
ভোলো সবে ভাই অতীত বেদনা—শত লাঞ্ছনা ব্যথা—
আমরা মানুষ সব—
কেউ নই হীন, কেউ নই ছোট—এই কর অনুভব।
বক্ষে মোদের নব স্পন্দন জাগে,
চক্ষে মোদের আশার আলোক লাগে।

অমৃতের সন্তান
আমরা সবাই, কেন আর তবে সভয়ে প্রণতি দান!
পোহা'ল তিমির রাত্রি,—
নব জীবনের প্রভাতে আমরা নবীন পথের যাত্রী।
শুনেছি আমরা নূতন আশার কথা,
সকলের কাছে শুনাইব সে বারতা।

—শ্রীসরসীবালা বসু।

মুষ্টিযোগ।

প্রবন্ধের নামকরণ দেখিয়া ভীত হইবেন না। কারণ আমি মুষ্টিযোদ্ধাও নহি বা চিকিৎসকও নহি। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই—একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

এই প্রবন্ধে আমার প্রথম কথা হইতেছে যে, বর্ত্তমানে আমরা চাই কি? তাহার উত্তরে সকলেই বলিতে বাধ্য যে,—দুই বেলা দুমুঠা পেট ভরা অন্ন, নীরোগ দেহ ও সহজ সামাজিকতা রক্ষার জন্য উপযুক্ত বস্ত্র। যেখানে আশা আকাঙ্ক্ষার এমনই অবস্থা সেখানে লোকে ঐশ্বর্য্যের আসবাব সোণা দানা চাহিবে কোন্ মুখে? এই যে অন্নের কথা বলিলাম তাহা বর্ত্তমানে যে কত দূর দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্য কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। আট পয়সার চাউলের মণ এখন আট টাকায় উঠিয়াছে এবং মা লক্ষ্মীর দুর্লভতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদমণ্ডলীও আমাদের কাছে তেমনি দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছেন। অনেক বর্ণনাকুশল কবি ও সাহিত্যিক আজিও পল্লীগ্রামের কত গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, মাছভরা পুকুর, ক্ষেতভরা শাক সবজির কাল্পনিক বর্ণনায় আপন আপন কেতাব পরিপূর্ণ করিতেছেন। আমি কিন্তু এইরূপ সাহিত্যিক নহি এবং তাঁহাদের মত রসাল মনও আমার নহে; সুতরাং আমার এ প্রবন্ধে পল্লীবাসীর উচ্চ প্রশংসা থাকিবে না। বরং দু'চারিটা উল্টা বিশেষণ থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা!

একটা প্রবাদ বাক্য আছে—"আপন ভাল পাগলেও বুঝে"। কিন্তু বর্ত্তমান বাংলা পাগলেরও অধম হইয়া গিয়াছে, পাগল অপেক্ষাও বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া গিয়াছে। এমন নিশ্চেষ্ট দুঃখী, এমন জড় বুভুক্ষিত প্রাণী পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পড়িবে না অথচ নাটক নভেলের শ্রাদ্ধ করিবে; ইহারা কৃষিশিল্পবাণিজ্য বিষয়ক পত্রাদি পড়িবে না অথচ দৈনিক কাগজের রাজা উজিরের কথা লইয়া মাথা ফাটাফাটি করিবে। অর্থ উপার্জ্জনের কোনই উপযুক্ত চেষ্টা অবলম্বন করিবে না অথচ আদালত-কাছারি করিয়া বা অনাবশ্যক বিলাসের সওদা করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি আশ্রিতজনের বা দুঃস্থ প্রতিবাসীর অন্নমুষ্টির অংশ নাশ করিবে। বাড়ীর সামনের পুকুর (যাহাতে জ্ঞাতির অংশ আছে তাহা) মজিয়া পড়িয়া ব্যাধির বীজ ছড়াইয়া আমার পরিবারবর্গের ও প্রতিবাসীর সর্ব্বনাশ করুক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার পাশে আমার একটা নিজস্ব ব্যাঙে ভরা "ডোবা" চাই! কেননা ইহা না হইলে আমার অহং-দম্ভটা গাদায় পড়িয়া মাটী হইয়া যাইবে। বাংলার নীতি নিপুণেরা এবংবিধ বুদ্ধির নাম দিয়াছেন 'বিষয়বুদ্ধি।' আর এই বিষয়বুদ্ধির গুঁতায় শস্যশ্যামল বাংলা রুগ্ন ভিখারীর দলের হাঁসপাতালে পরিণত হইয়াছে। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি?

(ক) পুণ্যই কর, বা ধর্ম্মই কর বা মোক্ষই খোঁজ গোড়ার কথাটাই হইতেছে দেহ। সেই দেহ সক্ষম রাখিতে গেলে চাই খোরাক আর চাই অরোগতা। এখন বাংলায় খোরাক যেমন দুর্লভ, রোগও তেমনি মার মার শব্দে আপন অধিকার জাঁকাইয়া বসিয়াছে। প্রতিকারের উপায় কি? স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ মাত্রেই বলেন, বাংলায় জলের অভাব নাই কিন্তু ঐ জলের পানযোগ্যতার যথেষ্ট অভাব আছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বলকর খাদ্য-তালিকায় দুধ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে তাহার মৎস্যের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মৎস্য কোথায়? কলিকাতায় তবু ৮৹,৸৵৹ দিলেও একসের মৎস্য পাওয়া যায়, পল্লীগ্রামে তো তাহা মিলেনা। কালে তাহা হয়ত পল্লীবাসীর নিকট আভিধানিক শব্দে বা চিড়িয়াখানার দ্রষ্টব্য জীবে পরিণত হইবে! তাই আমি প্রস্তাব করি যে, পল্লীগ্রাম সমূহের পুকুরগুলির জলের পানযোগ্যতা বাড়াইয়া ব্যাধির বীজ মারিবার জন্য ও মৎস্যের চাষ করিয়া উহাকে পল্লীবাসীর নিকট সুলভ ও উহার বিক্রয় দ্বারা অর্থাগমের জন্য প্রতি গ্রামে একটা করিয়া "ধর্ম্মতহবিলের" প্রতিষ্ঠা হউক। এই ধর্ম্ম তহবিলের কর্ম্মকর্ত্তারা মজা পুকুর মেয়াদী পাটায় গ্রহণ করিয়া উহার পঙ্কোদ্ধার পূর্ব্বক মৎস্যের আবাদ করুন। ইহাতে আহার ঔষধ দুইই হইবে। পরে বর্ষ শেষে অংশানুযায়ী

মুনাফা বিভাগ করিলেই চলিবে। শ্রমজীবিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হউক এই কারবারে তাহারা যে চাঁদা দিবে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা তো তাহারা ঐসকল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে কর্ম্মকর্ত্তাগণের নিকট হইতে আদায় করিলেই উপযুক্ত ঐ কারবারে তাহাদের একটা স্থায়ী অংশও থাকিয়া যাইবে। এইরূপে উদ্ধৃত পঙ্ক হয় ক্ষেতে সারের কাযে লাগিবে না হয় নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ডোবার ভরাটে ব্যবহৃত হইবে। এইরূপে প্রতিবর্ষে যদি গ্রামস্থ ২।৪টা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় তাহা হইলে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই সমস্ত গ্রামের শ্রী ফিরিয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোকে গোয়ালন্দ হইতে মাছ আনিয়া ব্যবসা করিয়া টাকায় কুমীর হইয়া গেল, আর আমরা কলিকাতার এত নিকটে থাকিয়াও দরিদ্র থাকিব কেন? হিসাবের সুবিধার জন্য বলিয়া রাখি এক একটা এক বিঘা জলকরের পুকুর হইতে বার্ষিক ৫ শত হইতে সাড়ে সাত শত টাকা মুনাফা হইয়া থাকে। তবে গতরে খাটিয়া একটু তদ্বির না করিলে হইবে কেন?

(খ) কয়েক বৎসর ধরিয়া পাটের কৃপায় "আউস ধান্য" বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলে দেশশুদ্ধ লোককে "আমনের" উপরই ভর করিতে হইয়াছে। ইহাতে লাভ হইয়াছে এই টুকু যে, যদি হাজা শুকায় আমন মারা যায় তবে ইতর ভদ্র সকলকেই রেঙ্গুণের পায়ের কাছে মাথা কুটিতে হয়! হায়, বুদ্ধিহীনের দৈন্য। পাটের টাকা যাহা পাওয়া যায় তাহাই কি আমাদের ঘরে থাকে? পাট পচাইয়া যে ব্যাধির বীজ দেশময় ছড়াইয়া দেওয়া হয় তাহার প্রকোপ হইতে পাটের উৎপাদক কি বাদ পড়ে? বা সেই পচা পাট উচ্চ মজুরীর লোভে যাহারা কাচিয়া মরে তাহারা কি নিরোগ দেহে তাহাদের উপার্জ্জিত পয়সা ভোগ করিতে পায়? কাজেই বলিতে হয় যে, দেশের লোকের সঙ্গে সঙ্গে পাটের উৎপাদক ও ধারক উভয়কেই তাহাদের উপার্জ্জনের ভূরিভাগ সমস্ত বছরটা ধরিয়া বিদেশী ঔষধওয়ালাকে ধীরে ধীরে মাথা নিচু করিয়া গুনিয়া দিতে হয়। অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহার কিছু পাইল বিলাতী এনামেলওয়ালা, জর্ম্মনীর শীতবস্ত্রওয়ালা ও পাহাড়ী কাবুলীওয়ালা! তারপর রাজা মহাজন অতি কষ্টে আত্মগণ্ডা বুঝিয়া লইয়া গেলে দেখা গেল গৃহে অন্নের হাহাকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। দরিদ্রের পক্ষে নগদ পয়সার গরম এমনি মারাত্মক বস্তু। আমার বিবেচনায় পাটের চাষের আপাতমধুর দুঃখপ্রদ পরিণাম সকলকে বুঝাইয়া দিয়া উহার পরিমাণ কমাইয়া আউস ও রবি শস্যের চাষ বাড়ান বিশেষ প্রয়োজন। সামগ্রীর অল্পতা ও খরিদ্দারের আধিক্যই যে মূল্য বৃদ্ধির হেতু ও তাহার ফলে যে দরিদ্রদেশ একেবারে দাঁড়াইয়া মারা যায় একথা রীতিমত ভাবে পুনঃ পুনঃ ইতরভদ্র সকলকে বুঝান উচিত। বর্ত্তমান যুগ সমবায়ের যুগ, ইহা "চাচা আপন বাঁচার" যুগ নহে। Organised দেহ হইতে কোনরূপে বাহির হইয়া পড়িলে প্রভূতকীটাণু যেমন মুহূর্ত্তে মারা পড়ে—আপন স্বার্থ খুঁজিতে গিয়া সমবায় বিচ্যুত হইলেও আমাদিগকে তেমনি শেষে মরিতে হইবে, ইহাতে কোন ভুল নাই। যাহার বুদ্ধি ও চক্ষু দুইটাই আছে তিনি এই কথাটা এই কয়বৎসরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

(গ) পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ আজকাল, বস্ত্রাভাবে ধোপার বাড়ী কাপড় অনেকে দিতে পারে না। সুতরাং ময়লা কাপড়ে থাকিতে বাধ্য হয় এবং উহা যে রোগের ঘর তাহা কে না জানে? অথচ সকলেই এ বিষয়ে উদাসীন। এজন্য দুই চারি গ্রামের বা কোন এক গ্রামের ধর্ম্ম তহবিল হইতে মেটে সাবানের কারখানা (যাহার কর্ম্ম প্রণালী খুব সহজ) খোলা হউক। ইহাতে লোকসানের কোন ভয় নাই। মুর্গিহাটার মুসলমান সওদাগরেরা এই ব্যবসায় করিয়া লাল হইয়া গেল। তাহা কি দেখিতেছি?

(ঘ) পল্লীগ্রামে অগ্নিদাহে অনেকেই পথে দাঁড়ায়। তিন চারি পুরুষের সঞ্চয় দেখিতে দেখিতে ভস্মরাশিতে পরিণত হয়। হেতু, গোলপাতা ও বিচালির ছাউনি এবং গৃহবাসিগনের অনবধানতা। দুঃখে কষ্টে যাহারা অনবরত ভাজা হইয়া যাইতেছে তাহাদের অনবধানতা স্বাভাবিক. ইহার হাত এড়াইবার কোন সহজ উপায় নাই। তবে গোলপাতা ও বিচালির ছাউনির পরিবর্ত্তন সম্ভব। আমাদের দেশে এমন ঢের গ্রাম আছে যাহা গোলপাতা

বিক্রয়ের কেন্দ্রস্থান নদীতীর হইতে বহু দূরে। আর গোলপাতাও দিন দিন অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে গোলপাতা ক্রয় ও তাহা বাটীতে আনিয়া ফেলার যে হাঙ্গামা কত তাহা ভুক্ত ভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। অথচ এই নাকানি চুবানির বিত্তের পরমায়ুকাল বড় জোর পাঁচ কি ছয় বৎসর। আবার যাহারা বিশেষ ভাগ্যবান তাহাদের নিকট এই বিত্তটী দিয়াশালাইয়ের একটী কাঠির মুখে শূন্যে মিলাইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় যদি এই ধর্ম্ম তহবিল হইতে এক একটা খোলার ব্যবসা—(চোঙখোলা ও টালি খোলা)—একটু হিসাব করিয়া খোলা যায় তাহা হইলে ছাউনির স্থায়িত্ব ও অগ্নিভীতি হইতে আত্মরক্ষা এই উভয় উদ্দেশ্যই সফল হয় তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। খোলা তৈয়ারির মিস্ত্রীর অভাব হইবে না।

(ঙ) সেদিন কলিকাতার রাস্তায় দেখিলাম সুন্দর সুন্দর কঞ্চির 'পেন-হোল্ডার' বিক্রীত হইতেছে। ইহাও কি আমাদের কেহ করিতে পারে না? বাঁশের অভাব না মানুষের বুদ্ধির অভাব?

(চ) আমাদের দেশে কামার যাহারা তাহারা হয় চাষ করে না হয় সামান্য ২।১টা লাঙ্গলের ফাল পোড়াইয়া জাতীয় ব্যবসা রক্ষা করে। তাহারা জানেও না যে, ঢালাইখানা করিয়া নিত্যব্যবহার্য্য কব্জা, স্ক্রু, কড়া, কল, পাইপ প্রভৃতি এখনও তৈয়ার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায়। ইহা যদি একের সাধ্যে না কুলায় তবে দশের সাধ্যে, সমবায়ের সাধ্যে তাহা কুলাইবে না, কে বলিল?

(ছ) হাতবাতি, দেয়ালগিরি প্রভৃতির তৈলাধার ও পলিতার কল ইহাও কি আমাদের দেশের লোক করিতে পারিবে না? বৎসর বৎসর কত টাকা যে এইরূপ খুঁটী নাটী কারবারে আমাদের সোণার বাংলা হইতে বাহির হইয়া যায় তাহার হিসাব কি কেহ রাখে?

(জ) গোচারণের জন্য যখন ফাঁকা মাঠ নাই, তখন Crushed food এর ব্যবস্থা করা কি ভাল নয়? বাংলার গরু না বাঁচিলে মানুষ বাঁচিবে কি করিয়া?

(ঝ) চারি পাঁচটা গ্রাম লইয়া এক একটা কেন্দ্র কল্পনা করিয়া যদি এক একটা হোমিওপ্যাথিক ছোট ডিস্পেনসারি খোলা যায় তবে দরিদ্রের দেশ অল্প পয়সায় ব্যাধিমুক্ত হইবার অবকাশ পাইতে পারে। গলাকাটা ডাক্তার বা হাতুড়ে কবিরাজের হাতে পড়িয়া যে নিরন্নের দল উজাড় হইয়া গেল সেটা কি ভাবা উচিত নয়?

(ঞ) পা-চালানো সিঙ্গারের সেলাইয়ের কলের মত যে ব্যক্তি সূতাকাটা চরকার কল তৈয়ার করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কৃত করিবার প্রতিশ্রুতি যদি সমিতি প্রকাশ করেন তবে বড় ভাল হয়।

আমাদের দেশের লোক বহুদিনের অনভ্যাস ও অজ্ঞতার জন্য এই সব কথা হঠাৎ মাথায় আনিতে পারিবে না। যে আনিবে সে একটু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া "করা ভাল" বা "করিলে মন্দ হয় না" বলিয়া মন্তব্য চালাইয়া আপন কর্ত্তব্য শেষ করিবে। অবশ্য "পিপু ফিশু"র দেশে ইহার অধিক আশা করা যায় না। তবে বিচারবান্ যাঁহারা তাঁহাদের এ বিষয়ে মন্ত্রের সাধনের জন্য চেষ্টা না করিলে আর উপায় কি?

আমার মনে হয়, শ্রমজীবিগণকে ক, খ, শিখাইবার জন্য হুড়ুম দাড়ুম না করিয়া মৌখিক বক্তৃতাদ্বারা কৃষি ও শিল্পের সহজ ধারাগুলি তাহাদের বোধগম্য করিয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা কাজ চালাইয়া লওয়া খুব ভাল। পুস্তকের ভাষায় জ্ঞান হয় বটে কিন্তু তাহাতে সজীবের মর্ম্মস্পর্শী স্পন্দন থাকে না - মৌখিক ব্যাখ্যায় এইটুকু থাকে। আর এই স্পন্দনটুকুই সাধারণের মধ্যে একটা নিবিড় মিলনের স্বর্ণ শৃঙ্খল রচনা করিয়া ভবিষ্যৎকে দৃঢ় ও মধুর করে। এই সহজ সত্যটী আমরা যেন ভুলিয়া না যাই।*

শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়

---

* প্রবন্ধে লেখক মহাশয় অনেকগুলি সময়োপযোগী ও আলোচনাযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে কার্য্যতঃ এই গুলি কতদূর বাধাবিঘ্নসাপেক্ষ তাহা লেখক মহাশয় স্বয়ং এবং সুধী পাঠকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়া দিলে দেশবাসী সকলে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। মুঃ সঃ।

পল্লীসমস্যা ও তাহার প্রতিকার। *

আচার্য্য—প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

আমার জীবনের প্রায় ৫০ বছর কলকাতায় কাটিয়েছি আবার ৭॥ বছর বিলাতে ; তাই বলে পল্লীগ্রামের আমি কোনও খোজ খবর যে রাখি না তা' নয়। বাস্তবিক পক্ষে আমি পাড়াগেঁয়ে। আমি প্রতিবছর আমার নিজের গ্রামে একমাস করে কাটাই। সেটি জ্যৈষ্ঠমাসে এবং জ্যৈষ্ঠমাসের অপেক্ষায় সারা বছরই মনটা ব্যস্ত হয়। একটা কবিতা আছে না—"নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়",—ঠিক তাই!

গ্রামের দুরবস্থা হয়েছে বলে আপনাদের এত অবসাদের কোন ও কারণ নেই। যদি ম্যালেরিয়ার কথা বলেন, ওটা বিধাতার মার। সেদিন ছাত্রদের নিমন্ত্রণে নওগাঁয় গিয়েছিলাম, সেখানকার স্কুলের কি দুর্দ্দশা; অনেক জমীদারও আছেন—কিন্তু তাঁরা কিছু করেন না। আমি সেখানে বড় তীব্র ভাষা ব্যবহার করেছিলাম। খুলনায় Exhibition উপলক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণেও সেখানে সেই রকমই ব্যাপার দেখলাম। অনেক বড় লোক উপস্থিত ছিলেন; আমি বলেছিলাম, আমাকে যদি কেউ একবার আইন কানুনের কর্ত্তা করে দেয়, তা' হ'লে প্রথমে এই একটা আইন করি যে, যে জমীদারেরা প্রজার সুখদুঃখ ভুলে গিয়ে, প্রজার রক্ত শোষণ করে, তাদের সব জমীদারী স্বত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। আর বাস্তবিক কথা, এখনও যাঁরা প্রজাদের দেখেন না, তাঁরা শীঘ্রই লোপ পাবেন, স্বত্ব আর কেড়ে নিতে হবে না!

আর এখানে তোমরা সব চাষীভাইরা যা'রা আছ, তোমাদেরও একটা কথা বলি। আর সে দিন নেই। এখন তোমাদের হা'তে ক্ষমতা এসেছে। যে জমীদারেরা ধরমার করবে, যে জমীদারেরা অত্যাচারী হ'বে তোমরা কেউ তা'দের ভোট দেবে না! আমি ভোট পেলে গ্রামের দুঃখ মোচন করতে প্রতিশ্রুত না হ'লে, কেউ আমাকে ভোট দেবেনা। অবশ্য এখানকার জমীদার ম'শাইরা সে রকম নন; এঁরা দেখছি বেশ ভাল। এঁরা দেশছাড়া নন, লক্ষীছাড়া নন। দেশছাড়া একটু যা হ'ন, তা সে ম্যালেরিয়ার জন্য! ম্যালেরিয়া খোদার মার। এই যে যমুনা নদী মজে গেছে, এও একটা তার কারণ। কিন্তু প্রতীকার অসাধ্য বলে মনে হ'লেও চেষ্টা ত' করতে হ'বে। অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে। কিন্তু এখন আর শুধু কোম্পানি বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে থাকলে ত' হ'বে না।

এই সে দিন কপোতাক্ষীর ঐ দিকে গিয়েছিলাম। কপোতাক্ষীর আগার লোকেরা যেন জ্যান্তে মরা! কি সব চেহারা হ'য়ে গেছে! তাদের অবস্থা আরও খারাপ।

যাই হ'ক এইটাই ভাল যে সবার দৃষ্টি এসেছে। ঐ যে লেখা রয়েছে "ঐ দেখ আশার আলোকে জাগ্রত কুশদহ"। তা' এখন আত্মশক্তির উদ্বোধন করতে হ'বে। চাই আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা। আমাদের ত' কথাই আছে, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহং উপৈতি লক্ষ্মীঃ"। দু' একটী গ্রাম আগে হাতে নিতে হ'বে। সকলে মিলে মিশে কাজ করলে, কাজ খুব সোজা হয়ে যা'বে। এই যেমন চাষীরা "গাঁতা" দিয়ে কাজ করে, কেমন তোমরা জান ত'? তা' না হ'লে কি কাজ হয়? এই ধর বরষুমের সময় কোনও জায়গায় জল নিকাশ না হওয়ার দরুণ কত অসুবিধা হয়। সে সময় যদি সকলে মিলে একটু খানাটা কাটিয়ে দাও, কত সুবিধা হয়। যেখানে সমবেত শক্তি প্রয়োগ ক'রে কাজ করবে, সেখানে কাজের মত কাজ হবেই হ'বে।

যাঁরা "বাবু" তাঁদেরও কাজে নামতে হ'বে, তাঁদের পথ দেখা'তে হ'বে, দৃষ্টান্ত-দেখা'তে হ'বে। "বাবু" হ'য়ে বসে বসে চাষীদের কেবল "কাজ কর" "কাজ কর" বললে ত' আর কিছু হ'বে না। "বাবুরা" দৃষ্টান্ত শিখেছেন—আর সেইটা দেখা'বেন। এখানে সভাক্ষেত্রে অনেক যুবক "ভলেণ্টিয়ার" দেখছি। এরকম ভাবে কাজ করা, আর অনেক নূতন নূতন ভাব,—স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভরতা,—এসব আমরা Europe থেকে পেয়েছি। এসব দেশের লোককে শেখাতে হ'বে। বাবুদের নিজে কোদাল ধরতে হ'বে, তা' না হ'লে কাজ হ'বে না! এখন চাই যে আত্মনির্ভরতা। গ্রামে শক্তির ত' অভাব নেই, শক্তি যথেষ্ট আছে, এত আছে যে অপচয় হয়। আমরা যে কেবল কথায় কাজ

* কুশদহ-সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা।

সামলাতে চাই; তা'তে কি হয়? আসরে নাম্‌তে হ'বে! "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" করে কি আর কিছু হয়? এখন আর "পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে" খাবার দিন নেই। 'ইতর' 'ভদ্র' বলে আর কেউ নেই—সব সমান! Americaর কথা আমি জানি, সেখানে "ইতর" "ভদ্র" কেউ নেই, সব সমান। Democracyর দিন এসেছে! নূতন আইনে সবাই ভোট দেবার ক্ষমতা পেয়েছে, রাজারাজড়ার সঙ্গে এক সঙ্গে বসবার অধিকার পেয়েছে। একজন চর্ম্মকার এই রকম পদ পেয়েছেন, এ কথা সকলের বোধ হয় জানা আছে। জমীদারদের এখন বুঝতে হ'বে যে তাঁরা প্রজাদের হাতের মধ্যে এসে পড়েছেন। তা'র উপর আবার Income Taxএর নূতন আইন হয়েছে। Income Tax জমীদারের উপরই বসেছিল। Lord North Brook অনেক আগে তুলে দেন। বছর কতক আগে Finance minister জমীদারদের উপর Tax বসা'বার প্রস্তাব করেন। এখন পাঁচ হাজার টাকা সদর খাজনায় লক্ষ টাকা মুনফার জমীদারী আর চল্‌বে না। এখন জমীদারদের কর্ত্তব্য তাঁদের নিজেদের আগে ঠিক করা। They ought to set their house in order. কথা হচ্ছে Democracyর দিন এসেছে, সাধারণতন্ত্রের দিন এসে পড়েছে।

আমাদের বাংলা দেশে চাকরীতেই সর্ব্বনাশ হ'ল। চাকরী আমাদের না ছাড়লে আর উপায় নাই। ব্যবসা বাণিজ্য সব অন্য জাতির হাতের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আগে ইংরেজ তারপর মাড়োয়ারী তারপর পার্শী, ভাটীয়ালী—এই সব। আর আমরা? কেবল কেরাণী—। চাকুরের দুর্দ্দশা চিরকাল। রোজগার সামান্য ২৫৲, ৩০৲ না হয় ৪০৲ টাকা সাধারণতঃ চাকরীতে রোজগার হয়। এতে আর কি হবে? কাজেই Back to the village. তবে কথা হচ্ছে এই, সারাবাংলায় মোটামুটী ধরতে গেলে সাড়ে চার কোটী লোকের বাস। তার মধ্যে মাত্র ১১ লক্ষ লোক কল্‌কাতায় থাকে। কলকাতা আর হাওড়া বাদে বাকি সব পাড়া-গাঁ, সহর নয়। যশোর খুলনা এ সবকেও সহর বলা চলে না; কেননা যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য নেই, সে সহর হ'তে পারে না। তা হ'লে এখন এই লোকের মধ্যে ক'জন চাকরী করে? শতকরা একজনও নয়। শ'রের মধ্যে ১ জন লোকের ও চাকরীতে অন্ন হয় না! বাকি সব কৃষির উপর নির্ভর করে জমীদার পত্তনীদার প্রভৃতিরা যাই বলুন না কেন, সব Agriculturist তা সে চাষীই হোন আর জমীদারই হোন মোটের উপর একই দাঁড়াল। কাজেই দেখা যাচ্ছে কৃষির উন্নতিই প্রথমে করতে হ'বে, শিল্প এখন অনেক দূরের কথা। তোমরা চাষ কর একটা ফসলের। এখন কিসে একটা ফসলের জায়গায় দু'টো ফসল হবে, কি রকম সার দিলে, কি ভাবে চাষ করলে দু'নো ফল হ'বে তার চেষ্টা করে ব্যবস্থা করা দরকার। বর্দ্ধমান থেকে পশ্চিমে লোকেরা চাষ জানে। তারা সারাদিন পরিশ্রম করে। আর আমাদের দেশে কোন রকমে "ছানা-ছটুকা" করে ধান পুঁতে দিয়ে কাজ সারা হয়! আজকাল যে ভাবে চাষ আবাদ হয়, তা ছাড়া অন্য রকমে করতে হ'বে। উচিৎ জমীদারবর্গ ও শিক্ষিতদের এ বিষয়ে model farm করে জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া। এখন ভদ্র অভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সব এক সুতোয় গাঁথা। ফসল ভাল দাঁড় করাতে পারলেই উন্নতি সকলেরই।

তারপর, ম্যালেরিয়া আমাদের দূর করতেই হবে। কিসে ভাল পুকুর কাটান যায়, কি করে জঙ্গল সাফ করা যায়, কুয়ো খোঁড়া যায় এ সবের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। ভাল জলের ব্যবস্থা ও বদ্ধ জল সরানর ব্যবস্থা করতে পারলে তবে ত ম্যালেরিয়া কলেরা দূর করতে পারা যাবে। গঙ্গার তীরে অনেক জায়গায় খুব ম্যালেরিয়া; কিন্তু যে সব পাটের কলটল আছে, সেখানকার সাহেবদের ত ম্যালেরিয়া হয় না। বেঙ্গল কেমিক্যাল যেখানে সেদিকেও খুব ম্যালেরিয়া। কিন্তু সেখানকার managerদের ম্যালেরিয়া হয় না। তার কারণ কি? তাঁরা যেখানে বাস করেন, সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, জলপথ রাখেন, ভাল জলের ব্যবস্থা রাখেন এই সব।

বাস্তবিক কথা বলতে গেলে Malaria is a disease of poverty. কাজেই আমাদের নানাম দিক দিয়ে

অর্থাগমের চেষ্টা করতে হবে। আর সে জন্যে নানা ব্যবসা বাণিজ্য দরকার।

আমাদের দেশের যুবকদের বড়ই দুরবস্থা। ৫ বছর থেকে ২২ বছর পর্য্যন্ত 'ক খ' "Bla" "ব্লে" থেকে আরম্ভ করে শরীর নষ্ট অনর্থক অর্থ নষ্ট করে ফল হল কি? না, Graduate! B. A. হলে ৩০৲ টাকা। M. A. হলে ৭৫৲ টাকা যথেষ্ট! এ পথে চল্‌বে না। মাড়োয়ারীর মত পাট, ধান, তিসি এই সকলের ব্যবসায়ে লাগতে হবে। মাড়োয়ারীরা রাজপুতানা থেকে লোটা কম্বল নিয়ে এসে এখান থেকে লাখ টাকা করে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা কেবল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখছি। তা' এমন করে যে আমরা কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁজে বেড়াই তাতে আমাদের পেটের ভাতটাই কি ছাই জোটে? আচ্ছা এক জনের খেতে কত পড়ে দেখা যাক। সামান্য হোটেলেও একবেলা খেতে পাঁচ আনা, আর দুবেলা খেতে অন্ততঃ আট গণ্ডা পয়সা লাগে। তা' হ'লে মাসে একজনেরই যদি শুধু খেতেই ১৫৲। ২০৲ টাকা গেল, তাহলে চাকরীতে আমরা এমন কি পাই যা' থেকে সংসার চালাব? তা' নয়,—ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দেশে Graduate বড় সস্তা হয়েছে। কর্ম্মখালি বিজ্ঞাপন দিলেই, ৫০৲ টাকার কি ১০০৲ টাকার চাকরীর জন্য হাজার application এসে পড়ে এ আমার জানা আছে। দুর্দ্দশার একশেষ আর কি! সেই জন্যেই বল্‌ছি Back to the village. কিসে ম্যালেরিয়া যায়, কিসে দেশের ফসল ভাল হয়, কিসে দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়, লোকের দারিদ্র্য দূর হয় এ সবের চেষ্টা করে ব্যবস্থা করা দরকার।

বারুইপুরের দিকে কয়লা না হ'লে আজকাল রান্না হয় না! সেখানকার কি অবস্থা দেখ। মাড়োয়ারী সেই কয়লা আনে! সেখানে শোনা যায় অমুক মাড়োয়ারীকে Waggon দেওয়া হয় না তাই কয়লা আসছেনা! আরও কি দুঃখের কথা শোন। সেই মাড়োয়ারীরা নিরক্ষর। আমরা কিন্তু Shakespear, Milton পড়ছি—তাই নিরক্ষর মাড়োয়ারীদের যত কেরাণী সব বাঙ্গালী! আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। সেইজন্যেই বল্‌ছি, চাকরীতে হবে না। সকলেরই চেষ্টা করা উচিৎ কিসে অর্থাগম হয় কিসে ম্যালেরিয়া যায়—দেশের স্বাস্থ্য ফিরে আসে।

Belly & other members সেই একটা গল্প আছে না? পেটে আর হাতে বিবাদ করলে চলবে না। শিক্ষিতদের সঙ্গে চাষীভাইদের, মিলেমিশে কাজ করতে হ'বে। শিক্ষিতদের "মাথা" আছে বুদ্ধি যোগাবার, কিন্তু "হাত" নেই কাজ করবার। চাষী ভাইয়েরা হ'চ্ছে সেই "হাত"। আমরা বুদ্ধি দেবো, আর চাষী ভাইয়েরা হাতে কলমে সেইটেকে মোটামুটি কাজে দাঁড় করা'বে। এর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ চলবে না। তা, হ'লে সব গণ্ডগোল হ'য়ে গিয়ে কাজ পণ্ড হবে। এইখানে আমার Goldsmith এর একটা কথা মনে পড়েছে—A bold peasantry—the country's pride. আমাদের কি দুর্দ্দশা, সকলের চেহারাই হাড় বেরুনো।

যাই হ'ক আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে যে গোবরডাঙ্গা ও আশপাশের গ্রামের সকলে একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করছেন। আর এটা খুব দরকার; কেননা আগে diagnosis চাই। আগে রোগ কি, নির্ণয় করতে হ'বে। আর তাহ'লেই এইতেই রোগ আট—আনা রকম নিবারণ হবে।

আমার নিজের শক্তি সামান্য, আর খরচ করতে পারি না। আমি হিসাব করে দেখেছি যে বিধাতার কৃপায় ছ' বছরে ৪০,০০০ হাজার মাইল ঘুরেছি! আমার এক পক্ষের রোজনামচা দেখলে আমার নিজেরই ভয় হয়! সেদিন বিলাত গিয়াছিলাম। এখানেএই বাঙ্গালোরে দু'বার যেতে হ'য়েছে, মাদ্রাজ, কাশী, লাহোরেও বার দুই; তারপর লক্ষ্ণৌ, বরোদা। আবার চুঁচড়ো; তা'পর ব্যাটরায় বালিকা বিদ্যালয়ে। কাল আবার গাইবাঁধায় যেতে হবে; তারপর গৌহাটি। সেদিকে আবার আসামের ঘাসের কাগজের ব্যবসাটা নেবার জন্যে বিলাতের অনেক লোক লেগে আছেন। আমরা কিন্তু চুপচাপ আছি, আর কোথাকার বিলাতের লোকেরা আমাদের দেশের এই ব্যবসাটা অধিকার করবার চেষ্টায় আছেন! বাস্তবিক Government কে আমরা যত দোষ দি, তত দোষে তাঁরা দোষী নন। আমাদের

নিজেদের দোষ কি কম? তা' যাই হ'ক আসামের কাগজের ব্যবসাটা এখানে কোম্পানি করে, চালাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তা'পর গৌহাটি থেকে টাঙ্গাইল যেতে হবে। তার উপর আবার সায়েন্স কলেজ আছে। ব্যাপারটা ঠিক যেন কেউ আমার হাতটা একদিকে টান ছেন, কেউ আর একটা হাত ধরে আর এক দিকে টান্‌ছেন, কেউবা গলাটা ধরে এ দিকে টান্‌ছেন, কেউ কোমরটা ধরে ও দিকে টানছেন—আমি এখন কোন দিকে যাই? আমার অবস্থাটা হয়েছে "ন যযৌ ন তস্থৌ" র মত। তবে দেশের যেকোনও রকম হিতকর কার্য্যে যোগদান কর্‌তে পার্‌লে আমি অত্যন্ত সুখী হই। কিন্তু এরকম টানাটানিতে পড়ে, আমি যাই কোন দিকে? এই ব্যাপারে আমার মনে হয় আমাকে এইবার S. P. C. A. র আশ্রয় নিতে হবে।

যা, হ'ক আজ চাষী ভাইয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পেয়ে বড় আহ্লাদ হ'ল। চাষীর কথায় চাষের কথায় আমি পরম আনন্দ পাই। তা ছাড়া কৃষকরাই দেশের ভবিষ্যৎ। চাষীদের মধ্যে লেখাপড়ার যাতে ব্যবস্থা হয় তার যত্ন লওয়া উচিত।

পেন্সন্ পেয়ে লোকে ভাবেন "কি করবো"? কাজ না পেয়ে লোকে যেন মারা যান। কিন্তু কাজ অনেক রকম আছে। এ দেশে কাজ আবার নেই? কাজ অনেক রকমের আছে——এত, যে প্রশ্ন এই, "কি কর্‌বো?" নয়, "**কত গুলো কর্‌বো?**" আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই একটু দেশের কাজ করা উচিত।

——:o:——

মূক ও মুখর।

বিচ্ছেদ-বিষাদে মৌন
রহে গিরি চাহি অনিমেষ—
নদী যবে ধায় ক্রোড় হ'তে;
সাগরের তৃপ্ত বুকে
অফুরন্ত মিলন উচ্ছাস,
কি কল্লোল, লক্ষ উর্ম্মি-ঘাতে!

শ্রীমতী শৈলজা দেবী।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি

স্বাগত ঋষি পৃথিবী-পূজ্য!
স্বাগত মন্দির দ্বারে
স্বাগত মূর্ত্ত প্রেম-প্রবাহ
শুষ্ক মরুর মাঝারে।
(এস) জ্ঞান-কর্ম্ম-আধার স্বরূপ
বাণীর প্রিয় নন্দন
(এস) মন্দির মাঝে, সুন্দরতম
সিন্ধু মথিত রতন!
কি দিয়ে গো ঋষি পূজিব তোমারে,
অর্ঘ্য করিব দান?
আছে যে গো শুধু চরণ-দলিত
বেদনা-জড়িত প্রাণ!
আছে যে গো শুধু চিন্তার চিতা
ধু ধু জলে দিবা যামী!
সে হৃদি মাঝারে হে যোগী তোমারে
কেমনে বসাব আমি!
ধূ ধূ জলে সদা এ বিশাল মরু
উঠে শুধু হাহাকার
মৃত্যু ফেরে সদা সাথে অনুচর
অনাচার ব্যাভিচার!
ঐ শোন কাঁদে করুণ কণ্ঠে
অনাথিনী আজি বালা,
মুছে গেল ওগো সিন্দুর রেখা
কি দিয়ে নিভাবে জ্বালা?
ধূলায় লুটায়ে কাঁদিছে জননী
ছিঁড়েছে গো হৃদি-তন্ত্র,
জান যদি বল হে ত্যাগী সন্ন্যাসী
হৃদয়-জুড়ান মন্ত্র।
অকালে হেরিয়ে কালের মূর্ত্তি
ভীত চকিত প্রাণ!
পার যদি ওগো তাড়াও তাহারে,
পার যদি কর ত্রাণ।

না ফুটিতে ফুল ঝরিয়ে পরিবে
এ নহে বিধির বিধি
তাই যদি হয় বধগো বিধিরে
রাখগো হৃদয় নিধি!
সচলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া
এ ভূমে করিত বাস,
দানব পীড়নে গিয়াছে চলিয়া
দুর্ভিক্ষ ক'রছে গ্রাস।
দেশ পূজ্য ঋষি কত দেশ ঘুরি
এনেছ আশার বাণী
জান যদি বল কেমনে এ দেশে
ফিরিবে লক্ষ্মী রাণী!
প্রাণ যদি চাহ, নাহি প্রাণ দেশে,
মৃত্যুর লীলা ভূমি;
তাই ওগো আজি জীবন-যজ্ঞে
হোতৃ-পদে বৃত তুমি।
তুমি চাহ যদি সুপথে লইতে,
কুপথেতে চ'লে যাই,
তুমি যরে বল ভোগাগি আসিতে,
উচ্ছিষ্ট তাহারি খাই।
শত দোষে দোষী, তাই বলে ক্ষমা
পাবনা কি মোরা ভাই?
ধরণী দলিছে চরণে বলিয়া
তুমিও দেবেনা ঠাঁই?
প্রাণভরা প্রীতি আনগো বহিয়ে
ঢালি' দেহ দেশময়,
দূর কর যোগী! দলিত মথিত
ক্ষুদ্র পরাণ চয়।
আহুতি ঢালিয়ে জীবন-যজ্ঞে
সৃজহ নূতন প্রাণ,
তারাই ঘুচাবে মায়ের দুঃখ
তারাই করিবে ত্রাণ।

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বি, এল্

* কুশদহ সমিতির ৩য় বার্ষিক অধিবেশনক্ষেত্রে লেখক কর্তৃক পঠিত।

কাজ কাকে বলে?

কাজ ত চাই, কিন্তু কাজের আগে চাই কাজের কাজী মানুষ। প্রতি গ্রামে স্কুল চাই, লাইব্রেরী চাই, বৈদ্য চাই, ধানের গোলা চাই, গোচারণের ঘাসে সবুজ মাঠ চাই, ব্যবসা বাণিজ্য চাই, কুটিরে কুটিরে উটজ শিল্প চাই, ঋণ দেবার ব্যাঙ্ক চাই, মন্দিরে মন্দিরে জাগা দেবতা সাধু-সন্ত চাই। এত যে চাই তা' তুমি আমি করে দিলে হবে না, কারণ কার এত টাকা আছে যে লাখ লাখ গাঁয়ে এমন শ্রীপীঠ রচনা করতে পারে? তাই আগে চাই, শক্তিধর মানুষ, জনে জনে দশভুজা,—যারা গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে গ্রামবাসীর আপন জন হয়ে মরা গাঙ্গে জীবন আনবে, গৃহভেদ দূর করবে, গ্রামবাসীকে ভাইয়ের দুঃখের দরদী করবে। এ কাজ বাবু ভেইয়ার—এসে গিয়ে পড়া তেড়িকাটা চশমাধারীর নয়, এ কাজের কাজী হবে চাষা—সে হবে সেই গ্রামের গ্রামবাসী তাদেরই একজন। সে সেখানে স্বরাজ-সঙ্ঘ করে নিজের আড্ডা গড়বে না, দুবিঘা ভূঁই ছাড়া নিজের বলে কিছু রাখিবে না। গ্রামবাসীদেরই সে শেখাবে কি করে, একজোটে কাজ করলে উষর ভূঁইয়ের সোণা ফলে, কি করে পরের দরদের দরদী হ'লে আপন ঘরও গড়ে ওঠে। এই কাজের কাজীরা এমন মানুষ কিন্তু হওয়া চাই যার পায়ে সবার মাথা আপনিই নুয়ে পড়ে।—"কাজের কথা"—বিজলী।

আলোচনা

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ও তাহার কারণ।*

বিগত এক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা কি ছিল, সে কথা না হয় নাই বলিলাম; কারণ সে কথা বলিতে হইলে বৃদ্ধগণের কথায় বিশ্বাস করা ভিন্ন উপায় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন আর তাহা মনে রাখিয়াছেন এমন লোকের সংখ্যা এক্ষণে অতি অল্প। তবে পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা মনে করিতে পারেন, এমন লোকের সংখ্যা অনেক। তাই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গপল্লীর সহিত বর্ত্তমান বঙ্গপল্লীর তুলনা করিতেছি। এই প্রকার তুলনায় আমরা কি দেখিতে পাই? তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে সত্য, তবুও তখনও ২।৩ খানা গ্রামের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে একজন বিচক্ষণ সুচিকিৎসক দেখিতে পাওয়া যাইত। ব্যবসায়ী কবিরাজের কথা ছাড়িয়া দিলেও তখন প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এমন ২।৪ জন প্রবীণ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইত যাঁহারা নামে চিকিৎসক না হইয়াও কাজে চিকিৎসক ছিলেন। মোটামুটী নাড়ীজ্ঞান ও প্রায় সকল পীড়ায় ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ইহাঁদের জানা ছিল। সামান্য রকম পীড়াতে এই সকল গ্রামবৃদ্ধরাই চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন; কেবলমাত্র কঠিন ও দুরারোগ্য পীড়াতেই ব্যবসায়ী বৈদ্যের শরণ লওয়ার প্রয়োজন হইত। ইহা ছাড়া প্রায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই মোটামুটী স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, সন্তান পালনবিধি ও কিছু না কিছু টোট্‌কা টুট্‌কি ঔষধের জ্ঞান প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজকাল পল্লীগ্রামে আর সে অবস্থা নাই। বিচক্ষণ কবিরাজ এক্ষণে পল্লীগ্রামে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পল্লীগ্রামে না হয় নাই থাকিল, সহরেই কি আছে? বহরমপুর, ঢাকা প্রভৃতি দুই একটা পুরাতন সহরের কথা ছাড়িয়া দিলে, আজকালকার ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও বিচক্ষণ কবিরাজের নিতান্ত অভাব। কলিকাতার অবস্থা আবার আরও শোচনীয়। কলিকাতায় যাঁহারা কবিরাজ নামে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই কবিরাজ কি না বলা শক্ত। ইহার কারণ, তাঁহাদের অনেকেই আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করেন না, করিলেও তাঁহারা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করেন তাহার অধিকাংশই পেটেন্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত। অনেক স্থলে তাহাদিগকে কবিরাজ না বলিয়া পেটেন্ট ঔষধ বিক্রেতা বলিলেই ঠিক

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লেখক মহাশয় যে সকল মন্তব্য ও প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাদের সত্যাসত্যের জন্য তিনিই দায়ী। তবে ইহা লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রতি এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রসূত; এবং ইহা দ্বারা দেশের বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়গণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কুঃ সঃ।

বলা হয়। কেবলমাত্র নামের পূর্ব্বে 'কবিরাজ' যোগ করিলেই আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করা হইল না। সে দিন একজন কবিরাজ মহাশয়ের একটা বিজ্ঞাপন পড়িতে-ছিলাম। তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে প্রচার করিতেছেন যে যাঁহার নামের পর 'সেনগুপ্ত' উপাধি নাই তিনি কবিরাজ নহেন। বলা বাহুল্য, কবিরাজ মহাশয় নিজে 'সেনগুপ্ত' উপাধিধারী। কবিরাজ মহাশয় বোধহয় ভাবিয়া দেখেন নাই যে তিনি নিজে যে প্রকৃত কবিরাজ তাহা হয়ত সকলে বিশ্বাস করিবেন না। তিনি যে সকল ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, সেগুলির অধিকাংশই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ নহে। অন্ততঃ পক্ষে সেগুলি হয় পেটেণ্ট ঔষধ, না হয় কল্পিত ও অপ্রকৃতনামযুক্ত শাস্ত্রীয় ঔষধ। সে গুলি যে পেটেণ্ট ঔষধ নহে তাহা লোকে কিরূপে জানিতে পারিবে? সেগুলি যদি শাস্ত্রীয় ঔষধই হয় তাহা হইলে তাহাদের নাম গোপনের প্রয়োজন কি? যে কার্য্যে প্রকৃত ঘটনা গোপনের প্রয়োজন হয়, সে কার্য্যে লোকের সন্দেহ জাগিয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। আয়ুর্ব্বেদ অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইলে শাস্ত্রীয় ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে ও তাহাদের প্রকৃত নাম প্রকাশ করিতে হইবে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় কলিকাতার অধি-কাংশ কবিরাজই শাস্ত্রীয় ঔষধ ব্যবহার করেন না—করিলেও ঐ সকল ঔষধকে কৃত্রিম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কবিরাজ মহাশয়গণের ঔষধের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে তাঁহারা যে সকল ঔষধের বিজ্ঞাপন দেন, তাহার অধিকাংশের নাম অশাস্ত্রীয়। এই প্রকার কল্পিত নাম ব্যবহারে দুই প্রকার উদ্দেশ্য থাকিতে পারে।—

প্রথমতঃ ডাক্তারি ঔষধ কুইনাইনকে বাঙ্গালা নামের ছদ্মবেশে চালান। কলিকাতার কোন কোন কবিরাজ কুইনাইন দিয়া বটিকা প্রস্তুত করেন ও তাহার একটা বাঙ্গালা নাম দিয়া উহা কবিরাজি ঔষধ বলিয়া প্রচার করেন—এরূপ গুজবও শুনিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রীয় ঔষধের নাম বদলাইয়া দিলে উহার প্রকৃত মূল্য কত কেহ ধরিতে পারিবে না; সুতরাং এই প্রকার কৌশলে রোগীর নিকট হইতে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করা অনায়াসেই সম্ভবপর হইতে পারে। মনে করুন কোনও রোগীর প্রতি "কস্তুরী ভৈরবে"র ব্যবস্থা করিতে হইবে। 'কস্তুরী ভৈরব' নামটী শাস্ত্রীয়—ইহা কি কি দ্রব্যে প্রস্তুত ও তাহার মূল্য কত হওয়া উচিত ইহা অনেকেই জানেন। এরূপ ক্ষেত্রে 'কস্তুরী-ভৈরব' নাম না দিয়া যদি ঔষধটীর নাম দেওয়া হয় 'বৃহৎ-জ্বর-সংহারক-রস' তাহা হইলে কাহারও ক্ষমতা নাই যে এই ঔষধের মূল্য কত হওয়া উচিত তাহা বলিতে পারে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমার এক মালদহ নিবাসী বন্ধুর পত্নীর সর্ব্বাঙ্গ আগুনে পুড়িয়া যায়। ঐ সময় তিনি কলিকাতার এক খ্যাতনামা কবিরাজের নিকট হইতে /১ সের তৈল আনান। কবিরাজ মহাশয় ঐ /১ সের তৈলের জন্য ৬৪৲ টাকা মূল্য লইয়া ছিলেন। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে ঐ তৈলটী "মহামাষ তৈল"। ঐ মহামাষ তৈলের /১ সেরের প্রকৃত মূল্য ১২৲ টাকার অধিক হওয়া উচিত নহে ইহা প্রমাণ করা চলে। কিন্তু তাহা বলে কে? কবিরাজ মহাশয় ত উহাকে "মহামাষ" তৈল নামে পাঠান নাই। তিনি কি নামে ঐ ঔষধকে পরিচিত করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে লিখিলাম না। এরূপ ও শুনা গিয়াছে যে যদি কোনও রোগী কলিকাতার কোনও কোনও বিখ্যাত কবিরাজগণের নিকট ব্যবস্থাপিত ঔষধের শাস্ত্রীয় নাম জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা হইলে কবিরাজগণ বিরক্ত হইয়া সে রোগীর চিকিৎসা পরিত্যাগ করেন। এইরূপ কৌশলেই কলিকাতার অনেক কবিরাজ আজকাল যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। অতিরিক্তরূপে ঔষধের মূল্য আদায় করার ইহা অপেক্ষা সহজ পন্থা আর নাই। সুগন্ধি তৈলের কথা আর না বলিলেও চলে। কবিরাজ হইলেই তাঁহার একটা মহাসুগন্ধি কেশ তৈল থাকাই চাই—সে বিলাতি White Oilএর সহিত সুগন্ধ মিশাইয়া প্রস্তুত হউক বা যাই হউক! বলাবাহুল্য এই সুগন্ধি কেশ তৈলগুলির অধিকাংশই শাস্ত্রীয় তৈল নহে।

কবিরাজগণের এই উৎকট অর্থ লালসার ফলে কলি-কাতার মত স্থানেও কবিরাজি-চিকিৎসা দরিদ্রের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সে যাহা হউক আমি বলিতেছিলাম যে দেশে, অন্ততঃ পক্ষে পল্লীগ্রামে, এখন প্রকৃত কবিরাজ অতি বিরল হইয়া

পড়িয়াছে। গ্রামে গ্রামে এখন আর চিকিৎসা-বিদ্যা-নিপুণ, পরোপকারশীল গ্রাম-বৃদ্ধ ও দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্বর হইয়াছে কি না জানিতে হইলে এখন আর থার্ম্মমিটরের সাহায্য ব্যতীত সে কার্য্য দুরূহ বলিয়া বিবেচিত হয়। ভদ্রবংশীয় পল্লীরমণীর মধ্যে আর স্বাস্থ্য বিস্তার নিপুণা গৃহিণীর হাস্যোজ্জ্বলা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে এখন দেখিতে পাওয়া যায় শুধু উপন্যাস পাঠে উত্তেজিতমানসা শিক্ষাভিমানিনী বিলাসিনীর চিররুগ্ন অথচ চিরবিষণ্ণ কঙ্কাল। সন্তানের সামান্য রকমের একটা পীড়া হইলে এখন তাঁহারা চারিদিক অন্ধকারময় দেখেন। আমার নিজের বাল্যের কথা যতটা মনে হয় তাহাতে বলিতে পারি যতদিন জননীর যত্নে ও তত্ত্বাবধানে ছিলাম ততদিন কোনও পীড়া হয় নাই। বোধ হয় আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কখনও কোনও ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ খাইতে হয় নাই—তাহার পর যখন প্রথমে বিদেশে যাইলাম তখন অনিয়মে ও অত্যাচারে পীড়া হইল। গ্রামের যুবকগণ এক্ষণে স্বাস্থ্য রক্ষার কোনও নিয়মই জানেন না। ফল ও হইতেছে যাহা হওয়া উচিত—অকাল বার্দ্ধক্য অকাল মৃত্যু ও জীবন মৃত্যু।

অতঃপর আয়ুর্ব্বেদের অবনতির ২।১টী কারণ এস্থলে সংক্ষেপে নিদ্ধারণ করিব।

(১) আয়ুর্ব্বেদের উপর গবর্ণমেন্টের সহানুভূতির অভাব। আমাদের গভর্ণমেণ্ট বিদেশী—তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের কোনও সংবাদই অবগত নহেন। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের সংবাদ রাখেন না, ইহাতে তাঁহাদের দোষ দেওয়া চলে না। দেশের লোকের কর্ত্তব্য তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কিন্তু দেশের লোক এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে উদাসীন রহিয়াছেন। কাজেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত উল্লেখ যোগ্য কোনও ব্যবস্থাই করেন নাই। শুনিতেছিলাম একটী গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নাকি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। কথাটা কতদূর সত্য আমি বলিতে পারিনা। তবে দেশে অন্ততঃ একটা গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজের যে নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে একথা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। এতদিন এইরূপ একটা কলেজ স্থাপনের চেষ্টা কেন যে হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের দেশের ধনীদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা। তাঁহারা নানা ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করেন কিন্তু একটা আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ বা ঔষধাগার নির্ম্মাণ যে একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় সৎ-কার্য্য সে কথা তাঁহারা কখনও ভাবেন নাই। এখন আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সুলভে দরিদ্র-গণের চিকিৎসার ব্যবস্থাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

(২) বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ লোকের আয়ুর্ব্বেদ পাঠে আগ্রহ দেখা যায় না। কবিরাজ মহাশয়ের যে ছেলেটী বুদ্ধিমান্ সেটী হইল ডাক্তার আর যেটী সম্পূর্ণ স্থূলবুদ্ধি ও অকর্ম্মণ্য সেটী হইল কবিরাজ। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ এক্ষণে অন্নাভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এমনও শুনিয়াছি যে এম্, এ পাশ করিয়া মাসিক ৪০।৫০ টাকা বেতনে দশ বৎসর ধরিয়া শিক্ষকতা করিতেছেন এমন লোকও আজকাল বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ভদ্রলোকেরা আয়ুর্ব্বেদ পাঠে প্রবৃত্ত হইলে সসম্মানে অর্থ উপার্জ্জন ও দেশের সেবা একত্রে সাধিত হয়। আজকাল প্রায় সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভালরকম না জানিলেও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় আজকাল কোনও বাধা নাই। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তিরাই,—অন্ততঃ সংস্কৃতজ্ঞ ব্যতীত কেহ শিখিতে পারেন না এরূপ নহে। অবহিতচিত্তে তাঁহারা যদি চরক সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ ও মাধবনিদান এই চারিখানি পুস্তক পাঠ করিতে পারেন তাহা হইলে চিকিৎসা শাস্ত্রে কার্য্যোপযোগী একটা জ্ঞান লাভ ঘটিয়া উঠিবে। পরে অভিজ্ঞতা ও অধিকতর অধ্যয়নের ফলে তাঁহারা ঐ বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ডাক্তারি চিকিৎসা ভাল কি কবিরাজি চিকিৎসা ভাল সে সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছুই বলিতেছি না। দুই চিকিৎসারই এ দেশে প্রয়োজন আছে, আমি ইহাই

এস্থলে বলিয়া রাখি। তবে পল্লীগ্রাম গুলিতে যে সুচিকিৎসার নিতান্ত অভাব হইয়াছে এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ডাক্তারিশিক্ষা ও চিকিৎসা উভয়ই ব্যয় সাপেক্ষ কিন্তু কবিরাজি শিক্ষা ও চিকিৎসা সেরূপ নহে। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের দরিদ্রের পক্ষে ডাক্তারি চিকিৎসার ব্যয় বহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ ক্ষেত্রে অন্ততঃ পক্ষে দরিদ্রের চিকিৎসার জন্য দেশে কবিরাজি শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজন। সহরে ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতে পারে, কিন্তু পল্লীগ্রামে ইহা অচল। ডাক্তারি চিকিৎসার বিস্তার হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারেনা। অন্ততঃ পক্ষে অস্ত্র চিকিৎসার জন্যও ডাক্তারির প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ডাক্তারির সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজির বিস্তার প্রয়োজন। শুধু ডাক্তারের দ্বারা সমগ্র দেশের চিকিৎসাকার্য্য চলিতে পারে না। বিশেষতঃ একথা আমাদিগের ভুলিলে চলিবে না যে—"যস্য দেশস্য যো জন্তু স্তজ্জন্তস্যৌষধং হিতম্।"

অর্থাৎ যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশে উৎপন্ন লতা পাতা হইতে প্রস্তুত ঔষধই তাহার পক্ষে অধিক ফলদায়ক।

অধ্যাপক শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়,
এম, এ, জ্যোতিভূর্ষণ।

আমার কথা।

আমরা চাই সভ্য অসভ্য প্রত্যেক কুশদহবাসী নরনারীর ভাষা এক করিয়া গড়িয়া লইতে এবং প্রত্যেকে যাহাতে মোটামুটী ভাবে জাতীয় ভাষা শিক্ষা লাভ করিয়া, রাজভাষার বই না পড়িয়া মৌখিক শিক্ষাদানে বেশ ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন, ইহার জন্য প্রত্যেক পল্লী বা গ্রামের স্থানীয় সমিতি সুবিধামত উপদেশ ও শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলে শীঘ্র ও নিশ্চয় সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে। হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য ধর্ম্ম কর্ম্মে থাকুক; কিন্তু দেশের কার্য্যে একপ্রাণ হউক। কেহ কাহার শত্রু না হন। জমীদার প্রজা, ব্যাঘ্র শৃগাল ভাবে থাকাতেই সমাজকে নিঃস্ব করিয়াছে, প্রজাশক্তি ভূস্বামীশক্তির সাহচর্য্যে সমতা রক্ষা না করিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। আরও, শোষক তেজারতী কার্য্যের সমূলে উৎপাটন করিতেই হইবে। সমিতির সভ্য হইলে তাহাকে কৃষী ও শ্রমজ কার্য্য, এবং শিল্পে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রজাকে শোষক মহাজনের দেড়া দুনোর দায় হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। দেশে একটিও আলস্যপরায়ণ লোক বসিয়া না খায়, তাহা করিতে হইবে। খাট খাও, কুড়ে হইও না, বসিয়া বসিয়া অমূল্য জীবন নষ্ট করিও না, এই বলিয়া মাঝে মাঝে উত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে হইবে। জানি, জমিদারশক্তির সাহায্য ব্যতীত দেশের কোনই মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সাধারণের পক্ষে বিড়ম্বনা-জনক।

আমি যাহা চাই, তাহাই হয় ত হইবে; কিন্তু আমি এ দেখিতে নাও পাইতে পারি। দেশে চোর জুয়াচোর প্রবঞ্চক প্রভৃতি নীচ কার্য্যে যোগ দিবার কেহই থাকিবে না। সকলেই খাটিয়া খাইবে। উপার্জ্জনের শত শত পথ পড়িয়া রহিয়াছে, তবে কেন চোর প্রবঞ্চক হইয়া চুরী ও প্রবঞ্চনা করিবে এবং দেশের ও দশের চক্ষে ঘৃণিত হইবে?

সমিতি বুঝিয়াছেন, একখানি স্থানীয় পত্রিকা না থাকিলে ঐ সকল ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্য দেশবাসীগণকে বুঝাইয়া ও শিক্ষা দেওয়ার অন্তরায় থাকিতেছে, এবং সাধারণের আবেদন নিবেদন অভাব সকল প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে না, তাই কুশদহ পত্রিকা বাহির করিবার নিমিত্ত আজ কয় বৎসরই সমিতি সচেষ্টিত হইয়াছেন। দেশবাসী সকলে মন খুলিয়া দেশের কার্য্যে অগ্রসর না হইলে প্রত্যবায় হইবে। আমার ইচ্ছা কুশদহ পত্রিকায় প্রত্যেক সংখ্যায় শ্রমজীবিদিগের শ্রমজ কার্য্যের আলোচনা করি; কিন্তু কার্য্যে কতদূর সক্ষমতা লাভ করিব জানি না। কিন্তু না জানিলেও দেশের জন্য প্রিয় জন্মভূমির শ্রমজীবিগণের নিমিত্ত যেখানে যাহা পাইব তাহা কুড়াইয়া আমার দেশবাসীদিগকে বিলাইয়া দিয়া কৃতার্থ বোধ করিব।

আমার মনে হয়, পত্রিকায় ধর্ম্ম,ও রাজনৈতিক আলোচনায় বিরত থাকিয়া এক মাত্র দেশের কল্যাণ করিবার নিমিত্ত সরল সাহিত্য, নীতি ও কার্য্যে উৎসাহদ্যোতক গল্প, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সহজভাবপূর্ণ সরল ভাষায় গৃহচিকিৎসা, এবং সহজবোধ্য ভাবে এযুগের রসায়ন ও বিজ্ঞান যাহা দ্বারা আয় হইতে পারে তাহাই বুঝাইয়া কুশদহবাসীদিগকে পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে সম্পাদকের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইবে বলিয়াই আশা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নহে।*

—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দত্ত।

বর্ত্তমান গো-সমস্যা।

বিবিধ প্রকার ব্যাধিজর্জ্জরিত হইলে শরীরের অসংখ্য গ্লানি মানুষকে সময়ে সময়ে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। অতীতের সুস্থদেহের স্মৃতি তাহার চিত্তকে উদ্বেলিত করে মাত্র প্রতিকার ও নিরাময়ের কোনও সদুপায় খুঁজিয়া পায় না পরন্তু ভবিষ্যতের প্রতি ও আরোগ্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া নানাবিধ সহজ ও অনিষ্টকর ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দিলেও পারদর্শী চিকিৎসকের সাহায্যের জন্য ব্যস্ত হয় না বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের অবস্থা ঠিক সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। দুঃখ দৈন্যের তাণ্ডব নৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আপন শক্তির ক্ষুদ্রতা প্রথমেই উপলব্ধি করি এবং তাহার বিরুদ্ধে সেই শক্তি, যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহার পরিচালনা না করিয়া দুঃখ দৈন্যের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান না করিয়া ভূতের ভয় পাইয়া কি হইল, কি হইবে বলিয়া হতাশের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করি। আজকাল গোজাতির দুর্দ্দশায় দেশবাসীর তৎপ্রতি উদাসীনতা এইরূপ একটা চিত্ত-বিক্ষেপেরই লক্ষণ। কেননা, কৃষিপ্রধান বঙ্গপল্লীর কৃষির অবনতি যে দেশবাসীর দুর্দ্দশার একটা প্রধান কারণ তাহা নিঃসন্দেহ। এই কৃষির জন্য গবাদি পশু এদেশে অপরিহার্য্য। এখানে কলের লাঙ্গল চলে না। গোবর ব্যতীত অন্য সারের ব্যবহার সেরূপ নাই অথচ এই পরম আবশ্যকীয় গোজাতির প্রতি কেহ কি একবার দৃষ্টিপাত করি! হিন্দুদের মধ্যে গোজাতির প্রতি আদর যত্ন করিবার একটা শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা আছে। কিন্তু সেই গোমাতার দুর্দ্দশার জন্য কতদূর পর্য্যন্ত আমরাই দায়ী তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

H. W. B. Moreno, একজন সাহেব। তিনি সম্প্রতি গবাদি পশু সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় পরিপূর্ণ একটী প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি সংগৃহীত হইল।

সমগ্র ভারতে গবাদির সংখ্যা।

গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে দেখান হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতে যুদ্ধের পূর্ব্ব অপেক্ষা বর্ত্তমানে গবাদি পশুর সংখ্যা শতকরা দুই বৃদ্ধি হইয়াছে; বর্ত্তমান সংখ্যা সরকারী হিসাবে মোট ১৪৪৯২২০০০। ইহার সঙ্গে একটু মন্তব্যও আছে— ভারতবর্ষে গড়পড়তা যত গবাদি পশু আছে পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি এত নাই—India is wealthiest in bovine cattle. এ মন্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিলেও আমাদের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। আমরা ত দেখিতেছি, ক্রমশঃ গবাদি পশু কমিয়াই যাইতেছে। পৃথিবীর অন্য দেশের সহিত তুলনা করিয়া আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা অন্যরূপ।

গবাদি পশু ও জন-সংখ্যার অনুপাত :—

ভারতবর্ষে	শতকরা	৬১
আমেরিকায়	„	৭৯
আরজেণ্টাইনে	„	৩২৩

গবাদি পশুর যদি প্রাচুর্য্যই থাকিবে তাহা হইলে চাষের এত দুর্দ্দশা কেন?

চাষ জমি—ভারতবর্ষে মোট ৬৮৪,০০০,০০০ বিঘা চাষ জমি আছে। ইহা চাষ করিতে, মোট ১৪৫ ৯২২০০০ পশুর মধ্যে শতকরা পঁচিশ ভাগ দুগ্ধবতী বা অন্য কারণে চাষের অযোগ্য বলিয়া বাদ দিলে দেখা যায় এক জোড়া মহিষ বা গরুর উপর গড়পড়তায় ৫০ বিঘা জমি চাষ করিবার ভার পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে ১০।১২ বিঘার বেশী এক জোড়া বলদ দ্বারা বেশ ভাল করিয়া চাষ চলে না।

* সাহিত্য গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া 'কুশদহ-সমিতি'র আদর্শ প্রচার করাই "কুশদহে"র মুখ্য উদ্দেশ্য। কু: স:

আমাদের দেশে, গরুর যাহা ভাল জাত, তাহার মধ্যে প্রতি বৎসর ৩২০০ বিদেশে রপ্তানি হয়।

তারপর কত গরু হত্যা করা হয় এবং কি পরিমাণ গোমাংস রপ্তানি হয় দেখুন। ব্যাঘ্রাদি পশুকে মানুষেরা হিংস্র ও মাংসাশী বলিয়া ঘৃণা করে। করিতেই পারে, কেন না এক যুক্ত প্রদেশ হইতে প্রতিবৎসর মাত্র দেড় লক্ষ মণ গোমাংস চালান হয়! এক একটা গরুর মাংস ১ মণ হিসাবে ধরিলে মাত্র দেড় লক্ষ গরু পশ্চিমের একটা প্রদেশে হত্যা করা হয় ও তাহার মাংস "স্বচ্ছন্দ-বন-জাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে" যে দগ্ধোদর তাহারই পরিপূরণার্থে ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালা দেশ হিন্দুপ্রধান দেশ। সুতরাং হিন্দুরা.বিশেষতঃ হিন্দু গোয়ালারা এই গোহত্যার জন্য কত দায়ী দেখুন। E. I. R. আর B. N. R. এই দুই রেল কোম্পানী বৎসরে দুই লক্ষ মণ গোমাংস চালান দেন, তাহা ছাড়া দেশের মধ্যে প্রত্যহ কত যে গরু হত্যা করা হয় সে কথা ছাড়িয়াই দিন।

বাঙ্গালাদেশে প্রতি বৎসর এই যে অন্ততঃ দুই লক্ষ করিয়া গরু হত্যা করা হইতেছে ইহার জন্য দায়ী কে?

মরেনো সাহেব খ্রীষ্টান হইয়াও যে কথা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, অধিকাংশ গরুর মালিক ত হিন্দু; তাহারা যদি কসাইকে গরু না বেচে তবে কসাই গরু পায় কোথা হইতে? গোয়ালারা এইজন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। কলিকাতার ন্যায় সহরে দুধ ফুরাইবামাত্র গোয়লা ফুকা দিয়া যত পারে গরুর রক্ত শোষণ করিয়া অবশিষ্ট কঙ্কালটীকে কসাইর হাতে তুলিয়া দেয়। ইহাতে তাহার হিন্দু-প্রাণের কোথাও আঘাত লাগে না!

আবার ইহার ফলে দুগ্ধ ও ঘৃতের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে দেখুন—

দুগ্ধের মূল্য ১৯১৫ সালে ৵০ সের
১৯১৮ সালে ।/০ ,,
১৯২০ সালে ॥০ ,,
১৯২১ সালে ॥৵০ সের

ঘৃতের মূল্য—
১৭০০ সালে ৪ টাকায়
১৮০০ ,, /৩॥০ ,,
১৯১৫ ,, /৬/০ ,,
১৯১৮ ,, /॥/০ ,,
১৯২০ ,, /।৵০ ,,

এখন প্রতিকারের উপায় কি?

মরেণো সাহেব বলেন—

১। যে গোয়ালা কসাইকে গরু বিক্রয় করিবে তাহাকে একঘরে কর।

২। গোশালার উন্নতি কর।

দাতব্যের উপর না চালাইয়া ব্যবসা হিসাবে গোশালা চালান উচিত। Dairy farm খুলিলে লাভের আশা যথেষ্ট আছে। গবাদি জন্তুর আহার ও রোগের চিকিৎসার ও উপায় হইবে। খাঁটী দুধ ও পাওয়া যাইবে।

যে দেশে পশুর অভাবে জমি চাষ হয় না, গোবর অভাবে জমিতে সার যথেষ্ট দেওয়া হয় না, দুগ্ধ অগ্নি মূল্য, তাহাও খাঁটি পাওয়া অসম্ভব, দুগ্ধ অভাবে দেশে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা খুবই বেশী, সেই দেশে গরুর প্রতি এত অযত্ন এত অবহেলা,—ইহা কি নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত নহে? কেবল পরের মুখের দিকে সাহায্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকিলে কি হইবে—

সে জাতিকে আল্লাহ্ তোলেন না
যে জাতি নিজে না ওঠে—কোরাণ।

——

—রাখাল।



বিবিধ প্রসঙ্গ

"কুশদহ" আবার প্রকাশিত হইল। যিনি এতদিন "কুশদহ" প্রকাশিত করিয়া আসিতেছিলেন সেই ভূতপূর্ব্ব "কুশদহ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের নিকট আমরা এই পত্রিকা প্রকাশিত করিবার অধিকার পাইয়া তজ্জন্ত তাঁহাকে আমাদের বহু ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি 'কুশদহ' পত্রিকার ব্যক্তিগত পরিচালন বন্ধ করায় দেশের মধ্যে এতাদৃশ একখানি মাসিক পত্রের অভাব বিশেষ অনুভূত হইতেছিল। কুশদহ-সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচার করিবার জন্য ও সমিতির উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে একখানি মাসিক পত্র একান্ত আবশ্যকীয় বোধ হওয়ায় সমিতি এই 'কুশদহ' পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় পত্রিকার সমুদয় সর্ত্ত ত্যাগ করতঃ ইহা সমিতির মুখপত্র রূপে সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দান করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয় আপন প্রাণের গভীর ঐকান্তিকতায়, দেশের দুঃখ দৈন্যের প্রতি দেশবাসীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার জন্য, তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেশের মধ্যে এই পত্রিকার প্রচার দশ বৎসর কাল, নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও, অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কুশদহ-সমিতির জন্ম হওয়ায় তাঁহার পত্রিকা পরিচালনের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিয়াছে এই বিশ্বাসে তিনি ইহা পরিচালন বন্ধ করেন।

সমিতি এই পত্রিকার পুনঃ পরিচালনভার গ্রহণ না করিলে একটা মহান কর্ত্তব্য হানির দোষে দুষ্ট হইতেন। বলিয়া মনে হয়।

সমিতির আদর্শ দেশের মধ্যে পল্লীগ্রামের অধিবাসীগণের নিকট যাহাতে সম্যক পরিস্ফুট হয় তাহাই বর্ত্তমান "কুশদহর" মুখ্য উদ্দেশ্য। * * * *

সমিতির মুখপত্র 'কুশদহ' কি ভাবে পরিচালিত হইবে, তাহা লইয়া অনেকে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। পত্রিকার মধ্যে ছোট গল্প, উপন্যাস, বা নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য বিষয়ক কোন কিছু স্থান পাওয়া উচিত কিনা এতদ্ সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল। এমনও একজন পত্র লিখিয়াছেন যে পত্রিকায় * * * প্রলোভন পূর্ণ উপন্যাসাদি না ছাপাইয়া ইহা কেবল সরল ভাষায় দেশ হিতকর বিষয়ের প্রবন্ধাদিতে পরিপূর্ণ করিতে ইত্যাদি।

মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া "কুশদহকে" সাহিত্য গৌরবে সমৃদ্ধিশালী করিতে চেষ্টা করা উচিৎ। সাহিত্য হিসাবে সুষ্ঠু ও শ্রীসম্পন্ন মাসিকপত্রের কুরুচিপূর্ণ হওয়া যে একটা আবশ্যকীয় অঙ্গ তাহা মনে হয় না। দেশমাতৃকার সেবার পবিত্র মন্দিরপ্রাঙ্গণে অথবা বাণীর পূতচরণতলে,—এই দুইএর কোথায়ও ঐ সকলের স্থান নাই। যাহাতে সমিতির আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে তৎপ্রতি সমিতির মুখপত্র "কুশদহ"র সতর্ক দৃষ্টি থাকিবেই, কিন্তু কেবল নিরবচ্ছিন্ন উপদেশাত্মক ও গভীর গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধে পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিলে তিক্ত ভেষজের মত অধঃকরণের অযোগ্য না হইয়া ওঠে সেও একটা ভয় আছে। তাহা ছাড়া সমিতির উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে 'কুশদহ'র বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক; পত্রিকার প্রচার দেশবিস্তৃত না হইলে কখনও সমিতির উদ্দেশ্য

সংসাধিত হওয়া সম্ভব হইবে না। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলা দেশের সম্পাদকগুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীর ন্যায় মাসিক পত্রের সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৈশাখ সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ যোগ্য—

" * * ইহাও মনে রাখা দরকার যে সকল গল্প ও উপন্যাস নিষ্প্রয়োজন বা অসার নহে। তা ছাড়া ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে বাংলা দেশে মাসিক কাগজের অস্তিত্ব ও বহুল-প্রচার গল্প ও উপন্যাসের উপর নির্ভর করে। অবশ্যতা বলিয়া যা তা ছাপিবার পক্ষপাতী আমরা নহি। কিন্তু সংসারের কাজে লাগিতে হইলে বাঁচিয়া থাকা চাই এবং **বাংলা মাসিক পত্রিকাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ভাল গল্প ও উপন্যাস চাই।** ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা"।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যদি এই অভিজ্ঞতা হয় ও তাঁহার মন্তব্য যদি প্রবাসীর ন্যায় মাসিক পত্রের পক্ষে খাটে তবে আমাদের ইহার উপর কথা না বলাই ভাল।

* * * *

"কুশদহ"র আকার বড় করা হইল, সকল রকম সুবিধার জন্য "কুশদহ" পূর্ব্বপ্রচারিত দশম বৎসরের পরও বর্ত্তমান সংখ্যা নব-পর্য্যায়, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বলিয়া গণনা করা হইল।

বর্ত্তমানে মুদ্রাঙ্কন ও কাগজের মহার্ঘ্য হেতু পত্রিকার ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার উপর সচিত্র করিতে হইলে ত কথাই নাই।

"কুশদহ"কে বিবিধ প্রকারে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ করিবার এবং চিন্তাশীল লেখকগণের সুচিন্তিত প্রবন্ধাদিতে পরিপূর্ণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। সময়াভাব বশতঃ প্রথম সংখ্যায় চিত্রাদি দেওয়া সম্ভব হইল না।

—•—

কুশদহ সমিতির তৃয় বার্ষিক অধিবেশন ও তদুপলক্ষ্যে কৃষিশিল্প প্রদর্শনী এবার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ব্যাপার জগৎ-পূজ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবার সমিতির অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে সমিতির কার্য্যে সহানুভূতি ও যোগদান এবং পুরোহিতের কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ইহা হইতেই সমিতির প্রতি দেশবাসীগণের শ্রদ্ধা শতগুণ বর্দ্ধিত হওয়া উচিৎ। যেখানে মূলে ঐকান্তিকতা, স্বার্থত্যাগের ভাব ও যথার্থ কর্ম্মস্পৃহা নাই এরূপ কার্য্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কখনও সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান বৎসরে সমিতি তাঁহার ন্যায় একজন নিকষমণিকে মস্তকে ধারণ করিয়া নিজের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, ও বহু গৌরব মণ্ডিত হইয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতার মধ্যে যে কয়টা কথা বলিয়াছেন তাহার সকল গুলিই যেন মূল্যবান হীরকখণ্ডের মত। কুশদহ সমিতি যেন সভা সমিতির ক্ষণিক উত্তেজনায় মত্ত হইয়া সভাপতির আসনে অধিরূঢ় সেই ঋষির জীবন ও তাহার আদর্শের কথা ভুলিয়া না যান। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জগতে অদ্বিতীয় রাসায়নিক বলিয়া সমিতির পূজ্য তত নহেন যত তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চারিত্রের জন্য! ঐ মহাত্মার জীবন হইতেই এই একটা মহাসত্য প্রমাণ হইতেছে যে চরিত্রই সকল উন্নতির মূল। প্রফুল্লচন্দ্রকে যে যে ভাবেই শ্রদ্ধা করুক তাঁহার চরিত্রই সমিতির এক মাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া উচিৎ।

* * * *

কত মূল্যবান্ কথাই না তিনি বলিয়াছেন। "আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে।" "ইতর ভদ্র" এক হইতে হইবে।" পল্লীবাসী কৃষকদিগের সহিত শিক্ষিত বাবুদিগের এক সঙ্গে দুঃখ দৈন্যের বিরুদ্ধে শক্তিচালনা করিতে হইবে। "আমি পাড়াগেঁয়ে" বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র তাহার বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদেশিক সম্মানের মহামূল্য সম্ভার যাঁহার নিকট তুচ্ছ, খাস বিলাতে যিনি ছয় বৎসর কালাধিক কাটাইয়া আসিয়াছেন, আমাদের দেশে এমন কোনও রাজপুরুষ বা সাহেব নাই যিনি তাঁহার সঙ্গে পরিচয় ও আলাপ করিতে পাইলে ধন্য না হয়েন সেই Sir P. C. Roy Kt. CIE, DSc. যদি নিজেকে পাড়াগেঁয়ে আর নিরক্ষর কৃষকদিগকে'ভাই সব'বলিয়া বলিয়া সম্বোধন করিতে কুণ্ঠিত না হ'ন তবে আত্মাভিমান শূন্যতার ইহা অপেক্ষা উজ্জলতর দৃষ্টান্ত আর আছে কি? আর

এই ঋষিকে যে যজ্ঞের হোতার পদে বরণ করা হইয়াছে তাহার উপচার সংগ্রহকারীদিগের মধ্যে বা অপর কাহারও অর্থ ও সম্মানের গর্ব্ব এবং আভিজাত্যের অভিমান দেখাইবার স্থান কোথায়? নাই। নাই। নাই। প্রফুল্লচন্দ্র বার বার বলিয়াছেন "ছাড় সেই আত্মাভিমান 'ইতর' বলিয়া আর নাসিকা কুঞ্চিত করিও না।" যে রোগ শোকের পীড়নে ইতর ভদ্র সকলকে সমান ভাবে নিষ্পেষিত হইতে হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিতেই হইবে ইহা ছাড়া অন্য গতি নাই।

ফুরফুরের পীর সাহেব ধার্ম্মিক নীতিবিদ ও জ্ঞানী। তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও শিক্ষায় চলে। মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে—

এবার তিনি সমিতির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে গোবরডাঙ্গায় গিয়াছিলেন। অন্ততঃ পক্ষে দশ হাজার গ্রাম্য কৃষক মুসলমানকে একত্রিত করতঃ প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী সারগর্ভবক্তৃতা, করেন। সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। পীর সাহেবের বক্তৃতায় ভাষার তেজস্বীতা ও বিষয়ের সময়োপযোগীতা এত মর্ম্মগ্রাহী যে সেই বিপুল জনসঙ্ঘ তিন ঘণ্টাধিক কাল জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া একাগ্র চিত্তে তাঁহাকে শ্রবণ করিয়াছিল। কয়েকটি কাজের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—। মুসলমান ভাইদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"ভাই সব:—

১। হিন্দু—ভাইদের সঙ্গে ধর্ম্মের পার্থ্যক্য নিয়ে ঝগড়া কোরোনা—ঝগড়া করা কোরাণের শিখান নয়। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে দেশের কাজে লাগো।

২। বিলাসিতা ছেড়ে দাও—মোটা কাপড় পর চরকা কাট। বিবির গায়ে মোটা কাপড়ের আচড় লাগলে চলবে না। লণ্ঠন ফেলে চেরাগ জ্বাল। এলুমেন ছেড়ে মাটির হাঁড়ি ধর, কাঁসার বাসন ধর।

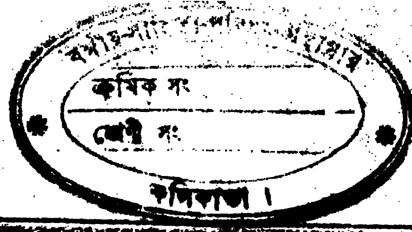
৩। মকদ্দমা কোরোনা—কোরাণের বারণ। ফল—অর্থক্ষয়, মনস্তাপ, বন্ধুবিচ্ছেদ। সালিশী কর পাঁচটা ভদ্রলোক ডেকে একজন পণ্ডিত আর একজন মৌলবী ডেকে ঝগড়া মেটাও। মিছে উকীলের থলে ভর্ত্তি করে ফল কি।

৪। মুষ্টি চাউল জমাবার ব্যবস্থা কর। দশ জনে যাকে বিশ্বাস করে এমন একজনকে তহবিলদার করে তার কাছে রোজ এক মুঠা চাল জমা রাখো। যাদের অনাটন পড়বে তারা ৭ দিন অন্তর সেই চাল বেঁটে নিক্।

পীর সাহেবের এই সকল অমূল্য উপদেশ বৃথা হইবে না। দেশবাসী হিন্দু মুসলমান তাঁহাকে মৌখিক শ্রদ্ধা করে মাত্র ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা আশা করিতেছি, সেই সমবেত দশ সহস্র পল্লীবাসীর প্রতি ঘরে ঘরে পীর সাহেবের এই উপদেশ গুলি কার্য্যে পরিণত হইবে।

এবারকার কৃষিশিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীও মন্দ হয় নাই। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানীয়—শিল্পী ও গবর্ণমেণ্ট হইতে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প ও মৎস্য বিভাগের আয়োজনই এবার সমধিক। দেশীয় শিল্পী ও কৃষকগণের প্রদর্শিত দ্রব্যাদির সম্ভার গত বৎসর অপেক্ষা এবার আরও অধিক হইবে আশা করা গিয়াছিল কিন্তু বস্তুতঃ মোটের উপর এবার স্থানীয় প্রদর্শকগণ সংখ্যায় অতি অল্পই ছিলেন।

সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার সম্বন্ধে সহায়তা করিবার জন্যই সমিতির বাৎসরিক উৎসবের সঙ্গে এই প্রদর্শনীর আয়োজন। একাধারে শিক্ষাপ্রদ ও প্রচার এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া বেশ সহজেই সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু প্রতি বৎসরই সমিতির এই বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যেরূপ লোক সমাগম হইতেছে তাহাতে সমিতির কথা বেশ করিয়া সকলকে বুঝান সম্ভব নহে। অথচ সমিতির এই ব্যাপারটা মোটের উপর যাহাতে প্রচলিত "বারোয়ারীর" মেলা বা যাত্রা থিয়েটারে পরিণত না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। আনুমাণিক দশ সহস্র পল্লীবাসী নরনারী এই উৎসব উপলক্ষে একত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের মধ্যে শতকরা দশজনের মনেও কুশদহ সমিতির সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা না জাগিয়া থাকে এবং কেবলমাত্র মেলা দেখিয়া মিঠাই মণ্ডার বাজার ও যাত্রা থিয়েটারের আমোদ উপভোগ করিয়া তাঁহারা ঘরে ফিরিয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে সমিতির এই অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।





স্থাপিত ১৩২৪ সাল

কুশদহবাসী সকল শ্রেণীর লোকের সমবেত চেষ্টায় কুশদহের নানা স্থানে আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা বিবিধ লোক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

কুশদহ সমিতির তীয় বাৎসরিক অধিবেশন ও তদুপলক্ষে বিরাট কৃষিশিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

স্থান—গোবরডাঙ্গা জমীদার বাটী।

তারিখ—১২ই চৈত্র শুক্রবার হইতে ১৪ই চৈত্র, সোমবার পর্য্যন্ত।

সভাপতি—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত শশীশেখর বসু ২৪পঃ ডিঃবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

সমিতির তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন এবার মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে দেশবাসী অনুন দশ সহস্র নরনারী সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

দেশবাসীগণের সে অপূর্ব্ব সম্মিলনে লতা পল্লবাদি-মণ্ডিত জমীদার বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল।

কুশদহ অন্তর্গত প্রায় ৪০ খানি গ্রামের অধিবাসী দরিদ্র কৃষক হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বসু এম, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত পীযুষ কান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত ডাঃ কেশব চন্দ্র লাহিড়ী, মিঃ স্মিথ, (কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার,) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় প্রভৃতি বহু আমন্ত্রিত মহোদয় এবং গোবরডাঙ্গার জমীদার বাটীর সকলে, শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সহায় নারায়ণ পাল প্রভৃতি দেশবাসী গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রারম্ভিক সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত শশীশেখর বসু মহাশয় কয়েকটি সুচিন্তিত কথায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ব্যাপার সম্পন্ন করেন। ২৪ পঃ ডিঃ বোর্ড হইতে সমিতি প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য শ্রীযুক্ত পতিরাম

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত শশী বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সমিতির অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইতে বেলা ৩টা বাজিয়া যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র তাঁহার সুচিন্তিত ভাষায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দোপাধ্যায় আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে সভাপতি পদ বরণ করিয়া কয়েকটি ভাবপূর্ণ কথা বলেন। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের গুণ-গরিমায় বিহ্বলচিত্ত হইয়া বক্তা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত সহায় নারায়ণ পাল ও শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায়* মহাশয়দ্বয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে সভাপতি আসন পরিগ্রহ করেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় উপস্থিত অনুমান ছয় সহস্র লোককে বিষদভাবে বুঝাইয়া দেন, যে পল্লীগ্রামের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি এবং কৃষির উন্নতিতেই জাতির উন্নতি সাধিত হয়। এতদুদ্দেশে, কিসে আমাদের দেশ হইতে রোগ-শোক দুরীভূত হইয়া দেশ-বাসীর স্বাস্থ্য ভাল হয়, কিসে দেশে ফসল ভাল হয়, এবং কিসে আমাদের অর্থাগম হয় সে সম্বন্ধে কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি নির্ধন, কি ইতর কি ভদ্র,—আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু চেষ্টা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর Mr. Smith সাহেব কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ বিষয় শ্রোতৃমণ্ডলীকে সংক্ষেপে জ্ঞাপন করেন এবং তাহা বাঙ্গালা ভাষায় সমাগত জনগণকে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা আমূল অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

পর দিবস শ্রীযুক্ত বাবু পিযুষকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় স্থানীয় যুবকবৃন্দকে সম্পবদ্ধ হইয়া দেশ-সেবা শিক্ষা-লাভ করিয়া বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে এবং এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যে যে সকল অনুষ্ঠান আমাদের করায়ত্ত আছে, সে সকলের যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

পরে জীব-শিব মিশনের স্থাপয়িতা ডাঃ শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় সভাস্থ জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন যে ব্যক্তিগত-স্বরাজ লাভ করিতে পারিলেই আমাদের স্বরাজ লাভে আর কাল বিলম্ব হইবে না। অনন্তর শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় মহাশয় পল্লী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা সকলকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

জমীদার বাটীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপ সজ্জীকৃত হইলেও জনতা এত বেশী হয় যে বহিঃপ্রাঙ্গণেও একটী মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বনামখ্যাত ফুরফুরের পীর সাহেব মহাশয় প্রায় দশ সহস্র লোককে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্যই আমাদের অবনতির মূল। অতএব পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইয়া যাবতীয় বিলাসিতা বর্জ্জন পূর্ব্বক সকলেই দেশোন্নতি-বিষয়ক ব্যবস্থায় অবহিত হওয়া উচিত।

দুই দিবসই সন্ধ্যার পর Bentley সাহেবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় চিত্রাবলী বায়স্কোপে প্রদর্শিত হয়। পল্লীস্বাস্থ্যের মূলনীতিগুলি অগ্রাহ্য করার কুফলে লোকের কতরূপে সর্ব্বনাশ হয় সেই বিষয়ের চলচ্চিত্রাবলী বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

অধিবেশনের চতুর্থ দিবস কেবল মহিলাদিগের জন্য খোলা ছিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীনিশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
কুশদহ সমিতির সম্পাদক।

*এই উপলক্ষে রচিত কবিতা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

বিনা মূল্যে কুইনাইন বিতরণ।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার ডাক্তার বেণ্টলী সাহেব ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকল্পে কুশদহ সমিতির অন্তর্গত গ্রামসমূহের অধিবাসিগণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য প্রায় তিন শতাধিক টাকার কুইনাইন কুশদহ সমিতিকে দান করিয়াছেন কুশদহ সমিতি এজন্য গভর্ণমেণ্ট ও ডা বেণ্টলীঃ সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ঘরের কথা

সভা সমিতি

খাটুরা পাঠাগার ও আলোচনা সভা।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী খাটুরা পাঠাগারের তত্ত্বাবধানে খাটুরা স্কুল প্রাঙ্গণে জনসাধারণের এক বিরাট সভা হয়। গোবরডাঙ্গার জমীদার শ্রীযুক্ত সতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় এই সভায় ছায়া চিত্রাদি সহযোগে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত স্থানে আর একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত সতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়গণ বিবিধ শিক্ষাপ্রদ ও জনহিতকর বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত,
সম্পাদক

গোবরডাঙ্গার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ত্রয়োদশ অধিবেশন।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
" কুমুদ বিহারী রায়
" তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,
" হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
মুন্সী সরিউদ্দীন আহেদ

সভায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি অনুপস্থিত থাকাতে শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্বে মনোনীত হইলেন। সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টর মৌলবী সুলেমান সভায় উপস্থিত থাকিয়া নানাবিধ উপদেশ দিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সহায়তা করেন।

১। গত সভার কার্য্য বিবরণী পাঠ ও মঞ্জুর করা হইল।

২। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১ম। বর্ত্তমান কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কাল আগামী জুন মাসে শেষ হইবে বলিয়া পুনরায় কমিটী গঠন করে ২২শে এপ্রিল দিন স্থির হইল।

২য়। (ক) মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের ৫ ধারা মতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী ও (খ) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করা হউক।

৩য়। সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টরের উপদেশমতে ও য়ুনিভার্সিটীর নিয়মানুসারে স্থির হইল যে তৃতীয় শিক্ষক কর্ম্মত্যাগ করাতে তাঁহার পদে একজন গণিতেব্যুৎপন্ন বি, এ অথবা বি, এস সি, শিক্ষক নিযুক্ত করা হউক ও চতুর্থ শিক্ষকের পদ খালি হওয়াতে সেই স্থানে একজন আই, এস সি নিযুক্ত করা হউক ও আর একজন ম্যাট্রিকুলেট নিযুক্ত করিয়া মোট দুইজন ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষক নিযুক্ত হউক। উপস্থিত এগার জনের পরিবর্ত্তে ১০ জন শিক্ষক নিযুক্ত হউক। গ্রাজুয়েট ৩, ইন্টার মিডিয়েট ২, কাব্যতীর্থ ১, নর্ম্মাল ১।

হেড মাষ্টার সপ্তাহে ১৮ পিরিয়ড ক্লাশ লইবেন ও অন্যান্য প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিদিন এক পিরিয়ড বিশ্রাম পাইবেন এবং অষ্টম শ্রেণী উঠিয়া যাইবে।

যে সকল শিক্ষক ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষোত্তীর্ণ নহেন তাঁহাদের কার্য্যত্যাগ করাতে যে চারিটী খালি হইবে, তাহার জন্ত অমৃতবাজার ও কুশদহ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক।

৪র্থ। স্কুলের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদিগের প্রত্যেকের মাসিক সাহায্যের হার ২৫৲ টাকা করিবার জন্ত অনুরোধ করা হউক ও অন্যত্র হইতেও চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করা হউক।

৫ম। ছাত্রদের বেতনের হার সম্প্রতি বৃদ্ধি করা হইয়াছে, সুতরাং পার্শ্ববর্ত্তী স্কুলসমূহে বেতন বৃদ্ধি না হইলে এখানে বেতনের হার পুনর্ব্বৃদ্ধি করা যাইবে না। শিক্ষাবিভাগের ও প্রতিষ্ঠাতাদিগের সাহায্য সম্বন্ধে আবেদনের ফলাফল জানিতে পারিলে শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

৬ষ্ঠ। শিক্ষকদিগের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পরিচালন জন্য নিয়মাবলী করিবার ভার কুমুদবিহারী রায়, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের উপর দেওয়া হইল।

৭ম। সহকারী ইন্‌স্পেক্টরের উপদেশমত স্কুলের পার্শ্ববর্ত্তী পুরাতন ডাক্তারখানার তলস্থ জমি স্কুলের সামিল করিয়া দিবার জন্য জমিদার মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা করা হউক, এবং বর্ত্তমান স্কুল সম্পূর্ণ মেরামত করা ও বর্ত্তমান জলখাবার ঘর ভগ্ন করিয়া তৎস্থলে একটী হল ঘর নির্ম্মাণ করিয়া স্কুলগৃহের আয়তন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা অবিলম্বেই হউক। এতৎকল্পে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করার নিমিত্ত কমিটী গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

৮ম। যে বাটীতে পোষ্টাফিস ছিল সেই বাটী স্কুলের সামিল করিয়া দিবার জন্য জমিদারদিগকে অনুরোধ করা হউক।

৯ম। আগামী ৭ই তারিখের য়ুনিভার্সিটীর কন্‌ফারেন্সে হেডমাষ্টারকে প্রেরণ করা হউক এবং এ বিষয়ে ২০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারকে জানান হউক।

১০ম। সহকারী ইন্‌সপেক্টরের উপদেশ মতে নিম্নলিখিতরূপে শিক্ষক নিযুক্ত হউক। গ্রাজুয়েট ৩ জন, আই এস্‌সি ১, আই এ (পার্শি ইংরাজী অভিজ্ঞ) ১, সংস্কৃত অভিজ্ঞ আই এ ১, ম্যাট্রিকুলেট ২, কাব্যতীর্থ ১, V. M. ১,

১১শ। ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের শারীরিক অবস্থা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হওয়ায় শিক্ষা বিভাগের মঞ্জুরের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তাঁহাকে দেওয়া হউক।

(স্বাক্ষর) শ্রীপতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি।

—•—

রিসার্ভ ট্যাঙ্ক।

গৈপুরের রিজার্ভ ট্যাঙ্কটির অপব্যবহার হইতেছে এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি আবশ্যক। যাহাতে জল কলুষিত না হয় তজ্জন্যই অর্থব্যয় করিয়া রিজার্ভ ট্যাঙ্ক করা হইয়াছিল। কিন্তু যদি তাহা রক্ষণাবেক্ষণ না করিয়া যথেচ্ছা স্নান ও ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইতেছে।

——o——

চোমদা-লোকপুল রাস্তা।

কুশদহ সমিতি বরাবরই কয়েকটি রাস্তা মেরামত জন্ত ডিঃ বোর্ডকে বিশেষ ভাবে লেখালেখি করিতেছেন। তন্মধ্যে চোমদা হইতে লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটির অবস্থা বিশেষ ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের সানুগ্রহ দৃষ্টিপাতের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। ঐ রাস্তাটি প্রায় আজ দশ বৎসর হইল লোকাল বোর্ডের অধীনে আসিয়াছে—এবং সেই পর্য্যন্তই ইহা পূর্ব্বে যে পাকা রাস্তা ছিল তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতঃ বরাবরই মাটি ফেলিবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। বৎসরান্তে সামান্য দু'চার ঢেলা মাটির দ্বারা এরূপ রাস্তার কোনও স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না—অথচ প্রতিবৎসরই এইভাবে অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে অথচ তাহার ফল কিছুই হইতেছে না। বর্ষার সময় রাস্তায় প্রায় ২ফুট ৩ফুট কাদার নীচের পূর্ব্বেকার পাকা ইটের উপর দিয়া হাঁটা বা গরুর গাড়ী চলা কত অসুবিধা ও বিপদজনক তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবে না। ২৪পঃ ডিঃ বোর্ডের সহৃদয় ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শশীশেখর বসু এম্ এ বি এল্ মহাশয় কুশদহসমিতির প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন

উপলক্ষে গোবরডাঙ্গায় আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এই রাস্তাটির পুনঃ সংস্কার জন্য বর্ত্তমান বর্ষে বিশেষ চেষ্টা করিবেন এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। সহৃদয় শশী বাবুকে আমরা তাঁহার এই শুভ সংকল্প জন্য ধন্যবাদ দিতেছি এবং বলিতে চাই যে কার্য্যে যে ডিঃ বোর্ড হইতে এ সকল অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে এরূপ অবহেলা দেশবাসীও কর্ত্তৃপক্ষ কাহারও পক্ষে প্রশংসার কথা নহে।

অনাথা মাতৃকা—বঙ্গে বিধবার সংখ্যা ৪৬ লক্ষের উপর। ইহাদের শতকরা ২ জন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির আয় ভোগ করেন। শতকরা চার জন ঝি বা রাঁধুনীগিরি করেন এবং শতকরা ৯৪ই জন অন্যের পোষ্য। ইহাদিগকে পালন করিতে আমাদের ৭০ কোটী টাকা ব্যয় হয়—(হিন্দুরাষ্ট্রিকা) প্রবাসী—

যাঁহাদের চরকায় সুতা কাটিতে দক্ষ স্ত্রীলোক দরকার তাঁহারা নিম্নের দুই ঠিকানায় খোজ করিবেন :—

১। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল ৪৬ নং ঝাউতলা রোড বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

২। মুক্তি মিশন উইভিং এণ্ড নিভেল ওয়ার্ক কেড পাওন, পুনা সহর।—শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম (প্রবাসী)

সাপে কাটায় পরক্ষণেই 'রাখালছিটকা' (রাখাল শশা) গাছের সিকিটাক পাতা, এক আমা পরিমাণ যে কোনও লবণ দিয়া হাতে মাড়িয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিবেন। সর্পবিষে কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না যদি রোগী মুমূর্ষ অবস্থাহেতু গিলিতে অক্ষম হন তবে যে কোনও উপায়ে উহার পেটের ভিতর দিতে পারিলেই রোগী বাঁচিতে পারেন—(সেরাজ যশোরী প্রবাসী)

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

বর্ত্তমানে মুদ্রাঙ্কণের মূল্য বৃদ্ধির উপর ডাকমাশুল বৃদ্ধি হওয়ায় পত্রিকা পাঠানর বার্ষিক ডাক খরচ ছয় আনা বাদ গ্রাহকগণের নিকট হইতে দুই টাকা স্থলে সডাক বার্ষিক মূল্য ২।৶০ লওয়া হইবে। যাঁহারা ইতিমধ্যে দুই টাকা দিয়াছেন তাহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ছয় আনার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। নূতন গ্রাহকগণ ২।৶০ পাঠাইলে এক বৎসরের জন্য 'কুশদহ' পাইবেন।

আদালত হইতে 'কুশদহ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার অনুমতির অপেক্ষায় বর্ত্তমান সংখ্যা বাহির করিতে এত দেরী হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাও ১লা বাহির না হইয়া বোধ হয় ৭ই বাহির করিতে পারা যাইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে নিয়মিত ১লা তারিখে বাহির হইবে। গ্রাহকগণ এই ত্রুটীর জন্য ক্ষমা করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ "কুশদহ"
৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

ভ্রম সংশোধন।

"আমার কথা" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ রক্ষিত মহাশয়ের নাম ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত ছাপা হইয়াছে। রক্ষিত মহাশয়ই ঐ প্রবন্ধের লেখক।

Printed at the CARMICHAEL PRESS, 179, Maniktala St., by N. N. Mukerjee Published by him from 87, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

কুশদহ

(কুশদহ সমিতির মুখপত্র)

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

কার্য্যালয়

৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—:o:—

নব পর্য্যায়, ১ম বর্ষ | বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৵০ প্রতি সংখ্যা ৵০ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ ২য় সংখ্যা

Cover Printed at the PHŒNIX PRITING WORKS,—29, Kalidas Sinha Lane, Calcutta.

মিলন

শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল দাস মহাশয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত।

কুশদহ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

নবপর্য্যায় ১ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ | ২য় সংখ্যা।

দেশের ডাক

আজ্‌কে আমার ক্ষুদ্র প্রাণে কে দিয়েছে ডাক,
কোন্ পূজারই অনুষ্ঠানে বাজিয়ে ঘন শাঁখ।
ওরে   বেদন-আহ্বানে
দুখের ঘায়ে ব্যথার বাণে পরাণ যে টানে!
যাইরে ছুটে যাই,—
ক্লিষ্ট শত পরাণ বলে—চাইরে তোরে চাই।

লক্ষ জনের কষ্ট-ব্যথা আজ ভরেছে বুক,
আমার বিপুল দেশের জনের বিপুল মহাদুখ।
ওরে   কাঁদ্‌ছে ভিখারী,
কাঁদ্‌ছে গরীব সহায়-হীনে বক্ষ বিদারি';
পিষ্ট কাঁদে ওই,—
কে যাবেরে তুল্‌তে বুকে, বীর কোথারে, কই।

ভবন-হীনার কাতর আঁখি, ক্ষুব্ধ জনার বাণী,
মলিন মুখের মৌন ব্যথা মিশিয়েছে রে হাস,
ওরে   কাঁদিয়ে দিয়েছে,
বুকের শিরা উপশিরায় আগুন জেলেছে!
আর পারি না আর,—
আমায় ডাকে লক্ষ বেদন, নীরব থাকা ভার!

কোথায় আজি হাসির মধু, প্রীতির মাধুরী?
নয়ন-আসার বেদন-পাবক উঠ্‌ছে বিচ্ছুরি',।
ওরে   হর্ষ কোথারে,
লক্ষ মলিন মুখের পরে পিশাচ আঁকারে!
কাঁদন ও হুতাশ—
দেশের দিশি ম্লান করেছে, ক্ষুব্ধ রে আকাশ!

বেদন ব্যথা দুঃখ শোকে আজ ঘিরেছে দেশ,
তা'রা সবাই আমায় ঘিরে' বিরাট রচে ক্লেশ।
ওরে   দিচ্ছে ঘন ডাক,
দুখের নিবিড় ব্যথায় বুকে বাজায় যেন শাঁখ।
যাই রে ছুটে যাই,
দুখের পূজায় পীড়ার সেবায় পরাণ-বলি চাই।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

চুরি

(গল্প)

১

"মা, মা, চেয়ে দেখ, ছেনু কি পরে এসেছে—"

মা চপলা হেঁট হইয়া ক্ষিপ্র হস্তে কতকগুলি ময়লা জামায় সাবান দিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া মেয়ের সঙ্গিনী ছেনুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাঃ বেশ দুল পরে এসেছিস্ তো, হাতে আবার বাঁশ প্যাটানের রুলি, দিব্যি গড়ন, দিব্যি ঝকঝকে পালিশ হয়েছে তো, কোন্ স্যাঁকরায় গড়লে ?"

ছেনু অগ্রসর হইয়া চপলার পায়ের ধূলা লইতেই তিনি তাড়াতাড়ি বাল্‌তির জলে সাবান-হাত ধুইয়া ফেলিয়া ছেনুর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা লইয়া কহিলেন "বেঁচে থাক মা, সোনার ঘর বর হোক্, বেশ গয়না হয়েছে।"

ছেনু কহিল,"শত্রুঘন স্যাঁকরা গড়েছে, ঢাকা থেকে সে নতুন কারিকর আনিয়েছে, সে খুব ভাল কাজ জানে, মায়ের সাত ভরিতে চমৎকার হার গড়েছে জ্যাঠাই মা, আপনি আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়ী বেড়াতে যাবেন, মা অনেক করে বলে দিয়েছেন; হারও দেখে আস্‌বেন।"

ছেনু আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। চপলা ডাকিলেন, "নতুন গয়না পরে পেন্নাম করেই চলে গেলি, একটু মিষ্টিমুখ কল্লিনে ছেনু ?"

ছেনু ততক্ষণে বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতেই উচ্চস্বরে কহিল, "আরও দু'তিন বাড়ী যেতে হবে জ্যাঠাই মা, সন্ধ্যের আগে বাড়ী না ফিরলে ঠাকুরমা রাগ করবেন, কাল এসে মিষ্টিমুখ ক'রে যাব !"

মেয়ে বিজলী কহিল, "তোমার তো মিষ্টি ! বাতাসা আর পাটালী !" চপলা কহিলেন,"সেই তো গেরস্ত ঘরের নিত্যিকার দরকারী জিনিষ, সন্দেশ রসগোল্লা তো সাধ করে খাওয়া।"

জামাগুলি কাচিয়া, পড়ন্ত রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া, চপলা বিজলীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কাজ কর্ম্ম কি আছে সেরে নিগে বিজু ; খুকী ঘুম থেকে উঠে কান্না সুরু করলে, আর কিছু করতে দেবে না।"

বিজলীকে তথাপি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চপলা হাসিয়া কহিলেন, "তুই কি ভাবছিস্ তা' আমি জানি, ছেনুর মতন দুল, ছেনুর মতন বালা তোরও কেন হ'ল না, তাই ভাবছিস্ না ?"

বিজলীর গাম্ভীর্য্য আর টিকিল না, অল্প হাসিয়া আবার ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পাছে অবাধ্য হাসি আবার ঠোঁটের ফাঁকে বাহির হইয়া গাম্ভীর্য্যের অমর্য্যাদা করে। মা আবার কহিলেন, "এ বছর চুপ-চাপ করে থাক্ বিজু, আর বচ্ছর পুজোর সময় নিশ্চয় তোর দুল আর রুলি গড়িয়ে দেবো।"

বিজু ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "তুমি তো রোজই ঐ কথা বল।" সে আর বেশী বলিতে পারিল না, চোখে তার জল ভরিয়া আসিল, মা ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ছিঃ বিজু তোমার কি বাহানা করা সাজে ? তুমি অত বড় মেয়ে, অবস্থা বোঝ না ? আমার কি সাধ নয় যে তোমায় গয়না গড়িয়ে দিই ? ছেনুর বাবার মতন অবস্থা হ'লে, তোমারও যখন-তখন নতুন গয়না হ'তে পারত; তা যখন নয়, তখন চুপ করে থাকাই ভাল, ভগবান দিন দেন, তুমিও অমন গয়না পরবে"। সদ্য নিদ্রাভঙ্গে খুকী কাঁদিয়া উঠিল। বিজলী আর কিছু না বলিয়া খুকীকে কোলে লইতে গেল।

২

ভাদ্রের দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যার মায়া ঘনাইয়া আসিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি হইয়া গেল। তারপর বৃষ্টি সম্পূর্ণরূপ থামিতে না থামিতেই, একখণ্ড ধূসরবর্ণ মেঘের ফাঁক দিয়া সূর্য্যের কনকবিজলী পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িল। বারান্দার উপরে বৃষ্টির ছাট আসিয়া যে জল জমিয়াছিল, ঝাঁটা দিয়া চপলা তাহা উঠানে ফেলিতে লাগিলেন। সেইসময় ছেনুকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া কহিলেন, "বৃষ্টিতে ভিজচিস্ কেন মা, আমার মদনের আজ জ্বর হয়েছে, জলে ভিজতে মানা করলে তো শোনে না ! তোরা বুঝি এইবার নেমন্তন্ন-বাড়ী যাচ্ছিস।"

ছেনু কহিল, "হ্যাঁ, বৃষ্টির জন্যে এতক্ষণ যেতে পারি নি, নন্তর মা'রা চলে গেছেন, আপনারা যাবেন না জ্যাঠাই মা? মা তো আপনাদের ডাকতে বল্লেন।" ছেনুর সাড়া পাইয়া বিজলী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ও ছেনুর প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য সাগ্রহে মা'র মুখের দিকে তাকাইল। চপলা কহিলেন, "আমার তো যাওয়া হবে না ছেনু, মদনের জ্বর হয়েছে, বিজলী যেতো, তা আমি না গেলে, তাকেও পাঠাবার ইচ্ছে নেই। খুকীকে কে নেবে, আমার রান্নাবান্না সব পড়ে আছে, এদিকে মদনও কান্নাকাটি করছে।"

ছেনু কহিল, "তা বিজলীকে যেতে দাও না জ্যাঠাই মা, ওদের নতুন বৌ না কি ভারী সুন্দর, বউভাতে কলকাতা থেকে খেমটার নাচ এসেছে।"

চপলা কহিলেন "যাবি বিজলী? চুল টুল কিছুই তো এখনো বাঁধা হয়নি—"

নূতন বৌ এবং খেমটা নাচ দেখিবার আগ্রহে বিজলীর নিমন্ত্রণ-বাড়ী যাইবার সখ এইবার প্রবল হইল। তবু সে প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া কহিল, "ভাল জামা কাপড় কিছু নেই, নেড়া বুঁচো হয়ে ঝি সেজে লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যেয়ে আমার দরকার নেই।"

মা কহিলেন "সেই ভাল, গরীবের নেমন্তন্নে না যাওয়াই ভাল, গিয়ে কাজ নেই।"

বিজলী কিন্তু এত খানির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার যাইবার ইচ্ছা ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ছেনু কহিল, "তোর সেই পার্শীশাড়ী আর নতুন ব্লাউজটা নিয়ে চল, মা পরিয়ে দেবেন, চুলও বেঁধে দেবেন, আমার একছড়া হার আর বালাটাও পরিয়ে দেব। যেতে দিন জ্যাঠাই মা, আপনার পায়ে পড়ি।"

সঙ্গিনীকে ছাড়িয়া ছেনুর যাইতে কিছুমাত্র আগ্রহ নাই দেখিয়া, চপলা আর আপত্তি করিলেন না। বিজলীও তাড়াতাড়ি বাক্স হাতড়াইয়া জামা কাপড় বাহির করিয়া, হাসিমুখে সঙ্গীসহ যাত্রা করিতেই "আমি সন্দেশ খাব" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পীড়িত মদন বাহানা জুড়িল। "সন্দেশ আমি আনব, লক্ষ্মীটি, কেঁদোনা ভাই" বলিয়া বিজলী চলিয়া গেল।

২

তিনদিন পরে মদনের জ্বর যখন ক্রমশই বাড়িয়া চলিল, চপলা স্বামীকে বলিলেন, "জ্বরটা যখন বেড়েই চলছে, তখন ডাক্তার ডাকা দরকার।"

স্বামী চন্দ্রনাথ বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জ্জনীর দ্বারা মৃদু শব্দ করিয়া এমন জিনিষের ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে চপলার অন্ধকার ললাটের ছায়া নিবিড়তর হইয়া আসিল। মনের আবেগ মনেই চাপিয়া তিনি কহিলেন "সাগু, দুধ কিছুই খাচ্ছে না, ডালিম, বেদানা খেতে চাইছে, জ্বরও খুব বেশী, ডাক্তার না দেখিয়ে আর তো নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় না।"

চন্দ্রনাথ কহিলেন, "নিশ্চিন্ত সাধ করে কে থাকে বল, রোগ হ'লে চিকিৎসার দরকার, উপযুক্ত পথ্যের দরকার, সে জ্ঞান আমারও আছে। কিন্তু হাতে যখন কড়ি নেই, তখন সে জ্ঞান থাকাই বৃথা।"

চপলা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তা বলে' ছেলেটার চিকিৎসা হবে না, যদি কিছু ভালমন্দ হয় নিজেদেরই বুক মাথা চাপড়াতে হবে তো।"

চন্দ্রনাথ নির্ব্বিকারভাবে কহিলেন, "হয় তখন হবে, এখন উপায় নেই। আমার ঘরে যখন পয়সা নেই, তখন আর কার দুয়ারে টাকার জন্যে হাত পাততে যাই, দেবেই বা কে?"

"না হয় পাঁচ টাকা ধার কর, হাতে টাকা হ'লে শোধ দিয়ো।"

"ধার কে দেবে? একে তো দেনায় মাথার চুল বিকিয়ে আছে, যে ব্যবসায় হাত দিলাম, তাতেই সব খেয়েছে, যদি কখনও পড়তা পড়ে তবেই এসব দেনা শোধ করব, নইলে যা দুপাঁচ টাকা আনছি, অতিকষ্টে তো ক'জনের পেট চালাচ্ছি, পরবার বস্ত্র, তাও যুগিয়ে উঠতে পারছি না, এর ওপোর রোগের চিকিৎসা!" স্ত্রীকে নীরবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, আবার কহিলেন, "অত হাঁপাচ্ছ কেন, জল ঘেঁটে সাধ করে জ্বর এনেছে, দু'দিন ভুগতে হয় ভুগুক, তারপর আপনিই ভাল হবে, আমি না হয়, বলরামের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক

অষুধ এনে দিচ্ছি, তা না পছন্দ কর টাকা দাও, ভাল ডাক্তার আন্‌ছি।"

চপলা কোন কথার উত্তর না দিয়া মদনের কাছে আসিলেন। মদনের চোখ দু'টা জবাফুলের মতন লাল হইয়াছে। সে পিপাসায় ছটফট করিতে করিতে কেবলি জল চাহিতেছে, চপলা কাছে আসিয়া কপালে হাত দিতেই সে চোখ চাহিয়া কহিল, "ডালিম কই মা? কমলালেবু এনেছ?" চপলার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, হাতে এমন একটি পয়সা নাই, যাহার দ্বারা পীড়িত পুত্রের জন্য তিনি একটি জিনিষ সংগ্রহ করেন, অথচ কাল হইতে পুত্রকে কেবল সান্ত্বনা দিয়াছেন, "আনতে দিয়েছি বাবা, এলেই পাবি।"

অল্পক্ষণ পরেই চন্দ্রনাথ বলরামকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। বলরামকে দেখিয়া চপলা মাথায় ঘোমটা টানিয়া এক পাশে বসিয়া রহিলেন। অসুখের বিষয়ে কি বলেন, শুনিবার জন্য ঘরের বাহির হইয়া গেলেন না। বলরাম ঘরেই হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটীস করে। দুই তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষা ফেল করিয়া সে কিছুদিন হইতে বই কিনিয়া নিজে নিজেই এ বিদ্যা শিখিতেছে। ভবিষ্যতে ডাক্তার বাবু হইয়া পল্লীগ্রামে পসার জমাইবার বাসনা থাকিলেও "শতমারী ভবেৎ বৈদ্য" প্রবাদ বচনটি তার সাধনার মন্ত্র ছিল না। রোগ কঠিন দেখিলেই, সে সরল মনে নিজের অনভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়া বড় ডাক্তার ডাকিবার পরামর্শ দিত। এ ক্ষেত্রেও সে তাই করিল। "জ্বরের ধমকে রক্ত মাথায় উঠছে, কপালে জলপটি দিয়ে এখুনি শরৎ ডাক্তারকে আন্‌তে পাঠান, নইলে বিকার দাঁড়াতে দেরী হবে না" বলিয়া সে হোমিওপ্যাথিকের বাক্স লইয়া বিদায় হইল। চপলা আকুলনেত্রে জিজ্ঞাসুভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেই তিনি কহিলেন, "ছোক্‌রা জানে তো ছাই, শুধু শুধু ভয় দেখিয়ে গেল। দাঁড়াও আমি একবার মনোহর দাদাকে ডেকে আনি।"

চপলা কহিলেন, "একে তাকে আর ডাকাডাকি করে কি হবে? সোজা ডাক্তারের বাড়ী চলে যাও।"

চন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিলেন, "টাকার জোগাড় না করেই?"

চপলা কহিলেন "টাকার আমি ব্যবস্থা করছি, তুমি আর দেরী কোরো না, সোজা ডাক্তারের বাড়ী চলে যাও।"

চন্দ্রনাথের ব্যবসার জন্য ইতিপূর্ব্বে চপলা নিজের ও মেয়ের গায়ের সব গহনা একখানির পর একখানি করিয়া খুলিয়া দিয়াছিলেন। যখনই টাকার জন্য আটকাইয়াছে, তিনি সে অবস্থায় উদ্ধার করিয়াছেন, কিছুদিন হইতে কিন্তু আর তিনি সাহায্য করেন না। "ওগো, কিছু টাকার জোগাড় করে দিতে পার, নইলে আর তো চলে না, এই ধাক্কাটা সামলাতে পারলেই মেরে দিয়েছি আর কি" বলিলে, চপলা উত্তর দেন, "আমার আর কোন সম্বল নেই, যা ছিল সব খুইয়েছি।" অথচ এত অনাটনের মধ্যেও সকলদিকে তিনি এমন ভাবে গুছাইয়া চলেন, যাহাতে চন্দ্রনাথের বিশ্বাস, যে স্ত্রীর পুঁজি-পাটা এখনো নিঃশেষ হয় নাই। সুতরাং স্ত্রীর কথায় তখনি তিনি ডাক্তার আনিতে ছুটিলেন, টাকার জন্য আর ভাবনা রহিল না।

৪

"বিজু"

"মা"

"সেদিন যে গয়না পরে ওদের বৌভাতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে, সে তো দিয়ে আসা হয় নি, কোথায় রেখেছ?"

"তোমার হাত-বাক্সতেই রেখেছি মা। দিয়ে আস্‌তে সময় কোথা পেলাম? এসেই তো দেখি, মদনের জ্বর কি রকম বেড়ে গেছে, সে তোমায় একদণ্ড ছাড়ছে না, আমি খুকীকে নিচ্চি ঘরের কাজ করছি, কখন আর দিতে গেলুম।"

"বালা দু'টো বের করে নিয়ে এস।"

"গয়না দিয়ে আস্‌তে যা'ব? তাই দিয়ে আসি, ছেনুর ঠাকুরমার যা চোখ-টাটানী। বলতে লাগল, পরের সোনা গায়ে দেওয়া কেন? নেমন্তন্নে কি না গেলেই নয়? আমি খুলে ফেলতেই চাইলাম। তা ছেনু খুলতে দিলে না, বল্লে, "ও বুড়ী বক্‌ছে বকুক না, গয়না তো ওর না,

আমার।" তা শুধু বালা দুগাছা নিয়ে যাব কেন মা, হার ছড়াও দাও নিয়ে যাই।"

মা কহিলেন, "বালা তো এখন ওঁদের বাড়ী দিয়ে আস্‌তে বলছি না, তোর রঞ্জ মাসীর কাছে বাঁধা দিয়ে গোটা কুড়ি টাকা নিয়ে আয়।"

বিজলী চমকিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "অ্যাঁ? পরের গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা আন্‌ব, সে কি?"

চপলা ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "ভাইটার অবস্থা দেখছিস্‌, উনি ডাক্তার আন্‌তে গেছেন, এখুনি এলেই ভিজিট চাই, ওষুধ কিনতে হবে, ঘরে এক পয়সা নেই, তা' জানিস্‌ ত?"

বিজলী কহিল "ডাক্তার না আনলেই হোতো?"

চপলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "তোর সঙ্গে সে পরামর্শ কর্‌তে আসিনি। তুই জিনিষ রেখে টাকা নিয়ে আয়, বলিস তিনদিন পরে ছাড়িয়ে নেব। ছেলেটার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে. যেখান থেকে হোক্‌ টাকার ব্যবস্থা আমি করছি, তুই দাঁড়াস নে, এক্ষুনি যা।"

বিজলী খুকীকে কোলে করিয়া দুধ খাওয়াইতেছিল, মাতার স্বরের দৃঢ়তায় আর ওজর আপত্তি করিতে পারিল না। খুকীকে কোলে লইয়া, বালা দু'গাছি কাপড়ের নীচে ঢাকিয়া টাকা আনিতে গেল, যদিও পা তার কিছুতেই চলিতেছিল না।

যথাসময়ে চন্দ্রনাথ ডাক্তার লইয়া আসিলেন। "বড় বেশী দেরী হইয়া গিয়াছে, পল্লীগ্রামের লোক স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে বড়ই উদাসীন" ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ডাক্তার রোগীর মাথায় বরফ এবং ঔষধের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। চপলা পুত্রের জন্য ডালিম,বেদানা ও কিছু লেবু আনাইলেন। রুগ্ন শিশু অমন কঠিন অসুখের মধ্যেও ফল পাইয়া কত খুসী, তা'র আনন্দ দেখিয়া মা আড়ালে গিয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন।

৫

কানা-কড়ির যোগ্যতা-হীন নিঃসম্বল চন্দ্রনাথের পুত্রের বেশ রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে। দুবেলা ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া যাইতেছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চার আনা সেরের বরফ কেনা হইতেছে দেখিয়া প্রতিবাসীরা কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। সেইদিনই মেয়ের দল, একের পর একজন, চপলার এমন বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়া, নিজেদের সাহায্য করিবার সময় ও শক্তির অভাব জানাইয়া জানিয়া গেলেন সত্যই রোগ কঠিন কি না, এবং চিকিৎসা বড় মানুষের মত হইতেছে কি না।

দুইটাই যে ঠিক তাহা চোখে দেখিয়া প্রতিপন্ন হইল। এখন কথা হইতেছে, এই বাজারে যা'র দেনার দায়ে চুল বিকাইয়া আছে, ব্যবসার নামে যে স্ত্রী-কন্যার গা-হাত নেড়া বোঁচা করিয়া সমস্ত অলঙ্কারের টাকা জলে ঢালিয়াছে, তা'র হাতে এত টাকা কোথা হইতে আসিল, যে এমন চিকিৎসা করিতেছে? কথাটা ছেনুর ঠাকুরমার কানেও গিয়াছিল। বৈকাল বেলা তিনি যখন হরিনামের মালা ঘুরাইতেছেন, সেইসময় ছেনুর মা ছেনুকে লইয়া মদনকে দেখিয়া বাড়ী ফিরিল। বধূকে দেখিয়া হঠাৎ করিয়া গৃহিণীর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি মালাটি কপালে ঠেকাইয়া ঘোরান বন্ধ করিয়া কহিলেন, "বলি অ' বড়মানুষের নাৎনী, সেদিন যে দরিদ্দিরের মেয়েকে গয়না পরিয়ে নেমন্তন্ন খেতে নিয়ে গেছলি, সে গয়না দিয়ে গেছে?"

ছেনু কহিল "না, তোমার অত খোঁজ কিসের ঠাকুর মা, মালা ঘুরুচ্ছ মালা ঘুরোও।"

বধূ কহিল "আহা, ওদের বাড়ী যা বিপদ, ছেলেটা রক্তচক্ষু হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করছে, ওদের এখন গয়না দেবার কথা মনেই নেই।"

গৃহিণী গলায় কাঁসী বাজাইয়া কহিলেন, "অতো দয়া সব রেখে দাও; ছেনি, তুই এখুনি যা বলছি, গয়না চেয়ে আনগে যা, দেখ গিয়ে পাস কি না, হয় তো বেচে খেয়েছে! তাতেই বলি ঘরে কানাকড়ি নেই, রুগীর অমন চিকিচ্ছে করছে কি করে।"

বধূ আর উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া নিজের কাজে হাত দিল। ছেনুও চলিয়া যায় দেখিয়া ঠাকুরমা কহিলেন, "গেলি না ছেনি, দাঁড়া তোর বাপ আসুক, এমন বেহায়া মেয়ে তো বাপের জন্মে দেখি নি—"

সেইসময় পাড়ার দুর্গাদিদি বেড়াইতে আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া গৃহিণী যেন যুঝিবার বল পাইলেন। দুর্গা

ঠাকুরাণী আবার যে খবর দিলেন, তাহাতে তো জলন্ত আগুনে ঘৃত সংযোগ হইল।

দুর্গা কহিলেন, "রজদের বাড়ী বেড়া'তে গেছলাম, সে দু'টো বালা রেখে কাল সকালে, বিজুর মাকে গোটাকুড়ি টাকা দিয়েছে। আমার তখুনি সন্দ হলো, বিজুর মা'র তো গয়না গাঁটি আর নেই, গয়না কোথা পেলে, সে তবে তোমাদেরই গয়না পিসি, এখ্খুনি আনতে পাঠাও, নইলে আর পাবে না।"

গৃহিণী হাঁকিলেন, "কানের মাথা খেয়েছিস ছেনি, শুন্লি?"

ছেনু শুষ্কমুখে মার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "শুনছ মা, বাবা এসে শুনলে তো তোমার শুদ্ধ রক্ষে রাখবেন না, এখন কি করি?"

ছেনুর মা কহিলেন, "যাও একবার, বলগে, ঠাকুরমা গয়নার জন্যে বকাবকি করছেন।"

ছেনু তৎক্ষণাৎ বিজলীদের বাড়ী গিয়া গহনা চাহিল। চপলার কথাটা একেবারেই মনে ছিল না, শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন। এদিকে ছেনু গহনা চাহিবামাত্র বিজলীর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, মাকে চুপি চুপি কহিল, "এইবার কি হবে মা!"

ইতিমধ্যে ঘোষের মা দুধ দিতে আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ গো, বউ মা, একি শুনছি মা, তুমি না কি বাবুদের গয়না চেয়ে এনে বেচে খেয়েছ? ঘাটে মাগীরা বাসন মাজতে মাজতে সব গোল করে তুলেছে।"

চপলা কহিলেন, 'কি করি বল পিসী, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, তুমি বড় বাটিতে দুধ ঢেলে দিয়ে যাও, আর যাবার পথে ছিদাম তেলীকে একবার ডেকে দিয়ো, বড্ড দরকার, বলতে ভুলো না।"

"এখুনি দিচ্ছি, সে ঐখানে মোড়লের সঙ্গে কথা বলছে দেখে এলাম" বলিয়া ঘোষের মা দুধের জোগান দিতে চলিয়া গেল। চপলা হারগাছি বাহির করিয়া আনিয়া ছেনুর হাতে দিয়া কহিলেন, "হার ছড়া নিয়ে যাও ছেনু, বালা আমি সত্যিই বাঁধা দিয়েছি, এখুনি ছাড়িয়ে এনে দিচ্ছি, ভয় নেই মা, বড় বিপদেই পড়েছিলাম ঐ দু'গাছা ছিল বলেই মদনকে তখুনি বাঁচাতে পেরেছি।"

ছেনু ফিরিয়া আসিতেই ঠাকুরমা হাঁকিলেন, 'গয়না পেলি না?" ছেনু কহিল, "হ্যাঁ।"

"দেখি? এই তো দুর্গা ঠিক বলেছে, বালা তো দেয়নি; শুধু হার ছড়া দিয়েছে! এই যে শঙ্কর কাছারী থেকে এসেছিস্ তোর মেয়ের দাতাগিরি শোন!"

সদ্য কাছারী-প্রত্যাগত শঙ্কর মাতার নিকট সব কথা শুনিয়া আগুন হইয়া উঠিল। কাছারীর পোষাক খুলিতে খুলিতে সে চেঁচামেচি করিয়া স্ত্রীকে বকিয়া মেয়েকে ধমকাইয়া বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল। ব্যাপার জানিবার জন্য উঠানে পাড়ার লোক জমিয়া গেল। শঙ্কর বাবু আবার যে সে কেহ নন, উকীল!

সে হাত পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "মেয়েদেরই বা দোষ কি, এ সব তাদেরই ফন্দীবাজী। কালই আমি জুয়াচোর স্ত্রীলোকের নামে কেস্ আন্‌ব, চন্দ্রনাথ কেমন ব্যবসাদার তাও দেখে নেব।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শঙ্করের বক্তৃতা ও ঝগড়া দুঘণ্টা চলিবার পর যখন সে একটু নিরস্ত হইয়া হাত মুখ ধুইয়া কিছু খাবার খাইয়া, টাট্‌কা খবরটি বন্ধুমহলে গুলজার করিতে যাইবার জন্য এবং সমব্যবসায়ী বন্ধুদিগের সহিত উপস্থিত কি উপায়ে গহনার উদ্ধার হয়, সেই পরামর্শ করিতে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল, সেইসময় ছিদাম তেলী "মা ঠাকরুণ কোথায় গো, গয়না নেন্" বলিয়া বাড়ী ঢুকিল।

আঁচলের খুঁট হইতে বালা দু'গাছি বাহির করিয়া ছেনুর হাতে দিতেই মাঝপথে শঙ্করের গাড়ীর যেন চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। সে মুসড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বালা পেলে কোথায়? বাঁধা দিয়েছিল না?"

তেলীর পো কহিল, "বিজুদিদিদের একটা বলদ আমি অনেক দিন থেকে দর করে রেখেছি, সেটার দাম বাবদ হাতে হাতে চল্লিশ টাকা দিয়ে দিলাম, তিনি কুড়ি টাকা আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে বালাজোড়া উধরে আনিয়ে আপনাদিগে দিতে বল্লেন।"

ব্যাপারটা এত অল্পেই শেষ হইয়া গেল, মোটেই জমিতে পাইল না দেখিয়া শুধু শঙ্কর নয়, পাড়ার মেয়ে পুরুষ অনেকেই দমিয়া গেলেন।

এদিকে চন্দ্রনাথ স্ত্রীকে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,

"এত বড় তোমার আস্পর্দ্ধা আর সাহস, যে পরের গয়না বাঁধা রেখে, ছেলের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার ডাক! না-হয় ঘরে ছেলে মরতই, আমার যে মুখে আজ কালী লেপে গেল, কাল আমি বাইরে মুখ দেখাব কি করে! তোমার মতন তো তিন হাত ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকতে পারব না!"

চপলা কহিলেন, "না হয় তুমিই ঘরের কোণে লুকিয়ে থেকো, আমিই বাইরে যা'ব, যত কালী পড়তে হয়, আমারি মুখে পড়বে।" স্ত্রীলোকের মুখে এত বড় কথা শুনিলে, কোন কাপুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়? চন্দ্রনাথ হাঁকিলেন—

"বটে, যত বড় মুখ তত বড় কথা, মেয়ে মানুষের এত বড় আস্পর্দ্ধা! যেতো যে জেলখানায় হাতে হাত কড়ি দিয়ে নিয়ে,—তখন গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হোতো না! ছি, ছি, কি লজ্জা!"

"নিয়ে যেতো, যেতাম, জজের কাছে সত্য কথা বলতাম, তুমি আর অতো চেঁচিয়ো না একটু চুপ কর, রোগা ছেলে চম্‌কে উঠছে—একজনের বাক্সতে গয়না বন্ধই তো থাকৃত তা আমার অসময়ে না হয়, তা থেকে আমি একটু কাজই নিয়েছি তাতে হয়েছেই বা কি?"

চন্দ্রনাথ নিস্ফল আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ভারী যুক্তি দেখাচ্ছ তো বটে, জজের সামনে গিয়ে ঐ কথা বল্‌তে পার?" তোমার ঘরে খাবার নেই তো আর একজনের ঘর থেকে কেড়ে আন্‌তে যাবে তুমি? এই না কথা? আমার ছেলে-মেয়েকে তুমি এই শিক্ষাই দেবে আর কি? আমারও মুখে চুণ কালী আর নিজের মুখেতো আছেই!"

পরদিন পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল, চন্দ্রনাথের স্ত্রী নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার অছিলায় দুইতিন বাড়ী হইতে গহনা চাহিয়া লইয়া সেই গহনা বাঁধা দিয়া ছেলের অসুখে বড় মানুষের মত টাকা খরচ করিয়াছে। কতক কাছেই ছিল, ধরা পড়িয়া যাওয়ায় সেই টাকায় কিছু গহনা উধরাইয়া লইয়া যাহার গহনা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। অবশ্য সকলের গহনা ফেরত দিয়া উঠিতে পারে নাই, যাহাদের গহনা তাহারা এখনি সতর্ক হইয়া আদায়ের চেষ্টা করুক, বিলম্বে খোয়া যাইবার সম্ভাবনা যদিও এখনও উদ্ধারের আশা খুবই কম।

গ্রামটি ছোট হইলেও স্থানীয় পত্রিকা একখানি সপ্তাহে সপ্তাহে আত্ম-প্রকাশ করিত। ব্যাপারটি অতিরঞ্জিতভাবে তাহাতেও স্থান পাইল। আর পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য মুখপত্রেই বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইল—

চুরী! চুরী!

স্ত্রীলোকের অদ্ভুত জুয়াচুরী।

সরলা গৃহস্থ বধূ ও কন্যাগণ, সাবধান, নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার জন্য কেহ গহনা চাহিতে যাইলে কদাচ দিবেন না।

শ্রীসরসীবালা বসু।

—•—

কেন?

তুমি যদি তোমারে ভুলাও, দেব! কেন
ব্যথা পাই ভুলিলে, বুঝি না।
আমি যদি ভুলি,—ভোলার সে ব্যথা জেনে
কেন ভুলি বুঝিতে পারি না!

আচার্য্য রাধানাথ ভট্ট।

—•—

কর্ত্তব্য-জ্ঞান

—— :০: ——

(ঐতিহাসিক ঘটনা-মূলক)

অপ্রতিম ভুজবীর্য্যশালী সুনিপুণ-রাজনীতিবিদ্ আলীবর্দ্দি খাঁ সুবর্ণবঙ্গের সুবর্ণসিংহাসনে সমারূঢ়। তাঁহার সভাস্থ হইবার সময় আসন্নপ্রায়; রাজসভায় এতদ্বার্ত্তা-ঘোষণকারী ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে। সভাসদ্বর্গ সকলেই সন্ত্রস্ত, চকিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণবিলম্বেই নবাব সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত জনগণ সকলেই প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনাদি দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কেবল একজন কর্ম্মচারী স্বীয় আসন ত্যাগ করিলেন না।

নবাব সিংহাসনে আসীন হইবামাত্রই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইল। নবাব কিঞ্চিৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

নবাব। দত্ত, বড় কাজে ব্যস্ত দেখ্‌ছি যে, কাজটা কি। বাড়ীর কোনো খবর নাকি?

দত্ত। (উঠিয়া করযোড়ে) হুজুর, হুজুরের কাযেই ব্যস্ত ছিলাম।

নবাব। আমার আসাটা কি দেখ্‌তে পাওনি! এতই অন্যমনস্ক?

দত্ত। হুজুর, যথার্থই দেখ্‌তে পাইনি, পেলে কি আর উঠিয়া হুজুরের অভ্যর্থনা করিনা?

নবাব। (কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নভাবে) দত্ত, কাজ তোমার বড় প্রিয়, না?

দত্ত। হুজুর যথার্থ অনুমান করিয়াছেন।

নবাব। (কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) দত্ত, একটি কথার যথার্থ জবাব দাও। তোমার কাছে আমি বড়' কি আমার কাজ বড়?

এইবার সভাসদ্বর্গ ভীত ও চকিত হইলেন ও দত্ত কি উত্তর দেন সেইজন্য সকলেই উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইলেন।

দত্ত। (দৃঢ়ভাবে) হুজুর যদি অভয় দান করেন তবে উত্তর দিই। (হুজুর অভয় দান করিলেন না বটে কিন্তু উত্তরের জন্য কিঞ্চিৎ অধীর হইলেন।)

নবাব। দত্ত আমার কথার উত্তর দাও।

দত্ত। হুজুর, যদি সত্যই বলিতে হয় ত বলি, আমাকে হুজুর যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন বোধ হয় সেই কার্য্যই আমার নিকট সকলের অপেক্ষাই বড়।

বোধ হয় যদি সেই মুহূর্ত্তে সেই সভাস্থলে একত্র শত অশনিপতন হইত তাহা হইলেও সকলে এমন নির্ব্বাক্ ভীত ও উদ্বিগ্ন হইতেন না। দত্তের অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া সকলেই বিষম ভীত হইলেন, এবং তাঁহার যে অদৃষ্টে বিষম শাস্তি আছে সকলেই তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

সকলেই নির্ব্বাক্, স্বয়ং নবাব ও নির্ব্বাক্, দারুণ ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল ও চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। নবাব স্বভাবতই মৃতভাষী ও চিত্তবৃত্তিদমনে অভ্যস্থ ছিলেন সুতরাং প্রায় স্বাভাবিক স্বরেই পার্শ্ব সমাসীন প্রধান মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"দেখ, হিন্দুদের সকলই গিয়াছে, যায় নাই কেবল একটি জিনিষ,—দর্প দম্ভ ও অহঙ্কার!" পরে চিত্রার্পিত প্রায় নিশ্চল জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

উপরে খোদাতাল্লা ও নীচে মহামান্য দিল্লীর বাদসাহ ব্যতীত আলীবর্দ্দি আর কাহারো নিকট কোনোদিন মস্তক অবনত করে নাই। আমার নিজ কর্ম্মচারী যে প্রকাশ্য সভা মধ্যে আমাকে এরূপ অবজ্ঞা করিবে ইহা আমার স্বপ্নাতীত ছিল। যাহা হউক, এরূপ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়।

সুচতুর মন্ত্রী মহাশয় এই বাক্যের পরই দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইবে বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া নবাবের দয়া ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন এবং নবাবকে বলিলেন,—

"হুজুর, দত্ত পুরাতন ভৃত্য, অতি বিশ্বাসী ও নিরতিশয় কর্ম্মদক্ষ; দৈবাৎ গ্রহবৈগুণ্যে দুরদৃষ্টবশতঃ হঠাৎ কি

বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছে, দয়া করিয়া আর একটিবার উহাকে উত্তরের অবসর দিন।"—এই বলিয়াই নবাবের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই দত্তের নিকট হইতেও ক্ষমা প্রার্থনা করাইবার নিমিত্ত বলিলেন,—

"দত্ত, একবার বেশ বিবেচনা করিয়া হুজুরের কথার জবাব দাও। তোমার মেজাজ আজ কি ভাল নাই ?"

দত্ত। (সুদৃঢ়স্বরে ও সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে) হুজুর, মেজাজ আমার ভালই আছে। আমিও স্বীকার করি, উপরে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ও নীচে প্রভুর কার্য্য, এই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এইবার মন্ত্রীও অপ্রতিভ হইলেন। নবাব ক্রোধে অধীর হইয়াও স্বাভাবিক ধৈর্য্যবশতঃ স্বাভাবিক স্বরেই বলিলেন,—

"দত্ত, তুমি অস্বীকার করিলেও বুঝিতে পারিতেছি তোমার মেজাজ ভাল নাই। কিছুদিন তোমার সভায় আসা বন্ধ থাকুক, তুমি নির্জ্জনে বিশ্রাম কর।—প্রহরী, দত্তকে সভাস্থল হইতে যথাস্থানে লইয়া যাও।"

আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই প্রহরী দত্তকে কারাগারে লইয়া গেল। সেদিন দুই-একটি সামান্য রাজকার্য্যের পরই সভাভঙ্গ হইল। সকলেই বুঝিল, দত্ত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দিনে যথানির্দ্দিষ্টভাবেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইল। দত্তের কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইল না। তৃতীয় দিবস নবাব কারাধ্যক্ষকে দত্তের সংবাদ জানাইতে আদেশ করিলেন। তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন যে দত্ত কারা-গৃহে প্রবেশাবধি কাহারও সহিত কোনো বাক্যালাপ করেন নাই; নিজ ইষ্টদেব রাধানাথের পূজা করেন এবং তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করেন, অন্য কোনো খাদ্য স্পর্শও করেন না। নবাব প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না, মনে মনে বলিলেন, "দেখা যাক্ কতদিন এ তেজ থাকে।"

এইরূপে সপ্তাহকাল অতীত হইলে নবাব কিছু ক্ষুণ্ন হইয়া কারাধ্যক্ষকে পুনরায় দত্তের সংবাদ জানাইতে আদেশ করিলেন ও দত্তের মনোভাব জানিতে বলিলেন। এতদিনে নবাবের ক্রোধোপশম হইয়া দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা যে, একটু ত্রুটিস্বীকার করিলেই তাঁহাকে মুক্তি দিয়া স্বপদে পুনঃস্থাপিত করেন। কারাধ্যক্ষের সহিত দত্তের এইরূপ কথা হইল;—

কারা। দত্ত মহাশয়, বুঝিতেছেন তো রাজা-বাদসাদের মেজাজ সাধারণ লোকের মত নয়, সুতরাং আপনি একটু ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই যখন সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায় তখন বৃথা কেন কষ্ট পান ও দেহপাত করেন? ভুলভ্রান্তি মানুষমাত্রেরই সম্ভব। কি বলেন? আপনার কথা কি নবাব বাহাদুরকে জানাইব? বলুন।

দত্ত। কারাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কিছুই বক্তব্য নাই। নবাব বাহাদুর আমাকে অন্যায় দণ্ড দিয়াছেন; তিনি আপনি সে ভ্রম স্বীকার না করিলে আমি মুক্তির প্রার্থী নই, ইহাতে জীবন যায় তা'ও স্বীকার।

পূর্ব্বোক্ত সংবাদ নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইল ও দয়া অন্তর্হিত হইল। তিনি ক্রোধে নির্ব্বাক রহিলেন ও ইঙ্গিতে কারাধ্যক্ষকে বিদায় দিলেন। আজ দত্তের কারাবাসের নবম দিন। আজ প্রাতঃকাল হইতেই নবাবের মন বড়ই চঞ্চল,—কোনো কার্য্যেই মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না, কোনরূপ বিলাস-ভোগেই তুষ্ট হইতেছেন না। আজ দারুণ মানসিক অশান্তি উপস্থিত; অনুক্ষণই মনে হইতেছে 'যদি দত্ত একবার বলে তো মুক্তি দেই, কিন্তু না বলিলেই বা কি করিয়া নিজ ত্রুটি স্বীকার করি?' আজ রাত্রিতে নবাবের শয্যাকণ্টক উপস্থিত, সুখ-শয্যায় শয়ান থাকিয়াও নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিলেন। দশম দিনের প্রত্যূষেই কারাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন,—"দত্তকে আনয়ন কর।" কারাধ্যক্ষ আসিয়া সংবাদ দিল—"দত্ত অদ্য প্রভাতকালেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

এইবার নবাবের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি প্রকৃতই সদাশয় নৃপতি ছিলেন, তবে সহজে ত্রুটি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াই এই ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্য সভায় অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া আপনার ভ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে দত্তের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাঁহার উত্তরাধিকারীকে আনাইয়া তাহাকে শতাধিক গ্রাম ও মজুমদার উপাধি দিয়াছিলেন।

একসময়ে ২৪ পরগণার অন্তর্গত গৈপুর হইতে

তারকেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রামই তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। ইনিই গৈপুরের মজুমদার বংশের আদিপুরুষ।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত পম্পিয়াই নগরদ্বারে নগর রক্ষার্থ আদিষ্ট সৈনিকের ধ্বংসাবশিষ্ট দেহ দর্শনে পর্য্যটকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হন। আমরাও তদ্বর্ণনা শ্রবণে বিস্ময়বিমুগ্ধ হই। কিন্তু তাহার কর্ত্তব্যপালনের কারণ সামরিক-দণ্ড-ভয়ও হইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তব্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করত স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া কর্ত্তব্যের এমন গৌরববৃদ্ধির উদাহরণ জগতে অদ্বিতীয়। বৈদেশিকগণের ইতিবৃত্ত আছে। সেখানকার কথা কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। আমাদের ইতিহাস নাই। আমাদের কথা কেহই জানে না।

শ্রীপতিরাম দে বৃহস্পতি।

—•—

সাহিত্য ও জীবন

সাহিত্যের মাল মসলা বা উপাদান একমাত্র মানুষের জীবন। জগতের আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সাহিত্য যাহা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে তাহা সুখে-দুঃখে আন্দোলিত ব্যথা-বেদনায় আতুর মানুষের জীবনের একটি ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ইতিহাসের নানা বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ বা পুষ্টাঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন নানা কবি, নানা ঔপন্যাসিক, নানা দার্শনিক। স্নেহে প্রেমে, মিলনে বিরহে, বীরত্বে, দেশহিতৈষণায়, ত্যাগে সংযমে যে-জীবন মানুষকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন আপনার বিচিত্র মূর্ত্তিকে প্রকাশিত করিয়া চলিয়াছে মানুষ সেই জীবনকেই আপনার রচিত সাহিত্যের মধ্যে বিচিত্রভাবে আঁকিয়া রাখিতেছে। যে সাহিত্য এই জীবনকে যত বিপুলভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে সে সাহিত্য তত সম্মানের জিনিষ।

সাহিত্যে জীবনকে প্রকাশিত করিবার ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় দায়ীত্ব কবির। কবি আপনার আনন্দে গান গাহিলেও তাঁর মনে এই আনন্দ দিনরাত যোগাইতেছে কে? সে যে বিপুল তরঙ্গায়িত মানবজীবন। প্রেমের হাসি, বেদনার অশ্রু, পীড়নের সমবেদনা, কবির ছন্দে অনবরতই বাঁধা পড়িতেছে। জীবনের গুপ্ততম জটিল রহস্যের প্রতিও কবির চক্ষু উন্মুক্ত। মানবজীবন গোপনে এমন কিছুই সারিয়া লইতে পারে না, যাহা কবির হৃদয়ের আয়নায় আপনার ছায়া না ফেলিতেছে! অতএব জীবনকে বিচিত্র-ভাবে অনুভব করিয়া তাহার বিচিত্র মূর্ত্তির প্রকাশের অধিকার যাঁহাদের আছে তাঁহাদের মধ্যে কবিই আপনার অধিকারকে পূর্ণরূপে খাটাইয়া লইতে সক্ষম। সেইজন্য আজ পর্য্যন্ত জগতের সাহিত্যে যাহা-কিছু বড় সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহা এই কাব্যের আকারেই শোভা পাইতেছে। সেক্‌স্‌পীয়রের বিপুল সৃষ্টি মানুষের জীবনের এক বিপুল অভিব্যঞ্জনা। প্রণয়ী বিরহী, পাপী তাপী, লোভী হিংস্রক, দুষ্ট পিষ্ট সে-মানুষ সে-মানুষ এই সৃষ্টি-তরুর শত শত শাখা-প্রশাখারূপে আপনাকে মূর্ত্তিযুক্ত করিয়াছে। আর বিচিত্র দুঃখ-দ্বন্দ্ব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিচিত্রভাবে মূর্ত্তিমান করিয়াছে আমাদের বিশাল কাব্য মহাভারত। আন্দোলিত বিক্ষোভিত মানব জীবনের এ এক অত্যাশ্চর্য্য বিরাট বিকাশ! মানবের মহিমা গরিমা, ছলনা ক্ষুদ্রত্বের এ যে এক অভিনব অভিব্যক্তি!

উপন্যাসের মধ্য দিয়া সাহিত্যের যে বিকাশ সেও প্রেম-হর্ষ-আলোড়িত, দ্বন্দ্ব-দুঃখ-ময় মানুষের জীবনের বিচিত্র প্রতিমূর্ত্তি। দর্শন চলিয়াছে মানুষের এই রহস্যময় জীবনের গূঢ়তত্ত্বকে উদ্ঘাটন করিতে করিতে, মানুষের বাহিরে যে বিপুল বিশ্ব-প্রাণ ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার সহিত মানুষের জীবনের গভীরতম সম্বন্ধকে বুঝাইতে বুঝাইতে। এইরূপে মানুষের সাহিত্য মানুষের জীবনের কবিত্বময় বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছুই নহে। আজ ইউরোপের সাহিত্য একটি বিপুলালোড়িত সমুদ্রবিশেষ। এ-সাহিত্য জীবনের বৈচিত্র্যময় এক বিশাল অভিব্যক্তি। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম সেখানে অবিশ্রাম গতিতে নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে। সে-পথের যাহারা পথিক তাহারা জীবনকে কত ভাবেই না বুঝাইতেছে। এই যে ইউরোপের বুকের উপর দিয়া ভীষণ যুদ্ধের প্রবল বন্যা

বহিয়া গেল, সে বন্যার এক-একটি ঢেউ লোভ, পাপ, আনন্দ, বীরত্বের এক একটি উচ্ছ্বসিত বিকাশ। এই বিচিত্র বিকাশকে আবার যাহারা সাহিত্যে নানা আকারে ফুটাইতে চাহিবে তাহারা আলোড়নময় জীবনের কি জ্বলন্ত চিত্রই না আঁকিয়া তুলিবে!

কাব্যের মধ্যে জীবনের যে বিকাশ তাহা বাদকের বীণায় সুরের বিকাশের মত। যে বৈচিত্র্য অনন্তকাল ধরিয়া যুগে যুগে মানুষকে লইয়া লীলা করিয়া আসিতেছে, তাহার সূক্ষ্মতম আন্দোলনটিও কবির অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। মহাভারতের কাব্যকর্ত্তা যখন মহাভারত লিখিতে বসিলেন, তখন তাঁহার মনে প্রকাশের বেদনা জাগাইয়া দিল ভারতের উদ্বুদ্ধ ক্ষাত্রশক্তি, ভারতের ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনের বিজয়-মুখী এক উদ্দাম আন্দোলন। মানব-কবি সেকস্পীয়র জগতের মানব-পুঞ্জের দিকে যখনই চাহিয়া দেখিলেন, তখনই তিনি আপনার মনীষার আলোকে দেখিতে পাইলেন—শত শত স্ফূর্ত্ত পুষ্ট ভগ্ন দলিত মানব-প্রাণ। তাঁর কবি-হৃদয় মানবের আনন্দ এবং দুঃখকে আপনার সমবেদনায় অমর করিয়া রাখিয়া গেল। আমাদের কালিদাস মানুষের প্রেম-সুষমা, শান্তি-মাধুর্য্যের সুললিত কোমল ভাবগুলিকে কেমন সুন্দররূপে আপনার কাব্যে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিলেন। শান্তি-সুষমা প্রেম-করুণার মোহন অভিব্যক্তি আমাদের বর্ত্তমান বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথে। এইরূপে সাহিত্য-সৃষ্টির আদি যুগ হইতে মানবের যাহা-কিছু সুন্দর যাহা-কিছু কমনীয়, আবার যাহা-কিছু ওজস্বী ও উদ্দাম তাহাই মানবের কাব্যে স্বভাব-গতিতে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

কাব্যের ছন্দ-সীমার বাহিরে মানবের রচিত সাহিত্যের যে অঙ্গ সে অঙ্গকে সতেজ ও পুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছেন ঔপন্যাসিক দার্শনিক প্রভৃতি; একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক কবিত্ব-প্রভাব হইতে বহির্ভূত দুইটি স্বতন্ত্র স্রষ্টা নহেন। কবির যে দৃষ্টি-শক্তি নিমেষের মধ্যে মানবের হৃদয়ের অন্তস্থলে লুক্কায়িত গোপন কথাকে আলোকে আনিতে পারে, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি তত প্রখর না হইলেও তিনিও সে দৃষ্টি-শক্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত নহেন। যে ঔপন্যাসিক যত বেশী কবি-দৃষ্টি লইয়া মানব-জীবনকে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন, তিনি তত বেশী আমাদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধার পাত্র। দার্শনিক বিশ্বশক্তি হইতে আপাত বিচ্ছিন্ন মানব-জীবনকে একই বিশ্ব-নীতি-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে করেন, এবং তিনি ক্রমবর্দ্ধমান আনন্দের সহিত মানব-জীবনের গূঢ়তম সম্বন্ধ-রহস্যকে দিনের পর দিন উদ্ঘাটিত করিতে থাকেন। তাঁর দৃষ্টি কবির দৃষ্টিরই অনুরূপ। আর কবি যখন মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার তখন যাহারা অল্প-বিস্তর তাঁহারই মনীষার উত্তরাধিকারী তাহারাও মানব-জীবনকে তাঁহারই মত বুঝাইতে চেষ্টা পাইবে। অতএব যে-সাহিত্যকে আমরা মানবের সাহিত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি তাহা নানা স্রষ্টার সৃষ্টি-চাতুর্য্যে প্রকাশিত মানব-জীবনের এক কবিত্বময় বিশ্লেষণ।

এইখানে কবির কাব্য লইয়া একটু কথা উঠিতে পারে। কবির কাব্যে মানুষের কথা যেমন থাকে প্রকৃতির কথা, বিশ্ব-শোভার কথাও তেমনি থাকে। এখন এই প্রকৃতির কথা এই বিশ্ব-শোভার কথাকে আমরা মানুষের জীবনের অভিব্যক্তি বলি কোন হিসাবে? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই বিশ্ব-শোভার কথাও মানুষের আনন্দেরি বিকাশ মাত্র। প্রভাতের রাঙা রবি অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে তার সোনার কিরণ জগৎ ছাইয়া ফেলিল। গাছে পাতায় তৃণ-লতায় কাননে প্রান্তরে সে-কিরণ নিবিড় চুম্বন দিয়া সকলকে সুপ্তি হইতে জীবনের চাঞ্চল্যে জাগাইয়া তুলিল। প্রভাতের এই জীবন-স্পন্দনটি কবি দূর হইতে আপনার চক্ষের শিরায় শিরায় অনুভব করিলেন। তিনি প্রভাতের একটি কমনীয় ছবি আঁকিলেন। বাহিরের শোভনতা প্রকৃতির আনন্দময় চেতনা কবির চিত্তে তেমনি আনন্দময় একটি জাগরণ আনিয়া দিল। তিনি তাঁর চিত্রে যাহা আঁকিলেন তাহা বাহিরের শোভা হইতে আহৃত তাঁরই নিজের চিত্তের একটি আনন্দ-গর্ভ আবেগ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের সমুদ্র-বর্ণনা। কবির সম্মুখে প্রসারিত উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত ফেনময় সমুদ্র কবির চিত্তকে বিপুল-ভাবে মাতাইয়া তুলিল। কবি সমুদ্রের যে ছবি আঁকি-

লেন তার মধ্যে সমুদ্রের কথা ত আছেই, কিন্তু তার মূলে রহিয়াছে কবির চিন্তাবেগ, সমুদ্রের বিশাল আন্দোলন উচ্ছ্বাসের একটি বিপুলতম অনুভূতি। বাহিরের প্রকৃতি কবির চিত্তকে যে-পরিমাণে সজাগ ও আবেগবান করিয়া তুলিতেছে কবি সেই পরিমাণেই তাকে আঁকিয়া চলিয়াছেন। অতএব কাব্যে বিশ্ব-শোভার যে বিকাশ তাহা বহিঃপ্রকৃতি-কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ মানুষের চিন্তাবেগ বা প্রকৃষ্ট অনুভূতি। এখানেও মানুষ আপনার আনন্দকে আপনার সৌন্দর্য্যানুভূতিকেই রূপবান করিতেছে, বাহিরের প্রকৃতি তার খানিক সহায় মাত্র।

এইরূপে সুখ দুঃখ আনন্দ সৌন্দর্য্য দিনরাত মানুষের চেতনাকে চঞ্চল ও সজাগ করিয়া চলিয়াছে। মানুষ কাঁদিতে কাঁদিতেও তার বেদনা ফুটাইয়া চলিয়াছে; আবার হাসির আলোকেও তার সাহিত্যকে সুন্দর করিয়া গড়িতেছে। এই হাসি-কান্নার লীলা মানুষের জীবনকে যেমন আশ্রয় করিয়াছে তার রচিত সাহিত্যকেও তেমনি পাইয়া বসিয়াছে।

সাহিত্য যে মানুষের জীবনের প্রতিবিম্ব মাত্র তাহা আমরা বুঝিলাম। এখন সাহিত্য জীবনকে কি আনিয়া দিতেছে তাহাই দেখিবার বিষয়। দেশ হইতে দেশান্তরে যুগ হইতে যুগান্তরে সাহিত্য মানুষের মনের পাশে বহন করিয়া আনিতেছে দুইটি জিনিষ—প্রথম আনন্দ, দ্বিতীয় কল্যাণ। কত শত যুগের রচিত সাহিত্য মানুষকে তার দুঃখে বেদনায় বিষাদে নিরাশায় নিরন্তর দান করিতেছে সজীব আনন্দ আর সেই আনন্দেরই গর্ভে লুক্কায়িত মধুময় কল্যাণ। কবির কাব্য পাঠ করিয়া আমরা পুলকে আত্মহারা হইয়া উঠি, আমাদের ক্ষুদ্র হাসি-কান্নার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি, দুঃখ-দৈন্য দাসত্বের প্রবল পেষণের মধ্যেও সংযম ও আত্মনির্ভরতার যষ্ঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখি। প্রথম পাঠেই সাহিত্য আমাদিগকে যাহা আনিয়া দেয় তাহা বিশ্লেষণ না করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব সে জিনিষটি আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যে আনন্দকে আপনার মধ্যে লাভ করিয়া মনের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা দেখিব সে-আনন্দের পিছনে রহিয়াছে কল্যাণ। এ কল্যাণ কাব্য-সৃষ্টির সময় কবির মনে মুখ্য-ভাবে প্রেরণার বিষয় না হইতে পারে, কিন্তু যে-আনন্দ কবিকে কাব্য-রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে সেই আনন্দের সঙ্গে এ কল্যাণের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরুন সেকস্পীয়রের কাব্য সৃষ্টি। তিনি যখন জগতের মানুষের দুঃখ, সুখ, পাপ, তাপ, লোভ লালসা, আশা, নিরাশা, শক্তি দুর্ব্বলতার বিচিত্র ছবি আঁকিতে বসিলেন তখন তাঁর মনে কল্যাণের অনুপ্রেরণা হয়ত ছিল না, বহির্জগতের আন্দোলন তাঁকে যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দে মাতাইয়া তুলিয়াছে তিনি সেইরূপ আনন্দেই তাঁর অসীম কাব্য-রচনাকে মূর্ত্তি দিয়াছেন। ঔপন্যাসিকের পক্ষেও একথা বিশেষভাবে খাটে। সেখানেও আনন্দের উদ্দাম প্রেরণা এবং তার পিছনে পিছনে কল্যাণের ছদ্মবেশী অভিমান।

সাহিত্য যেমন জীবনকে ছাড়িয়া পুষ্ট হইতেই পারে না, জীবনও তেমনি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাহিত্যের অমৃত-ধারায় আপনাকে প্রফুল্ল ও পুষ্ট না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না। যে সাহিত্য মানুষের রচনা সে-সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাহিত্যের চরম দান—আনন্দ ও কল্যাণ কতদিন হইতে মানুষকে ক্ষুদ্রতা হইতে পূর্ণতার দিকে উন্নীত করিয়া চলিয়াছে, এবং এখনও কত শত যুগ যে চলিবে তার ইয়ত্তা নাই। মানুষ তার আনন্দের ভাণ্ডার—এই সাহিত্যকে গড়িয়া না রাখিলে তার কি বিষাদে, কি নৈরাশ্যেই না জীবন কাটিত!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

বন্যার দান

বন্যা যখন আসে,
পাগ্‌লা ঝোড়ো হাওয়ার মত হঠাৎ আসে যে সে।
লক্ষ অযুত ঢেউয়ের তালে,
বক্ষে যে তার প্রলয় দোলে,
সেই তরঙ্গ দোলের 'পরে আসনখানি পাতি',
মরণ—সে যে রুদ্রবেশে রয় তাহারি সাথী।

বিষাণ বেজে ওঠে,
মত্ত গরজনে যে তার স্রোতের ধ্বনি ছোটে,
অসংযত উদ্দামতা,
উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চলতা,
অবহেলে, অবলীলায় সকল বাধা ভয়,
দৃপ্ত চপল গতির বেগে করেই পরাজয়।
রয় না চিরদিন,
আপন বেগে হঠাৎ এসে তখনই হয় লীন,
পায়ে পায়ে চিহ্ন ফেলে,
প্রবলবেগে যায় সে চলে,
যায় সে,—তবু সে চিহ্নটি ; বড় যে দাম তার,
মরণবেশী মৃত্যুঞ্জয়ী তার সে অভিসার।
আবর্জ্জনা যত
স্রোতের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে চলে অসংযত।
সার যা-কিছু, যা সেই খাঁটি,
সেরার সেরা পলিমাটি,
পায়ে পায়ে যায় সে দিয়ে তাহার নবীন দান,
মরণ-মাঝে জেগে ওঠে, তাই গো নূতন প্রাণ।
বন্যা যখন আসে,
হেলা তারে করিস্ না রে তুচ্ছ উপহাসে,
সৃজন-ধারা জাগ্‌ছে কোথা,
হঠাৎ তারই প্রকাশ হেথা,
মাথা নুয়ে প্রণাম তারে দেওয়া যে তোর কাজ,
সে প্রণামটি নেবেন পায়ে আপ্‌নি মহারাজ।

শ্রীসরসীবালা বসু।

* * * *

* পাঁচ ক্রোশের মধ্যে একটা ডাক্তার খুঁজে মিলবে না—অথচ মেডিকেল কলেজ থেকে বছর বছর দু'শ পাঁচশ পাশ করে বেরুচ্ছে!

প্রভুরা দয়া ক'রে একজনও নিজের গ্রামের দিকে তাকাবেন না। ওমা, সে কি কথা গো? তোমার গ্রামের দিকে যদি তুমি না তাকাও, তবে তাকাবে কি আমেরিকার Republic Government?

বল্‌লে বলেন, "পাড়াগাঁয়ে বস্‌লে কি আর 'পসার' হ'বে? বাবার টাকা নষ্ট ক'রে পড়ে শুনে শেষে পাড়াগাঁয়ে সব ভস্মে ঘি ঢালি আর কি?"—শুন্‌লে একবার কথাটা?

গ্রামের বাস ত' ক্রমে উঠে এল কেবল জঙ্গল আর মশার আমদানী! দিনে দুপুরে শিয়ালের উপদ্রব;—আর ম্যালেরিয়া ম'শায়ের অখণ্ড প্রতাপ। 'ওয়ারেণ্ট' নিয়ে এবাড়ী থেকে ওবাড়ী গমন। এসবের জন্য দায়ী কারা গো? তোমরা পাঁচজনে মিলে বাস কর না, দেখি কেমন এই দুর্দ্দশা থাকে!

"পল্লী-সংস্কার" "পল্লী-সংস্কার" ক'রে সহরে ব'সে জাঁকর মারছ, আর আসর যথাসম্ভব গরম ক'রে দেশ-হিতৈষণার বড়াই করছ—এদিকে কাজের বেলায় ফক্কিকার!

সভা-সমিতিতে তোমরা কিন্তু খুব দড়! তখন আর কা'রো মুখে কিছু বাধে না—কেবল নিত্য নূতন প্রস্তাব আর করতালি প্রদানপূর্ব্বক তা'র সমর্থন। ও'তে যদি দুঃখ যেত আর পল্লী সংস্কার হ'ত তবে আর ভাবনা ছিল না!

এখন সংস্কার যে বিশহাত জলে! দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে—তোমরা অবাধে সহরে ব'সে দশ টাকা মণ হিসাবে চাল কিনে খাচ্ছ!—সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। কেন গো, এত সমিতি করছ, এত সমবায়, এত অর্থব্যয় ক'রে স্কুল কলেজ খুলেছ, কৃষি-শিল্পের দিকে একবার দয়া ক'রে তাকাও না বাপু।

প্রাথমিক শিক্ষার ছেলেরা শিখছে "গরু একটা চতুষ্পদ জন্তু, বাল্যকালে ইহার দুধ খাইয়া আমরা বাঁচিয়া থাকি" ইত্যাদি। উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে Preposition এর লিষ্ট মুখস্থ! আর "উত্তর মেরু সর্ব্বদা তুষারে আচ্ছন্ন থাকে, সেখানে শ্বেত ভল্লুকের বাস।" এই শিক্ষা।

অথচ আমার দেশে ক'টা জেলা আছে বল্‌তে বোধ হয় দম লাগবে। আমার গ্রামের চারিপাশের গ্রাম আমি চিনি না! ঠাকুর্দ্দার পর আর কা'রো নাম বল্‌তে গেলেই চক্ষু স্থির!—অথচ পালবংশের রাজাদের কটা হাতি ছিল, তা আমার ঠোঁটস্থ! কলেজে এসে বিজ্ঞানের অসীম জ্ঞান হ'ল। বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত Practical কর্‌লাম অথচ এক দিনের মত সংস্থাপন করার পন্থা আমি শিখলাম না!

ওদিকে আর্টে পড়্‌লাম—Cyrus এর March আর Marlborogh never ost a victory

মূল্য উভয়পক্ষেই নিক্তির ওজনে সমান—ওই এক বুলি—"Understanding that a post of a clerk has fallen vacant etc. বেশী কথা কি B Sc. M.Sc. পাশ ক'রে আইন পড়ে উকিল হ'চ্ছে।

—

* "কর্ম্মপথে"—শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

আলোচনা

নবীন লেখকগণের প্রতি উপদেশ

—"কোনও কার্য্যে ব্রতী হইবার সময় সে-কার্য্যের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশ উপকারপ্রদ হইবার সম্ভাবনা; সেই হেতু নবীন গ্রন্থকারদিগের জন্য "ইনডিপেনডেণ্ট" পত্রে প্রকাশিত মিঃ ফসেটের রচিত নবীন গ্রন্থকারদিগের প্রতি উপদেশের" সারাংশ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাহা "কুশদহ"র উদীয়মান সাহিত্যিকগণের উপকারার্থ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"১ম উপদেশ—নবীন লেখকগণ অবশ্যই আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিও। কাহারও অনুকরণ করিও না। বঙ্গ-সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে বলিয়াছেন", "কাহারও অনুকরণ করিও না।" কলেজে পড়িবার সময় মিঃ ফসেট পারিতোষিক প্রাপ্তির আশায় একটা কবিতা লেখেন, পরীক্ষক যখন তাঁহাকে বলেন 'রচনায় বড় টেনিসনের গন্ধ' তখন তিনি বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কারণ মৌলিক কবিতা রচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে জগতে অতি অল্প সংখ্যক মৌলিক লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা সকলেই এক বা একাধিক লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। তথাপি নবীন লেখকের পক্ষে সমসাময়িক কোন প্রসিদ্ধ লেখকের অনুকরণ করা বড়ই বিপজ্জনক। তিনি বহু সুলেখককে শিক্ষাগুরু স্থানে ভক্তি করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার রচনাপ্রণালীর প্রতিধ্বনি যেন ভক্তের কর্ণে সর্ব্বদা ধ্বনিত না হয়। তাঁহার যেন মনে থাকে, স্বাতন্ত্র্য নহিলে সাফল্য আসিবে না। সাহিত্যের যে-কোন বিভাগে খ্যাতিভাজন হইতে হইলে তিনি যেন সর্ব্বদাই মনে রাখেন যে, তাঁহার রচনা শিল্পকুশলকুন্তলা ও স্বাতন্ত্র্য-গর্ব্ব-মণ্ডিতা হওয়া আবশ্যক। মনে করা যাউক, নবীন লেখকের যদি বিশ্বাস থাকে যে, তিনি ভাল কবিতা লিখিতে পারেন, তবে একখানা কাব্য রচনা করিবার পর তিনি যেন ভাল করিয়া দেখেন, তাঁহার কাব্য রচনার প্রণালীতে, বা ভাবে, বা ভাষায় কোন কাব্যের অনুকরণ আছে কি না। যদি তাহা কাহারও অনুকরণ হয়, তবে সে কাব্য পোড়াইয়া ফেলাই বিধি। তাহার পর সেই কাব্যের ভাব লইয়া আবার কাব্য রচনা করিতে প্রয়াস পাওয়া উচিত। দ্বিতীয়বার প্রয়াসে যদি তিনি দেখেন যে, অপরের মত না লিখিলে তাহা ভাল লাগে না, তবে যেন তিনি বুঝেন যে, সেটা পরিত্যাগ করাই উচিত। নবীন লেখক দেখিতে পাইবেন, অপরের ভাব তাহার রচনায় আসিয়া পড়িতেছে; তাহা নিজের বলিয়া চালাইতে চেষ্টা না করিয়া, তিনি যতই মৌলিক রচনায় মনোযোগ দিবেন, তাঁহার রচনা পাঠকের নিকট ততই আদৃত হইবে।

শরীর ও মন।—নবীন লেখক সর্ব্বপ্রথমে দেখিবেন, সাহিত্যের কোন্ বিভাগে তাঁহার পারদর্শিতা অধিক। ইহা কিরূপে স্থির হইবে? যেবিষয় লিখিয়া লেখক আপনি আনন্দানুভব করেন, অবশ্য সেই বিষয়েই তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা। যাহা লিখিয়া লেখকের সন্তোষ জন্মে না, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরও সন্তোষ জন্মিবে না। কাব্য পাঠ করিয়া পাঠক আনন্দানুভব করেন, তাহা লিখিতে লেখকের অবশ্যই তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হইয়াছিল। যখন ভাবোদ্রেক হইবে, তখন লিখিব বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকা উচিত নহে। যখন শরীর ও

মন ভাল থাকে, তখন ভাবোদ্রেক হওয়াই ত স্বাভাবিক! শরীর ও মনে বড় নিকট সম্বন্ধ। একের অসুস্থতায় অপর অসুস্থ হইয়া পড়ে। একের অপব্যয় অপর ফল ভোগ করে। অধিক রাত্রি জাগরণ ও উত্তেজক প্রয়োগ বড়ই অমঙ্গলপ্রদ। লেখক যখন গভীর নিশায় নিদ্রা না গিয়া কাফি বা ঐরূপ আর কিছু সেবন করিয়া আপনার নিদ্রালস নয়ন নিদ্রাহীন করিয়া লিখিতে বসেন, তখন তাঁহার ধারণা কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া যায়। কাজেই রচনাও ভাল হয় না। অতএব, সাহিত্য-পথেও "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

নোট-বুক্।—লেখক বলেন, নবীন লেখকগণ নোট বুক রাখিবেন। প্রতিদিন তাহাতে কিছু কিছু লিখিবেন। যাহা লিখিবেন, তাহা খোলসা করিয়া লেখাই ভাল। তাঁহার মনে যে চিন্তা যে কল্পনা, যে ভাব, যে সন্দেহ উদিত হইবে, তাহাই তিনি নোটবুকে টুকিয়া রাখিবেন। নবীন লেখকদিগের ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন বা মনোভাব হয়ত এমন মূল্যবান্ বোধ হয় যে তাহা বিস্মৃতির অন্ধ তিমিরতলে বিসর্জ্জন করা উচিত নহে। হয়ত সেসকল কেবল প্রজাপতির মত; তাহা হইলেও তাহাদের ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সেইসকল আরম্ভ হইতে ভবিষ্যতে অতি গুরুতর চিন্তাপ্রসূত হইতে পারে।

মুরুব্বি ধরা।—সমালোচক ও প্রকাশকের নিকট যাঁহার খাতির আছে, সেরূপ কোন সুপ্রথিত লেখকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নবীন লেখকের পক্ষে সমীচীন নহে। ইহাতে প্রায়ই হতাশ হইতে হয়। অধিকাংশ স্থলেই নবীন লেখকের গ্রন্থ প্রবীণ লেখকের এত ভাল লাগে না যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। আবার তিনি যদি চলনসই গোছের প্রশংসাপত্র দান করেন, তবে নবীন লেখক বড় অসন্তুষ্ট হয়েন। নবীন লেখকগণ এইরূপ অত্যন্ত প্রশংসা প্রত্যাশা করেন বলিয়াই, অনেক প্রবীণ লেখক নবীন লেখকদিগকে কোনরূপ প্রশংসাপত্র দান করেন না। কিন্তু সেই প্রবীণ লেখকের প্রভাবই বা কতটুকু? তাঁহার নিজের লেখা সম্বন্ধে সমালোচক ও সম্পাদকগণ যে খাতির করেন, তাঁহার সুপারিশে আর একজনকে তাঁহারা সে খাতির করিবেন কেন? তবে যদি কোন প্রবীণ লেখক কোনও নবীন লেখকের রচনা পাঠ করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

যশ।—লেখক বলিতেছেন, নবীনগ্রন্থকার যেন লোকের প্রশংসা প্রাপ্তির জন্য অধিক উৎসুক না হয়েন। যশোলাভবাসনা মনীষী পুরুষদিগের ব্যাধিবিশেষ। যদি আপনার রচনায় আপনার অসামান্য সুখ জন্মে, তবে তাহাও সহস্র সহস্র লোকের বাহবা অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়। যশে লেখকের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। যশোলাভ করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা যশোলাভের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করাই নবীন লেখকের উচিত। যশ আপনি আসে, সে স্বতন্ত্র কথা; চেষ্টা করিয়া যশ পাইবার বাসনা ভাল নহে। অনেক অনুপযুক্ত ব্যক্তির ভাগ্যেই যশোলাভ ঘটে, উপযুক্ত ব্যক্তি যশ পান না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।"

(সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৩)।

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার না থাকিলেও ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে এসম্বন্ধে আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেইজন্য চিকিৎসক-প্রধান ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার সম্প্রতি পাব্লিক হেলথ্ কনফারেন্সের সভাপতিরূপে এই চিরন্তন ব্যাধির কারণ ও প্রতীকারসম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:—

আমাদের দেশে অন্যান্য ব্যাধি অপেক্ষা ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সংখ্যা অধিক। ম্যালেরিয়া দমনকল্পে বাঙ্গালাদেশে যেসকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তন্মধ্যে কুইনাইন ব্যবহার ও মশক নিবারণ-চেষ্টা প্রধান। সুস্থদেহে লোকের শরীরে ম্যালেরিয়া-বীজ বহনের জন্য মশক যেমন একদিকে

দোষী, মশকের শরীরে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবিষ্ট করাইবার জন্য ম্যালেরিয়াগ্রস্থ মনুষ্যও তেমনি দায়ী। অতএব কুইনাইন ব্যবহারে ম্যালেরিয়াগ্রস্থ ব্যক্তি নিজে যে সুস্থ হন কেবল তাহাই নহে, ম্যালেরিয়ার বিস্তারের প্রতিরোধ পক্ষে যথেষ্ট সাহায্যও করেন।

যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব আছে, সেখানকার সুস্থ অধিবাসীগণ যথারীতি কুইনাইন সেবন করিলে ম্যালেরিয়া আদৌ ছড়াইয়া পড়ে না। Ross সাহেবের মতানুবর্ত্তীগণ ম্যালেরিয়া-বীজ সম্যকরূপে নষ্ট করিবার জন্য খুব বেশী পরিমাণ কুইনাইন সেবনের ব্যবস্থা দেন।

ইটালীয়ান চিকিৎসকগণ মোটের উপর জর্ম্মাণ অভিজ্ঞদিগের মত অবলম্বন করিলেও ম্যালেরিয়ার প্রতি-রোধকল্পে সুস্থ লোকদিগকেও সামান্য পরিমাণে কুইনাইন সেবন করাইয়া থাকেন।

স্যার রোনাল্ড রস কর্ত্তৃক ম্যালেরিয়া-মশক-তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে মশক-নিবারণের জন্য একটা সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে।

Ross সাহেবের মশক-নিবারণের প্রণালী এইরূপ :—

১ম—পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল নিষ্কাশন।

২য়—খানা ডোবা বুজাইয়া দেওয়া।

৩য়—খানা ডোবা হইতে—বিশেষত পুলের নীচে বা নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে পচা জলজ উদ্ভিদ পরিষ্কার করা।

৪র্থ—উল্লিখিত ১ম ও ৩য় উপায়ে যেখানকার জল নিকাশের সুবিধা হয় না সেখানে কেরোসিন তৈল ব্যবহার।

৫ম—দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বা অন্য উপায়ে মশক দংশন হইতে নিজেকে রক্ষা করা।

সার রোনাল্ড রস সাহেবের প্রদর্শিত উপায়ে ইস্‌মলিয়া হাভানা ইত্যাদি অনেক দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীকৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যফল পাওয়া গিয়াছিল প্যানামা ক্যানাল কাটিয়া দেওয়ায়। কেবল ক্যাপ্টেন গগাস (Capt. Gogas) এর অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মকুশলতার জন্য প্যানামায় এই আশ্চর্য্য-জনক ফল পাওয়া গিয়াছিল। এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি রস সাহেবের প্রণালীও অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং কুইনাইনও খুব ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কাপ্টেন গগাস যথার্থই বলিয়াছেন যে, অতঃপর ম্যালে-রিয়া ও পীতজ্বর, এই দুই ব্যাধির হাত হইতে সামান্য মাত্র চেষ্টা দ্বারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে ইহা নিশ্চয়; এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ধ্বংসপ্রায় নগরী ও পল্লীসমূহ এই উপায়ে তাহাদের পূর্ব্বগৌরব ও শ্রী ফিরাইয়া আনিতে পারে।

বাঙ্গালাদেশের ন্যায় একটা বিস্তৃত ভূখণ্ডের মশক-নিবা-রণ-কল্পে চেষ্টা খুবই কষ্টসাপেক্ষ ইহা নিঃসন্দেহ। এপর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধকল্পে মোটের উপর কুইনাইন সস্তা দরে বিক্রয় করা ও কুইনাইন ব্যবহারের প্রচলন এবং ড্রেনেজ আইনের ৯০৭ ধারা অনুমোদিত কয়েকটি মজা নদীর পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে মাত্র। ভৈরব ও নবগঙ্গা নদীর পঙ্কোদ্ধার এবং মগরাহাট, বাগজোলা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া আংশিক উপকার হইয়াছে। ছোট ছোট জলা একটা বৃহৎ নদী বা নালার সহিত যোগ করিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থাও কোনও কোনও জায়গায় হইয়াছে। বন্যার জল ঢুকাইয়া পলি পড়ান এবং মাটীর নীচের পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল নিকাশের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আলোচনা চলিতেছে। এইসকল ব্যবস্থাই যথেষ্ট উদ্যম ও উৎসাহের সহিত সুপরিচালিতভাবে কার্য্যত প্রয়োগ করা উচিত এবং এতদুদ্দেশ্য সাধনে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন :—

১। বাঙ্গালায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

২। ম্যালেরিয়াই এই পতনের প্রধান কারণ।

৩। অন্যান্য দেশে চেষ্টা দ্বারা ম্যালেরিয়া বিদূরিত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার বিস্তার ও তাহার ফলে মৃত্যুর জন্য আবার মনে রাখিতে হইবে নিম্নলিখিত কয়টি দায়ী :—

১। ম্যালেরিয়াগ্রস্থ লোক।

২। মশা।

৩। দেশবাসীগণের শারীরিক আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা।

বাঙ্গালার বন্যার জলে যে পলি পড়ে তাহা একটা

বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিষ। এই পলিপড়ার রীতিমত পরিচালন ও ব্যবস্থা করিলে ইহার ফলে মশক-বংশ-নাশ দ্বারা কেবল ম্যালেরিয়া বিদূরিত হয় তাহা নহে, জমির উর্ব্বরতাও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়।

তানজোর ও গোদাবরী প্রদেশে এই উপায়েই বহু পরিমাণে নষ্ট জমির পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছে। ইটালী, হলাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও এইরকম উপায়ে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বহু পরিমাণে নষ্ট করা হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে এই প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বিশেষ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ইঞ্জিনীয়ার আবশ্যক। যে-বিপুল জলরাশি বন্যার সময় দেশকে প্লাবিত করে তাহাকে আবশ্যক মত বদ্ধ করিয়া উপযুক্ত স্থানে পলি পড়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ত হইবেই, তা ছাড়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা দেশের দারিদ্র্যও বিশেষ পরিমাণে দূর হইবে এবং তাহা হইলেই একটা স্থায়ী রকমের উপকার হইবে। এই প্রসঙ্গে Mannbersery এর ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে লিখিত পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

মশার সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও সংক্রামক ব্যাধিসমূহের মধ্যে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ছিল। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া জনবহুল সুস্থ লোকালয়ে প্রবেশ করত তাহার ধ্বংসকারী বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুবিধা পাইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দেশবাসী দিন দিন ক্ষীণবল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ক্রমশঃ চাষের অবনতি আরম্ভ হইল এবং উর্ব্বরা জমি-সকল বিনা-চাষে সেইভাবে পড়িয়া থাকিয়া কেবল ম্যালেরিয়ার মশক উৎপাদনে সাহায্য করিতে লাগিল মাত্র। এই "মশক ও ম্যালেরিয়া" তথ্য আবিষ্কারের পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া দমন করিবার প্রকৃষ্ট ও একমাত্র উপায় ছিল কৃষি। এখনও ঠিক সেই কথাই দাঁড়াইতেছে। ম্যালেরিয়ার বিপক্ষে যত-কিছু উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, ঐসকল গুলির একমাত্র লক্ষ্য —জল নিকাশ দ্বারা জমির জলভাগ নষ্ট করা—ফলে জমিকে চাষের পক্ষে উপযুক্ত এবং উর্ব্বর করা। কেবল জলাভূমির জল নিকাশ করিলেই ম্যালেরিয়া তাড়ানর উপায় হইল না—ঐ জমিগুলির চাষ করিতে হইবে তবে উহা-দ্বারা এই ব্যাধির প্রতিষেধের সাহায্য করা হইবে। তাহা না হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে না। এই সকল জমিগুলিকে কেবল গোচারণ ভূমি বা পতিত করিয়া ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না; ইহাতে রীতিমত চাষ করিতে হইবে, রবিশস্য, ধান্য, ইক্ষু ও Eucalyptus প্রভৃতির চাষ করিতে হইবে। স্থানীয় আবহাওয়া ও আবশ্যকতা অনুযায়ী কোন্ জিনিষের চাষ বেশী সুবিধাজনক তাহা নির্ণীত হইতে পারে।

কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধন ম্যালেরিয়ার পুরাতন শত্রু। বর্ত্তমানেও ঐ ব্যাধির হাত হইতে নিজেদের রীতিমত রক্ষা করিতে হইলে সেই পুরাতন পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। যেখানে কৃষির অবনতি এবং যেখানে পতিত জমির ভাগ বেশী, সেখানেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী।

বৈদ্যনাথ।

জমীদারদের নানাবিধ আদায় উশুল

ইহা জানা কথা, যে, রায়তদের নিকট হইতে জমীদারদের কর্ম্মচারীরা খাজনা ছাড়া আরও অনেক টাকা আদায় করিয়া থাকে। ইহার কতটা বে-আইনী, কতটাই বা আইন-সঙ্গত, তাহার বিচার করিব না। কতটা জমীদার পান, কতটাই বা কর্ম্মচারীরা গ্রাস করে তাহাও জানা নাই। কাহার কাহার জমীদারীতে ইহা হয়, কাহার কাহার জমীদারীতে ইহা হয় না তাহা জানি না, অনাবশ্যক বোধে তাহা জানিবার চেষ্টাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কোন্ জমীদারের অজ্ঞাতসারে এরূপ আদায় হয়, কোন জমীদারের জ্ঞাতসারে হয় তাহাও জানিবার উপায় নাই। কিন্তু একটা নিয়ম যদি জমীদারেরা প্রবর্ত্তিত করেন তাহা হইলে ভাল হয়। তাঁহারা নায়েব গোমস্তাদের করুন ও প্রজাদিগকে জানাইয়া দিন, যে খাজনা বা অন্য যাহা কিছু আদায় হইবে, সমস্ত আদায়ী টাকার জন্যই প্রজাদিগকে রসিদ দিতে হইবে। তাহা হইলে জমীদার জানিতে পারিবেন, কত টাকা আদায় হইয়াছে

এবং কত টাকা তাঁহার হস্তগত হইতে পারিবে, যদিও ফাঁকিদার কর্ম্মচারীর প্রবঞ্চনা সবস্থলে বন্ধ করা নাও যাইতে পারে। ইহা দ্বারা জমীদার ইচ্ছা করিলে অত্যাধিক আদায়ের অত্যাচার নিবারণও করিতে পারিবেন।

আমাদের প্রস্তাবিত নিয়মের বিরুদ্ধে আপত্তি এই হইবে, যে ইহার দ্বারা বে-আইনী আদায় প্রমাণ করিবার দলীল প্রজাদের হাতে দেওয়া হইবে এবং তদ্বারা কালক্রমে খাজনা ছাড়া আর সব আদায় বন্ধ হইয়া যাইবে ও ধনাগমের একটা পথ বন্ধ হইবে। ইহা সত্য কথা কিন্তু জমীদারেরা জানিয়া রাখুন, সব রকম উৎপীড়ন, জুলুম, অত্যাচার বন্ধ হইবেই, এবং অচিরে হইবে। প্রস্তাবিত নিয়মটা তাহারা না চালান অন্যেরা ইহা আইন করিয়া চালাইবে। অন্যেরা কিছু না করিলেও প্রজারা স্বয়ং করিবে। কারখানার, রেলওয়ের, জাহাজঘাটার কুলী, মজুর, মিস্ত্রীরা জোট বাঁধিয়া অত্যাচার নিবারণ করিতেছে, নিজেদের আয় বাড়াইতেছে, কৃষাণেরাই চুপ করিয়া থাকিবে মনে করেন? আগ্রা অযোধ্যায় কৃষাণেরা জাগিয়াছে, বাঙ্গালী চাষার কি প্রাণ নাই? আগ্রা অযোধ্যায় শিক্ষিত নেতা জুটিয়াছে বাঙ্গালায় জুটিবে না? কৃষাণেরাও জাগিবে, বাঙ্গালী চাষার ও প্রাণ আছে, বঙ্গেও শিক্ষিত নেতা জুটিবে। অতএব যাহা ঘটিবেই, জমীদারেরা সেরেস্তায় স্বয়ং তাহা করুন তাহাতে তাঁহাদের মনুষ্যত্ব দয়াধর্ম্ম বজায় থাকিবে ও বাড়িবে এবং প্রজাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষিত হইবে; মহাজাতি গঠনে সাহায্য হইবে। যদি এমনই হয়, যদিও তাহা অসম্ভব, যে বঙ্গের প্রজাদের নিকট হইতে চিরকালই খাজনার অতিরিক্ত টাকা আদায় সুসাধ্য থাকে, তাহা হইলেও ন্যায়ের খাতিরে তাহার জন্য রসিদ দেওয়া উচিৎ। রায়তরা ও তাহাদের বন্ধুরা দুর্ব্বল হইতে পারে, কিন্তু জগতেও ধর্ম্মের জাঁতার ঘর্ঘর শুনা যাইবে।

আমাদের প্রস্তাবিত নিয়ম উভয়পক্ষের কল্যাণকর।

প্রবাসী—(জ্যৈষ্ঠ)

—

চরকা

কুশদহ-সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন-উপলক্ষ্যে প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় যে নূতন প্রকার চরকা তৈয়ারীর নমুনা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে যতদিন না তিনি সফলকাম হইতেছেন কিম্বা যতদিন অপর কেহ এমন কোনও চরকার বহুল প্রচার না করিতেছেন যাহাতে অল্প সময়ে অযথা পরিশ্রম না করিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন-মত সূতা কাটা যায়, ততদিন আমাদের সেই "ঠাকুরমার" আমোলের চরকাই বাহাল থাকিবে। কিন্তু এ ব্যাপারে যেখানে "কাজ আটকাইয়াছে" সেখানে ইতিমধ্যেই কিছু-না-কিছু "বুদ্ধি যোগাইয়াছে।" এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে জ্ঞাপন করিবার জন্য গত বৈশাখের ১৬ই তারিখের দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে,—

"কলিকাতা ৩৫।৩ অখিল মিস্ত্রির লেন হইতে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিভূষণ রায় মহাশয় জানাইতেছেন, তিনি একটি সুন্দর চরকা বাহির করিয়াছেন। উহা মাত্র ১ইঞ্চি×৪ স্থান অধিকার করে। চরকাটিতে একটু বিশেষত্ব আছে—একবার ঘুরাইয়া দিলে টেকোটি ৫০০ শত বার ঘোরে। মূল্যও সুলভ, বার আনা মাত্র।"

গত চৈত্রের "ভারতবর্ষে" শ্রীবিশ্বকর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত নিম্নলিখিত সংবাদগুলি "সম্পাদকের বৈঠকে" প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ মজুমদার চরকা, জিনিং মেশিন (তুলা ধোনা কল) ও ফ্লাই সাটেল লুম তৈয়ার করিতেছেন শুনিয়া ২ বি কানাইলাল ধরের লেনে তাঁহার কলগুলি দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে এখন কেবল চরকা তৈয়ারী হইতেছে। জিনিং মেশিন বা তাঁতের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম, এখনও তৈয়ার হইয়া উঠে নাই।

(২) ২৯ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা—ভারত-লক্ষ্মী চরকা; মূল্য ৬॥০ টাকা।

(৩) নন্দী ব্রাদার্স ১নং নন্দীষ্ট্রীট্ বালিগঞ্জ,ষ্টেশনের নিকট।

(৪) হ্যাণ্ডলুম, ৩৫নং এজরা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(৫) সেগুণ কাঠের উন্নত চরকা, গোষ্টবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ষ্টার থিয়েটারের কাছে।

(৬) সাধুর চরকা, ১৭নং নাথের বাগান ও ১৩নং কাশীদত্তের ষ্ট্রীট্, নিমতলা, কলিকাতা।

৭) সিটি ট্রেডিং সিণ্ডিকেট, চরকা। দাম ৩৲টাকা হইতে ১৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। * * ইঁহাদের ঠিকানা ৪৮।১ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।

(৮) দার্জ্জিলিঙের বাবু প্রিয়নাথ রায়-উদ্ভাবিত "সরলা চরকা" সম্বন্ধে উক্ত চরকার প্রস্তুতকারক দি জেনারেল ইঞ্জিনীয়ারীং কোম্পানী সংবাদ দিয়াছেন যে, এই "সরলা চরকা" তিন শ্রেণীর; মূল্যাদি যথাক্রমে ২২৲, ৩০৲ ও ৫০৲ টাকা।

(৯) ৭৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে চরকা, তুলা ধুনিবার ধনুক ও অন্যানা সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে।

(১০) রিপন ষ্ট্রীটে বেরী কোং ইস্পাতের চরকা তৈয়ার করিয়াছেন। মূল্য ১৫৲ টাকা।

(১১) ১০নং ছুতোর পাড়া লেন, চাঁপাতলা চরকা, মূল্য ৩৷৷০ টাকা।

(১২) মনোমোহন লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ৪৷০ টাকা।

(১৩) গৃহশিল্প প্রচার-সমিতি—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "গৃহশিল্প" মূল্য ৷৷০ আনা।

ইহাতে বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর আছে। ঠিকানা ১নং সরকার লেন, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।"

চরকার প্রচলন এদেশে একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছিল বলিলেও চলে। ফলে তুলা কোথায় সুবিধামত পাওয়া যাইতে পারে, কিরূপে তুলার পাট করিতে হয়, কিরূপে এবং কোথা হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চরকা-কাটা সুতা সংগ্রহ করা যাইতে পারে ইত্যাদি নানা প্রকার সংবাদ পাইতে অনেকেই আগ্রহান্বিত। তাঁহাদের জ্ঞাপনার্থ "বসুমতী" প্রকাশ করিয়াছেন,—

"চট্টগ্রাম চাকারিয়া ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল্ কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় জানাইতেছেন—চট্টগ্রাম জেলায় কার্পাসের চাষ বিস্তর পরিমাণে হইয়া থাকে, এবং স্থানীয় ভদ্রমহিলাগণ বহুল পরিমাণে চরকায় সুতা কাটিয়া থাকেন। সুতা প্রধানতঃ দুই প্রকার—চিকণ ও মোটা। চিকণ সুতা প্রতি সের দুই টাকা বারো আনা, মোটা সুতা প্রতি সের দুই টাকা চারি আনা। নমুনা ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য উক্ত ম্যানেজার মহাশয়কে পত্র লিখিলে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।" (২৮—১—২৮)

অন্যত্র—

"১০৯নং অপার সারকুলার রোডের শ্রীযুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেনকে আমরা চরকা-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া জানি। তাঁহারা সকল রকম চরকা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন; সুতা কাটিতেও বিশেষ অভিজ্ঞ। যাঁহাদের চরকা-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই তাঁহারা চরকা কিনিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে লইলে সুপরামর্শ পাইবেন। সকলের অবস্থা ও ব্যবস্থা-অনুযায়ী এবং নূতন উন্নত ধরণের চরকা তাঁহারা সরবরাহ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া বাড়ীর মেয়েদের সুতা-কাটা শিখাইয়া দিতে পারেন। ইঁহারা বিদ্যাসাগর-বাটীতে কার্পাস সরবরাহ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের নিকট কার্পাস, পাঁজকাটি, নাটাই, টাকু, ধনুক, তাঁত, নলী প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইঁহাদের "চরকা-শিল্প-শিক্ষা-প্রণালী" নামক পুস্তিকা নাম মাত্র পাঁচ পয়সা মূল্যে বসুমতী আফিসে পাওয়া যায়।" (১৯—১—২৮)

চরকার সুতা শক্ত করা সম্বন্ধে বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীসত্যভূষণ দত্ত মহাশয় "একটি মনিপুরী মেয়ের" অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। মেয়েটির কথা যে গ্রহণযোগ্য নহে তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া অনেকটা উপলব্ধি করিয়াছেন। মেয়েটিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "হাতের কাটা সুতা বিলাতী সুতার মতো, শক্ত হয় না কেন, তখন সে বল্লে, হবে না কেন! খুব হয়।—এই হাতে-কাটা সুতাকে দু' দিন জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর এই জলের মধ্যে ভাল করে সিদ্ধ করে নিলে ঠিক বিলাতী সুতার মতো শক্ত হয়।' এই ভাবেই ওরা (মনিপুরের লোকেরা) হাতের কাটা চরকার সুতা দিয়ে কাপড় লেপ ইত্যাদি বোনে।"

রাখাল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

"কুশদহ-সমিতির সেক্রেটারী মহাশয় "কুশদহ" পত্রিকা সম্বন্ধে দেশবাসীর নিকট যে নিবেদন জানাইয়াছেন তাহা বিশেষ সময়োপযোগী। "কুশদহ" কুশদহ-সমিতির তথা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি; ইহার উপসত্ব যদি কিছু থাকে তাহা কুশদহ সমিতিই দেশের কাজে ব্যয় করিবেন। কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ ইহাতে নাই। এই দিক দিয়া দেখিলে প্রত্যেক কুশদহ-বাসীর নিকট পত্রিকাখানি কতকটা সাহায্য ও সহানুভূতির দাবী করিতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাও বিবেচ্য যে কোনও রকম একখানা মাসিক পত্রের গ্রাহক হইতে হইলে যে মূল্য দিতে হয় তাহা সেই কাগজের স্বত্বাধিকারীর আয় হিসাবে পরিগণিত হয়। "কুশদহ"র বিশেষত্ব এইটুক যে এক্ষেত্রে মাসিক পত্র পাঠের ইচ্ছা এবং যদি তাহার উপকারিতা বা আবশ্যকতা কিছু থাকে তাহা উপভোগ এবং সাধারণের কাজে অর্থদান একাধারে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। কুশদহ অন্তর্গত গ্রাম সংখ্যা ২৩৮ খানি। প্রতি গ্রামেই "কুশদহ"র গ্রাহক হওয়া আবশ্যক। ২৩৮ খানি বঙ্গ পল্লীর বিষয় লইয়া যে পত্রিকা পরিচালিত তাহা—একেবারে অতি ক্ষুদ্র ও অনাবশ্যক নহে।

* * * *

কুশদহবাসী সকলেরই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া চাই। প্রত্যেক গ্রামে সমিতির শাখা স্থাপন আবশ্যক। কুশদহ সমিতি একদিনেই টাকার তোড়া লইয়া গিয়া কোনও গ্রামের সমস্ত দুঃখ দৈন্যের অভাব অভিযোগের তালিকা ধরিয়া জমীদার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের মত দরবারে বসিয়া আবশ্যক মত অর্থদান ও তাহাদের অভাব মোচন করিবেন এরূপ কোনও কল্পনা ভ্রমাত্মক। আমরাই সমিতির সভ্য। আমাদের কাজ আমরাই করিব তাহাই কুশদহ-সমিতির কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমাদের যতটুকু শক্তি তাহা একত্রিত করিয়া (অর্থাৎ সমিতি গঠন দ্বারা) যে কাজ আমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে তাহা সম্পন্ন করিব। যেরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব সেইরূপ ভাবের কাজে হাত দিব। তবে, এই সবেরই মূলে হইতেছে সমবেত চেষ্টা। চেষ্টা সমবেত হইলে যাহা আজ দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা সুসাধ্য হইবে অর্থ সংগ্রহ সহজ হইবে এবং ফলতঃ যে কোনও চেষ্টা ফলবতী হইবে। এই জন্যই সমিতির আবশ্যকতা। এবং সেই আবশ্যকতা প্রচারই "কুশদহ"র মুখ্য উদ্দেশ্য!

* * * * *

বর্ত্তমানে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন একটা সর্ব্ববাদী-সম্মত উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী-দিগের মধ্যে আপন আপন পক্ষে অনেক যুক্তি তর্ক দেখাইবার থাকিলেও কোন একটি প্রদর্শিত পথই বর্ত্তমান কালে দেশের পক্ষে সকলবিষয়ে উপযোগী এ কথা নিঃসন্দেহচিত্তে ও মুক্তকণ্ঠে কেহই বলিতে পারেন না, পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধেও তেমনি এখনও একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালী ও তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ফুটিয়া উঠিতেছে না। দলবদ্ধ হইয়া সমবেত শক্তিতে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার ভাবের বেশ একটা ঢেউ আসিয়াছে বটে, কিন্তু সমবেত-শক্তি কার্য্যতঃ প্রয়োগ কালে তাহার অনুবর্ত্তী ও পারি-পার্শ্বিক ব্যাপারগুলিকে লক্ষ্য করিবার শক্তি থাকা চাই। স্বাধীনতা জিনিষটাকে বুঝিতে পারিবার ক্ষমতা আমাদের

অনেকেরই নাই। স্বাধীনতা কি জিনিষ তাহা যখন আমরা কল্পনায় আনতে পারি না, তখন তাহা অনুভব করিবার শক্তিও আমাদের থাকিতে পারে না। অথচ এই মৌখিক স্বাধীনতা-প্রিয়তার দোহাই দিয়া আমরা অনেক সময়ে যে-ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই তাহা ক্রমে স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছা ব্যবহারে পরিণত হয়। যথেচ্ছা ব্যবহারই স্বাধীনতার লক্ষণ নহে।

আমরা এত অকর্ম্মণ্য হইয়াছি কেন?

একটা কথা আমাদের পক্ষে এমন বিশেষ ভাবে খাটে যাহা পৃথিবীর অন্য কাহারও পক্ষে খাটে না। আমাদের এই যে কর্ম্মকুশলতার অভাব বা নিজের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া নিজের কাজের বাধা নিজেই সৃষ্টি করা, ইহার মুল কারণ ঠিক আমাদের মধ্যেই বিরাজ করিতেছে না। এমন একটা আমাদের মনের অবস্থা ছিল—ছিল কেন, যাহার চিহ্ন আজও অনেক স্থলেই দেখা যায়, যে অবস্থার ফলে আমরা উদ্ধারের বহু পথ থাকিতেও যেন নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্রমশঃ ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছি। পাশ্চাত্যজ্ঞানের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় যেমন একদিকে বহির্জগতের সহিত নিজেদের অবস্থা তুলনা করিবার একটা ক্ষমতা আমাদের জাগিয়া উঠিয়াছে অপর দিকে তেমনি রেলগাড়ী, জাহাজ, ডাক, টেলিগ্রাফ, ইলেকট্রিক ট্রাম ও মটর গাড়ী, ইত্যাদি পাশ্চাত্য সভ্যতার চমকপ্রদ আসবাব সমুদয় আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে একটা বিপুল তাজ্জবের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই ফলে আমরা নিজেদের অবস্থা এত হীন করিয়া ফেলিতেছি যে বলিবার নয়। রেলগাড়ীর কল কারখানা যখন শান্ত-বঙ্গ-পল্লীর মাঠের উপর দিয়া হুস্ হুস্ শব্দে চলিয়া যায়, যখন এক পয়সার ডাকে একখানা চিঠি দুই দিনের পথ অতিক্রম করিয়া সংবাদ বহন করিয়া আনে, যখন এক ঘণ্টায় তারের খপর হাজার ক্রোশ দূর হইতে বিদ্যুতের বেগে চলিয়া আসে তখন বিস্ময়ে ও এই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হইয়া পড়ে। অন্য সকল দেশের জনসাধারণ বোধহয় আমাদের দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা বিশেষ ভাবে শ্রেষ্ঠ-গুণ-সম্পন্ন নহে। অথচ বিলাতের বা জাপানের জনসাধারণ তাহাদের দেশের কলের গাড়ী, বিজলী বাতি, হাওয়া গাড়ী ও তারের-খপরের সৃষ্টি-কর্ত্তাদের অমানুষিক শক্তির আধার বা দৈব-গুণ সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে না। গ্যালিলিও নিউটন যে কেবল পাশ্চাত্যদেশের একচেটিয়া তাহাত বোধ হয় না; ভগবানের রাজ্যে সকল দেশেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম হয়। অথচ আমাদের কেন এই ভাব বৈষম্য? এই চিন্তাস্রোতের ভিন্ন গতির যে কি কুফল তাহা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার "দৃপ্তকটাক্ষ"কেবল আমাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে তোমরা অতি ছোট, অতি হীন অতি অসমর্থ"। রেলগাড়ী বলে "তোমরা এমন রেলগাড়ী কখন দেখিয়াছিলে কি? জাহাজ বলে তোমরা এমন কল কখনও দেখিয়াছিলে কি? আর আমরা ভয়ে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া এতটুকু হইয়া যাই, উদ্ধারের পথ থাকিতেও খুজিয়া পাই না, চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাইনা। প্রতিরোধ—সাধ্য ব্যাধি ম্যালেরিয়া—তাহার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কানের কাছে অনবরত শুনিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করি "ওরে বাপরে! ওকি আমাদের সাধ্য?" যেন আমাদের কেহ যাদু করিয়াছে, এ যে ভীষণ যাদু! মৃত্যুভয় হইতেও নিজেদের বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করেনা এত তার বশীকরণ শক্তি। আর কতদিন এভাবে চলিবে?

* * * *

কত আত্মঘাতী বিষময় ফলই ফলিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত এই যে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আপন কর্ম্ম-কুশলতার উপর বিশ্বাস এই জিনিষটা অনেকেরই পক্ষে কষ্টকল্পনা। একথা বোধহয় খুবই সত্য যে আমরা সহজে কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী বা কর্ম্মক্ষমতার প্রশংসা দিতে প্রস্তত-নহি। অর্থাৎ আমরা নিজেদের কর্ম্মক্ষমতায় এত সন্দিহান এবং আত্মশক্তিতে এত অবিশ্বাসী যে ঘটনাস্থলে যখন অপর কাহারও উপর বিশ্বাস কাহারও শক্তির উপর নির্ভর করিবার আবশ্যক হয় তখন আমাদের আত্মনির্ভরতা শুন্য হৃদয় সন্দেহের ও অবিশ্বাসের ইঙ্গিত ব্যতীত স্বচ্ছন্দ উদারতার ভিতর দিয়া তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার শুভ ইচ্ছা দান করিতে পারে না।

আমাদের দেশে লিমিটেড কোম্পানী টিকিত না এই-রূপই একটা কর্ম্ম-বিভ্রাটের জন্য। বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস পাওয়া দুইই স্বাধীন চেতার লক্ষণ। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রসূত যে শক্তি তাহাই কার্য্যক্ষেত্রে অধিক ফলদায়ক। এইটা এখন বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

ঘরের কথা

কুশদহ-সমিতির তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন ও কৃষিশিল্প প্রদর্শনী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

অধিবেশনের তৃতীয় দিবসও একটি সভা হয়। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সহায় নারায়ণ পাল ঐ সভার সভাপতি হয়েন। তিনি অতি সরল ভাষায় তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে দেশে যে অভাবগুলি অনুভব করিয়াছেন, সেই গুলির আলোচনা করেন। আমাদের চির অভ্যস্ত সহজ সরল পথ ত্যাগ করিয়া আমরা কিরূপ বিলাসী হইয়াছি তাহা কিছু কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এই বিলাসিতাই আমাদের নানা অভাবের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমাদের কতগুলি অভাব আমাদের স্বেচ্ছাকৃত তাহা সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। এবং পরিশেষে আমাদিগকে বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া পুনরায় সেই শান্ত সরল জীবন অতিবাহিত করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার সেই দীর্ঘ বক্তৃতা অন্ততঃ দুই সহস্র লোক আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিতে থাকুন, ইহাই প্রার্থনা। অন্যান্য কয়েকটি বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন। অতঃপর ভঙ্গ হয়।

অধিবেশনে যে সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন আমাদের ইচ্ছা আছে সেই সব বক্তৃতার সারাংশ আমরা কিছু কিছু প্রকাশিত করিব।

প্রদর্শনী এবং অধিবেশন সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য এই সংখ্যায় শেষ করিব আমাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নানা কারণে এবং বিশেষতঃ এখনও সমস্ত বিবরণ সংগৃহীত না হওয়ায় তাহা হইল না। সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

কুশদহের সেবায় যে-সব কুশদহবাসী ভদ্র মহোদয়গণ সমবেত হইয়া ছিলেন। এবং এই অধিবেশনটীকে সফল করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের নিকট কিছুর প্রত্যাশী ন'ন্ তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি আমাদের কর্ত্তব্য বোধে আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই অধিবেশনে জমীদার শ্রীযুক্ত সতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সকল রকম সাহায্যের জন্য আমরা তাঁহার কাছে ঋণী।

জমীদার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই সত্য কিন্তু তাঁহার কাছেও অমরা বিশেষ ঋণী। উভয়ের কর্ম্মচারীগণও আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

... .

... ...

সমিতির ৪র্থ বর্ষের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শাখা সমিতি হইতে মূল সমিতিতে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হেতু মূল সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠনে একটু বিলম্ব হইয়াছে। যাহা হউক গত মাসিক অধিবেশন নিম্নলিখিত সভ্যগণ ঐ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১। শ্রীপতিরাম বন্দোপাধ্যায় — গৈপুর
২। শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র মিত্র — ঐ

৩।	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র	গৈপুর
৪।	শ্রীচারু চন্দ্র ঘোষ	খাঁটুরা
৫।	শ্রীহরিচরণ বন্দোপাধ্যায়	ঐ
৬।	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল	ঐ
৭।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ
৮।	শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরি	চারঘাট
৯।	শ্রীসরোজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ইছাপুর
১০।	শ্রীদুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়	ঐ
১১।	শ্রীনীলাচল মুখোপাধ্যায়	বেড়গোম
১২।	শ্রীগিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
১৩।	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
১৪।	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু	গোবরডাঙ্গা
	সম্পাদক	
১৫।	শ্রীনিশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	মাটীকোমরা
	সহঃ সম্পাদক।	
১৬।	শ্রীজ্যোতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	ঐ

ইতি মধ্যে সমিতির সাধারণ সভার ২টী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দুই সভায় উপস্থিত সভ্যগণের সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। আশা করি এখন হইতে সকল সভ্যই উপস্থিত হইতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

* * * *

বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কুশদহ সমিতির মুখপত্র এই "কুশদহ" পত্রিকা বাহির হইয়াছে। সকলকে বলা বাহুল্য "কুশদহ" পত্রিকা সমিতির সম্পত্তি। ব্যক্তিগত স্বার্থ ইহাতে কাহারও নাই। যদি এই পত্রিকার কিছু আয় হয় তাহা সমিতির। সমিতির উদ্দেশ্য সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। দেশের জন্য, কুশদহের জন্য আশা করি সকলেই এই নবপর্য্যায় "কুশদহ" পত্রিকার আদর করিবেন। ইহার ক্রটি যথেষ্ট থাকিবে। এই সমস্ত ক্রটী দূর করিতে সমিতি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক সভ্যের এবং প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা সকলেই সাধ্যানুসারে এই পত্রিকার প্রচারবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবেন। কুশদহের প্রতি গ্রামেই গ্রাহক আবশ্যক। সকলেই এ বিষয়ে চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা যে সফল হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রার্থনা করি সহৃদয় পাঠকগণ এ বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

শ্রীনিশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক
কুশদহ সমিতি

খাঁটুরা পাঠাগার

গত ২৪শে বৈশাখ শনিবার বেলা ৬টার সময় খাঁটুরা স্কুল প্রাঙ্গণে খাঁটুরা-পাঠাগারের অষ্টম বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সময়োপযোগী একটী সঙ্গীতের পর শ্রীমান্ বিদ্যুৎবিকাশ রক্ষিত অতি সুন্দর আবৃত্তি করিয়া সকলের মনোমুগ্ধ করিয়াছিলেন। সম্পাদক কর্ত্তৃক বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয়। সন্ধ্যার পর কলিকাতা শ্রমজীবি-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সমাগত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার আচার্য্য এম এ মহাশয় ছায়াচিত্রাদি সহযোগে এক সুন্দর বক্তৃতা করেন।

পরদিন সকালে খাঁটুরা-পাঠাগার গৃহে পাঠাগারের নিয়মাবলী নির্দ্ধারণের জন্য সবকমিটির এক অধিবেশন হয়। তৎপরে পাঠাগারের সভ্যগণ আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মনোনয়ন করেন :—

সভাপতি—ডাক্তার শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কালীদাস রক্ষিত
সহকারী সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত
২। ,, গোষ্ঠবিহারী রক্ষিত
৩। ,, যোগজীবন রক্ষিত

৪। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন আশ
৫। " জগৎজ্যোতি রক্ষিত
৬। " অক্ষয়কুমার দত্ত
৭। " রবীন্দ্রনাথ আশ
৮। " সুবোধচন্দ্র রক্ষিত
৯। " শিবদাস রক্ষিত
১০। " সংসারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

লাইব্রেরীয়ান——শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আলোচনা সভার সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায়
আলোচনা সভার সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র রক্ষিত—সহঃ সম্পাদক।

জলকষ্ট

কি ভীষণ জলকষ্টই না হইয়াছে। অধিকাংশ গ্রামে একটিমাত্রও জলাশয় নাই। যেখানে আছে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। মাত্র দুই হাত গভীর জলাশয় হইতে চারি পাঁচ খানি গ্রামবাসী নর নারী শিশুদিগের পানীয় ও রন্ধনের জল সংগৃহীত হইতেছে। গরুর গাড়ী করিয়া ৪।৫ মাইল দূর হইতে পানীয় ও রন্ধনের জল আনিতে হয় এরূপ গ্রামের সংখ্যা বড় কম নহে। প্রতি বৎসরই এইরূপ ভীষণ কষ্ট, এবার নূতন নহে—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা জলাভাবে মরিতে রাজী আছি তবু প্রতিকারের চেষ্টা করিব না। চেষ্টা করিলে কি জলকষ্ট দূর হয় না?

খাঁটুরার শ্রীযুক্ত সহায় নারায়ন মহাশয় আজ প্রায় তিন বৎসর হইল কুশদহস্থ কোন গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ জন্য সমিতির হাতে চারি শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। অথচ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সমিতি সে সম্বন্ধে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই কেন তাহার একটা জবাবদিহি করা এই সঙ্গে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। কয়েকটি বাধা উপস্থিত হওয়ায় একার্য্য ঘটিয়া উঠিতেছে না। প্রথম, চারিশত টাকা পুষ্করিণী বা ইঁদারা খননের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ নহে। নূতন পুষ্করিণী বা ইঁদারা খনন করা অপেক্ষা কোন মজা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার এই টাকায় বেশ হইতে পারে এবং এরূপ ভাবে পঙ্কোদ্ধৃত জলাশয়ে সাধারণের ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকিতে পারে। দুঃখের কথা, কোন পুষ্করিণীর স্বত্বাধিকারীই সাধারণের ব্যবহারের জন্য নিজের মজা পুষ্করিণী সমিতির অর্থে উদ্ধার করিতে দিতে রাজী নহেন। ২য়, নূতন পুষ্করিণী বা ইঁদারার জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করাও দুঃসাধ্য; কারণ অন্ততঃ ১২০০৲ টাকার মধ্যে, চারিশত টাকা যাহা প্রতিশ্রুত তাহা ছাড়া, বাকী টাকা সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। অল্প ব্যয়ের জলাশয় এক পাতকুয়া। এই উদ্দেশ্যে, কোথায় এই অর্থ উপযুক্তভাবে ব্যয়িত হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য সমিতির কয়েক জন সভ্য বিভিন্ন গ্রামে ঘুরিয়া অনুসন্ধান করেন। কিন্তু সকল গ্রামেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের যথেষ্ট অভাব থাকিলেও যে সামান্যমাত্র খোলা জলের ডোবা বা পুকুর আছে তাহাতেই গ্রামবাসী কোন রকমে কাজ চালাইয়া লইতেছে এবং নিজেদের দিক হইতে এ সম্বন্ধে প্রতিকারের কোনও চেষ্টা বা ইচ্ছা প্রবল নহে। সমিতি এরূপ উৎসাহহীন গ্রামে পাতকুয়া খনন দ্বারা কোনও স্থায়ী উপকার হইবে বলিয়া মনে করেন না। কেননা গ্রামের লোক কুয়ার যথেষ্ট যত্ন লইবেই না উপরন্তু এরূপ অযাচিত দান কখনই মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না বরং উদাসীনতা ও কাল্পনিক অসমর্থ অবস্থাকে প্রশ্রয় দেয় মাত্র। এই কারণেই হাবড়ার নিকট ফুলতলা গ্রামে পাতকুয়া খনন করা এক রকম নির্দ্ধারিত হইলেও সে বিষয়ে গ্রামবাসীর উৎসাহ ও ইচ্ছার অভাবে এ পর্য্যন্ত উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

মাটিকোমরা শ্রীনাথ বিদ্যালয়

সম্প্রতি ইহার বার্ষিক অধিবেশন ও পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে মাটিকোমরায় একটী সভা হইয়াছিল। শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ঘটক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্কুলটির এখন নিতান্ত শিশু অবস্থা। গ্রামবাসী সকলে এই স্কুলটির যাহাতে ভাল হয় তদ্বিষয়ে একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে ইহা বোধহয় স্থায়ী হইতে পারিবে।

Printed at the Carmichael Press 179 Manicktala St., by N. N. Mukerjee and published by him from 87 Durga Charan Mitter St., Calcutta.

"কুশদহ"র নিয়মাবলী

১। "কুশদহ"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ২।৵০। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য তিন আনা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইবে বৈশাখ হইতে কাগজ লইতে হইবে। মূল্য "সম্পাদক, কুশদহ" এই নামে প্রেরিতব্য।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোনও মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের শেষ তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে ও পত্রিকা-কার্য্যাধ্যক্ষকে জানানো আবশ্যক।

৩। রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৪। অমনোনীত রচনা ফেরত চাহিলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

৫। পুরাতন গ্রাহকগণ যে-কোনও পত্র লিখিবার সময় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৬। নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে গ্রাহকনম্বর সহ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৌছান আবশ্যক।

'কুশদহ'র বিজ্ঞাপনের মূল্য

১। মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা—
পূর্ণ পৃষ্ঠা ১২৲। ½ পৃষ্ঠা ৭৲। ¼ পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা।

২। মলাটের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা—
পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲; ½ পৃষ্ঠা ৬৲; ¼ পৃষ্ঠা ৩॥০ টাকা।

৩। বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা—

১ পৃষ্ঠা	৬৲ টাকা।
½ "	৩॥০ টাকা।
¼ "	২৲ টাকা।

৪। বিজ্ঞাপনের ফর্ম্মার ১ম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা—

১ পৃষ্ঠা	৭৲ টাকা।
½ "	৪৲ টাকা।
¼ "	২॥০

৫। উক্ত বিজ্ঞাপনের হার সমস্তই মাসিক।

৬। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৭। এক বৎসরের চুক্তিতে অগ্রিম টাকা জমা দিলে শতকরা ৫৲ টাকা কম লওয়া হয়।

৮। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

"কুশদহ"-কার্য্যাধ্যক্ষ
৮৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

কুশদহ

(কুশদহ-সমিতির মুখপত্র)

সচিত্র মাসিক পত্রিকা



কার্য্যালয়

৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—:o:—

নব পর্য্যায়, ১ম বর্ষ	বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৶০ প্রতি সংখ্যা ৶০	আষাঢ়, ১৩২৮ তৃতীয় সংখ্যা



কুশদহ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

নবপর্য্যায়, ১ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২৮ | ৩য় সংখ্যা

দর্পণ

একজন মহাত্মা বলেছেন কুপাত্রে শক্তি আশ্রয় নিলে তা অতি কুৎসিৎ আকার ধারণ করে। জগতে যে এত দ্বন্দ্ব কোলাহল, তা এই শক্তির অপব্যবহারেরই জন্য। চারিদিকে দেখতে পাই স্বার্থ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি চল্‌ছে। যার গায়ে জোর বেশী সে অপরের অন্নের মুষ্টি কেড়ে নিচ্ছে। হয়তো তার অন্নের প্রয়োজনই নাই, সে কেড়ে নিচ্ছে ভাণ্ডার ভরবার জন্যে, অথবা শক্তি দিয়ে যে আর একজনকে কাবু করতে পেরেছে সেই পাশবিক আনন্দ পাবার জন্যে। কারো বা বুদ্ধি বেশী সে পরের দুর্ব্বলতা বুঝে সেইখানে আঘাত করে' তাকে পাত করছে। তুমি মনে কর তুমি বড় ভাল লোক। কিন্তু একবার ভেবে দেখ তো, তুমি কত লোককে আঘাত দিয়ে ফিরচ! তুমি বড় বুদ্ধিমান, না? তাই তোমার ঐ আর এক ভাইএর জীবনটাকে অতিষ্ঠ করতে পেরেছ!

* * * *

আমাদের শাস্ত্রে বলে মিথ্যা অস্থায়ী, সত্য স্থায়ী। যে অত্যাচার বহন করচে মিথ্যা নিয়ে থাক্‌বার তার অবকাশ নাই। সে সৌভাগ্যবান। ওগো বড় মানুষ, জগতের সৌভাগ্যলক্ষ্মী তোমার করে বাঁধা রয়েছেন সত্য; কিন্তু তোমার মন হয়েছে কাণীর পাত্র। তোমার বাইরের চাকচিক্য মনে গিয়ে পৌছচ্ছে না! কিন্তু যাকে ধরাশায়ী করেছ, চেয়ে দেখ, চোখের জলে তার মনটা কেমন ধুয়ে গেছে, নির্ম্মল হয়ে গেছে! তুমি আজ যা নিয়ে আছ তাই নিয়ে ত চিরদিন থাক্‌তে পারবে না, তোমাকেও আবার মনখানা ধুয়ে ফেল্‌তে হবে। তোমারও সে সৌভাগ্য আসছে।

* * * *

বেচারা, মাটি কেটে কেটে হায়রাণ হয়েছ, তোমার মাথার ঘাম পায়ে পড়েছে। মনিব মহাশয় তোমার রক্ত দিয়ে আস্‌বাব কিনেছেন। সুমিষ্ট সরবতে তার ভিতর শীতল, পাথার বাতাসে তার অঙ্গ শীতল। সে বড় বুদ্ধিমান তা দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু আরো বড় বুদ্ধি আজ তোমার দুয়ারে উপস্থিত। মনিবের ইমারৎ বুঝি আর টেঁকে না।

* * * *

ভ্রূকুটি করে যা পাওয়া যায় তার দাম বেশী নয়। প্রেম দিয়ে যা পাওয়া যায় তার দাম কেউ দিতে পারে না, তাই তা বিক্রয় হয় না। ঘর ছেড়ে পালিয়েছি, নাও-না তুমি আমার ঘর, তোমাকে ওটা ছেড়ে দিলুম। কিন্তু আমার ঐ ক্ষুদ্র কুটীরখানা কেড়ে নিতে, যে ঘর তোমাকে

ছেড়ে আসতে হল তোমার লোভের চোখ তার দিকে অন্ধ হয়ে গেছে। তোমার সেই ঘরখানা পেয়েছি আমি। কুটীরখানা হ'ল তোমার, বিশ্ব হল আমার।

* * * *

রুদ্র আজ রৌদ্র বৃষ্টি করছেন; কাল এই রৌদ্রই শান্তিজল এনে দেবে। রৌদ্র যেমন বৃষ্টির আগে, দুঃখ তেমনি সুখের আগে। যখন দুঃখই দেখা গেল, আর কিছু দেখা গেল না তখন বুঝলাম, আমার দৃষ্টিটা অত্যন্ত খাটো।

* * * *

ওগো পথিক, তুমি যাচ্ছ কোথা? কাজ কি তোমার সারা হল? তুমি কি ঘরের দিকে চলেছ? আমিও চাই তোমার সঙ্গে যেতে, কিন্তু তুমি ত আমায় সঙ্গে নেবে না, আমার কাজ সারা হয় নি। তুমি ধরে ছিলে কোদাল, আমি ধরেছিলাম কলম। দিনশেষে তুমি কোদাল ফেলে দিয়ে ঘরের দিকে ছুটে চলেছ, আমার আবার প্রদীপ জ্বলল। শত মিথ্যা দিয়ে জাল বুনেছি তাকে পুড়িয়ে দিয়ে তোমার ঐ দিন-শেষের কাজ-শেষের প্রসাদটুকু জগতে ছড়িয়ে দেবে, আপন আলোর সঙ্গে সঙ্গে, এমন একটা প্রদীপ আমাকে কে দেবে!

দর্শক।

মহাপুরুষ

(গল্প)

(শৈশবে-বাল্যে)

১

সিতপ্রৌঢ়েশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম-মুহূর্ত্ত বড় শুভচিহ্নযুক্ত। জ্যোতিষী কোষ্ঠী গণনা করিয়া বলিয়াছিল পুত্র ভাগ্যবান, ভবিষ্যতে কীর্ত্তি রাখিবে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাক-চরিত্র, হনুমান-চরিত্র, স্পন্দন-চরিত্র, পুরাণ, বেদ, সংহিতা, স্মৃতি, ব্যাকরণ, রামায়ণ, মহাভারত সব তোলপাড় করিয়া যখন ভাগ্যবান পুত্রের একটা যোগ্য নাম খুঁজিয়া পাইলেন না—তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সার্ব্বভৌমতন্ত্রের মতে নাম রাখিলেন সিতপ্রৌঢ়েশ। সকলে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—অর্থ কি?

চট্টোপাধ্যায় প্রশান্তমুখে সদ্ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন 'সিত অর্থাৎ শ্বেত—শুভ্র অর্থাৎ নির্ম্মল। প্রৌঢ়-অর্থাৎ বালকত্ব যুবকত্ব-হীন-অর্থাৎ জ্ঞানী। সিতপ্রৌঢ়েশ অর্থাৎ নির্ম্মল-জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ। সকলে ভূয়সী প্রশংসা করিল।

২

সিতপ্রৌঢ়েশকে আমরা সংক্ষেপে সিতেশ বলিব। সিতেশ দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে পিতার আদর যত্নে লালিত সিতেশ কৈশোরে উপনীত হইল। কৈশোরে তাহার দিনগুলি কতক পুস্তক অধ্যয়নে কতক পাড়ার ছেলেদের সহিত খেলায় কতক আমবাগানে কতক পুকুর-ধারে বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিতে লাগিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও কিশোর পুত্রের হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখিয়া এবং জ্যোতিষীর গণনার কথা স্মরণ করিয়া একরকম দিনগুলি মন্দ কাটাইতেছিলেন না। তবে পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে আরম্ভ হইল। ভস্মাবৃত অনলের মত সিতেশ তাহার তেজঃপুঞ্জ লইয়া পঞ্চদশ বৎসর বয়সে উপনীত। তখনও সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। চট্টোপাধ্যায় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া একদিন পুনরায় জ্যোতিষীকে ডাকাইয়া পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন এমনসময় ক্রীড়ারত সিতেশ খেলা ছাড়িয়া পিতার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

"বাবা—চোর কাকে বলে?

তত্ত্বসন্ধিৎসু পুত্রের কথায় পিতার চমক ভাঙ্গিল। "চোর! চোর, বাবা, ঐ যারা চুরি করে, যারা রাত্তিরে লোকের বাড়ীতে সিঁদ দেয়, রাত্তিরে যারা লোকের জিনিষ-পত্র নিয়ে যায়।"

পুত্র বুঝিল রাত্রিতে পরের দ্রব্য লইলেই চোর হয়, দিনে কেহ চোর হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে সে দত্তদের কলমের গাছ হইতে ভাল ভাল আম কতকগুলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন সেইজন্ত। আহ্লাদে ছুটিয়া সিতেশ একখানা ছুরি ও গামছা লইয়া দেবশিশুর মত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

চট্টোপাধ্যায়ের জ্ঞান হইল। ভাবিলেন, 'মহাপুরুষ শাপভ্রষ্ট হইয়া আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

(কৈশোরে)

১

সিতেশ কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিল। বিদ্যালয়ের সর্ব্বনিম্নশ্রেণী ভিন্ন তাহার অন্যত্র স্থান হইল না। পঞ্চদশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেবল পরের বাগানের আম চুরি (না) করিয়া খাইয়াছে তা আর কি হইবে! জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে অজ্ঞতা-নিবন্ধন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কেহই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিল না যাহাহউক শ্রাবণের পল্লীপথে গোকানের মত ধীরে ধীরে সিতেশ দশবৎসর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল। যথাসময়ে সুসংবাদ প্রকাশ হইল, সুদূর গ্রামে ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় তামাক টানিতে টানিতে সে সংবাদ শুনিয়া আত্মহারা হইলেন।

সিতেশের মামার বাড়ীর গায়ে বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী। একবার কার্য্যোপলক্ষ্যে তাহার মাতুল সপরিবারে বিদেশ-যাত্রা করিলেন—সিতেশ থাকে কোথায়? অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বাড়ুয্যেমশায়ের বাড়ী সিতেশের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বাঁড়ুয্যেমহাশয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তাহা তা আর কি? সিতু আমার ছেলের মত, কোন ভাবনা নেই আপনার যদ্দিন ইচ্ছে সিতু আমার এখানে থাক।"

সিতেশ এখন বেশই থাকে—আহারাদি পূর্ব্বাপেক্ষা ভালই হয়। ছয়মাস অতীত হইয়া গেলে সিতেশ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবকাশ—সিতেশ নড়িবার নামটি করিল না। একদিন বাঁড়ুয্যেমহাশয় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"সিতেশ, তোমার বাবা বোধ হয় চিন্তিত হবেন—ছুটীতে বাড়ী গেলে হত না? তা অবশ্য তুমি যা ভাল বোঝ কর।"

সিতেশ কিন্তু অচল—তাহার নড়িবার শক্তি রহিত। সে তাহার প্রাণ-মন সব সেই বাড়ীর চারখানি দেওয়ালের ভিতর হারাইয়া বসিয়া আছে। কারণ—বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা নলিনী দ্বাদশবর্ষীয়া। মুখখানি বড় সুন্দর, হাতদুটি গোল-গোল। কালপাড় কাপড় পরিয়া সে যখন আসিয়া বলিত, "সিতুদা পান নিন্" তখন সিতেশ মাথামুণ্ড সব একটা প্রচণ্ড অশ্বডিম্বের মধ্যে হারাইয়া ফেলিত। শুধু মনে মনে বলিত ;—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

* * * *

সেদিন সন্ধ্যা। সিতেশের ঘরের সামনে বেলফুলের গাছে ছুটাফুল ফুটিয়াছে—আকাশে কিন্তু মেঘভরা—বেশ জোর হাওয়া বহিতেছে। সিতেশ ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া দেখিল নলিনী আসিতেছে। একবার সে ঊর্দ্ধে চাহিল—দেখিল আকাশ তাহারই চিন্তা-ঘনাবৃত মানসাম্বরের মত। নলিনী বলিল—"সিতুদা পান নিন।" সিতেশ হাত বাড়াইয়া পান লইল। নলিনী চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে ডাকিল "নলু—শোন।"

"কি বলছেন?"

"একটা কথা।"

সিতেশ—একবার চারিদিক দেখিল কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আজ সে আত্মহারা—হৃদয় তাহার উদ্বেলিত—পদ্মার কূলের মত ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ক্রমে সেই জল গর্ভে মিশাইয়া যাইতেছে। সে লজ্জা-ভয় সব একদিকে দ্বীপান্তরিত করিয়া আবেগাতিশয্যে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—"নলু! নলু—আমাকে বিয়ে করবে?"

নক্ষত্রগতিতে নলিনী ছুটিয়া পালাইল। সিতেশ সম্বিত পাইবার পূর্ব্বে দেখিল সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে কাহার একটা ছায়া অনতিদূরে চলিয়া গেল। ভাগ্য তাহার ভাল। সে নলিনীর ভ্রাতৃবধূ—সিতেশের ভবিষ্যতের সহায়।

২

বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় যেদিন শুনিলেন তাঁহার পুত্র তাঁহাকে না জানাইয়া সুতরাং অমতে বিবাহ করিয়াছে, সেদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল—'পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও। এই আমার বংশ-মুখোজ্জলকারী পুত্র? হা ধিক্? কোথায় ভগবান—এ কি? কি হইল?—কোন মুখে আমি সংসারে বাস করিব? এ দুঃখ কোথায় রাখি?—যাক্, সব যাক্—

আজ হইতে সে আমার ত্যাজ্যপুত্র। আজ হইতে সে মৃত। কুলাঙ্গার" ইত্যাদি।

জ্যোতির্বীর ডাক পড়িল।

"কি পণ্ডিত ম'শায় খুব গুণেছিলেন যাহোক! ছেলে কীর্ত্তি রাখলে বটে। সব ভণ্ডামি আপনাদের!"

বিপদ বিলক্ষণ দেখিয়া ভট্টাচার্য্য উপস্থিত বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিলেন ;—

"চাটুর্য্যে ধৈর্য্য হারিয়ো না। "বিপদি ধৈর্য্যং"। শাস্ত্রের বাক্য নিষ্ফল হয় না। শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ কর।"

চট্টোপাধ্যায় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। কিন্তু ইঞ্জিনের চাপমান যন্ত্রের মত—তাঁহার হুকার আওয়াজ বেশ প্রমাণ করিয়া দিল সে রাগ এখনও কাটিবার মত হয় নাই। ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন "ছাই হবে"।

• • • •

দিন ত বসিয়া থাকে না—চট্টোপাধ্যায় ক্রোধে আত্ম-হারাই হউন—সিতেশ নলিনীর নূতন প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই থাকুক দিন থাকে না। দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর চলিয়া গেল। সিতেশ পাঠ বন্ধ করিয়া বার্ড কোম্পানীর আপিসে ২৫৲ বেতনে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু বিধি বাম। এত সুখ তাহার সহিবে কেন? সেবার বসন্তের ভারী প্রকোপ, দেখিতে দেখিতে সাতদিনের মধ্যে প্রফুল্ল-ফুলদামের মত নলিনা কালের কঠোর হস্তে নিষ্পেষিত হইয়া গেল। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া এক সন্ধ্যায় নলিনী ইহলোক ত্যাগ করিল।

অনেক ভাবিয়া সিতেশ পিতাকে সংবাদ দিল। বৃদ্ধ সংবাদে আদৌ কষ্ট পাওয়া দূরে থাকুক—রাক্ষসীর কবল হইতে যে তাঁহার সুকুমার সিতেশ উদ্ধার পাইয়াছে ইহাতে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিল না। পরদিনই পুত্রকে পত্র লিখিলেন ;—

বাবাজীবনেষু—

বহুদিন তোমাকে না দেখিয়া বড় কষ্ট পাইতেছি। বৃদ্ধ বাপকে আর কষ্ট দিয়ো না। যাহা হইবার হইয়াছে তজ্জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? পত্রপাঠ বাটী চলিয়া আসিবে। ইতি— আশীর্ব্বাদকস্য

কবদেব চট্টোপাধ্যায়স্য।

সপ্তাহ-মধ্যে নগ্নপদে, রুক্ষকেশে, গৈরিক পরিধানে বাণপ্রস্থ হইতে ফেরত সিতেশ বাটী আসিয়া পিতার পদধূলি লইল।

(যৌবনে)

১

"বাবা, মলুম ত—আচ্ছা ধরুন মলুম, মলে কি হয়? ম'লে কোথায় যায়?"

সিতেশ যোগাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড কোষা-কুশি, পিতাকে প্রশ্ন করিল। পিতা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কি উত্তর দিবেন স্থির করিতেছেন।

আবার প্রশ্ন—"আচ্ছা—এই দেহটাই কি আমি? আমি কে? জগত কি? প্রাণ কি? মস্তিষ্ক কি মন? হৃৎপিণ্ড কি প্রাণী? বাবা বলুন ত?"

পিতা নীরব। পুত্র আপন মনে বকিয়া বকিয়া আবার ধ্যানমগ্ন হইল।

সিতেশের এরূপ অবস্থা হইয়াছে বাটী আসিবার মাস খানেক পরেই। সে এখন একাহারী ত্রিসন্ধ্যাকারী গৈরিকধারী—যোগী ত্যাগী ভক্ত—জ্ঞানমার্গের পথিক।

অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা করিতে হয়। পিতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিলেন ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বে সিতেশ একদিন সন্ধ্যায় পাম্প-সু পরিয়া ১ ১৫ চুল ছাঁটিয়া এসেন্স মাখিয়া আবার বিবাহ করিতে গেল।

পাত্রী নিকটবর্ত্তী গ্রামের। দেখিতে মন্দ নয় তবে একটু রোগা, রংটা অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় চারিচক্ষের যখন মিলন হইল তখন সিতেশ দেখিল একটা রাক্ষসীর সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে। ফুল্ল নলিনীর ভাসা-ভাসা চোখদুটি মনে পড়িয়া সিতেশের গণ্ড বহিয়া দুবিন্দু অশ্রু অলক্ষ্যে ঝরিয়া পড়িল।

২

সুতরাং ঔষধে রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সিতেশের নূতন বধূ গৃহে আসিয়াছে প্রায় ছয় মাস; কিন্তু সে তপ-জপ-আরাধনা ভয়ানক বাড়াইয়া দিয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যখন সমস্ত পল্লী সুষুপ্তির কোলে মগ্ন তখন সিতেশের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ আম্রকানন ভেদ করিয়া

সেই সুষুপ্তপল্লীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিত। প্রভাতে সিতেশ স্নান করিতে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে যাইয়া—ওঁ শন্ন আপোধন্বন শমনঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ ইত্যাদি যাবতীয় মন্ত্রাদি আবৃত্তি করিয়া সুদীর্ঘকাল অবগাহনের পর গৃহে ফিরিত। গৃহে আসিয়া সন্ধ্যায় বসিত। বেলা যখন দ্বিপ্রহর তখনও সিতেশ চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছে। মধ্যাহ্নে সিতেশ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিত—সন্ধ্যায় আবার উপাসনা। সন্ধ্যার পর সে একটু বিশ্রাম করিত। তখন পাছে এই নশ্বর জগতের দিকে তাহার মন আকৃষ্ট হয়, এই ভয়ে—সে পিতার সহিত অথবা অন্য কাহারও সহিত দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলির আলোচনা করিয়া কাটাইত।

পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াও যখন পুত্রের আধ্যাত্মিক উন্নতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন উষার দিগন্তে সূর্য্যালোকের মত পিতার মনে জ্যোতিষীর কথা মনে পড়িল। "এ ত মহাপুরুষেরই লক্ষণ! যতই হো'ক জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা হয় না!"

গ্রামের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। চাটুয্যে ম'শায়ের ছেলে বাস্তবিকই একটা জ্ঞানী ধার্ম্মিক লোক। একটা ধার্ম্মিক লোক একথা সকলেই স্বীকার করিয়া লইল।

ক্রমে ক্রমে জ্ঞানপথে যখন সিতেশ বেশ অগ্রসর হইয়াছে তখন তাহার প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া সকলেই একবাক্যে মানিয়া লইল 'এ শাপভ্রষ্ট দেবতা।'

গ্রামে দত্তদের বাড়ীর ছেলেরা সেদিন বন্দুক লইয়া শীকার করিতে বাহির হইয়াছে, আজ এই নবীন বুদ্ধের সে দৃশ্য অসহ্য বোধ হইল। গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"তোমরা প্রাণীহত্যা করিও না উহাতে পাপ হইবে। তোমরা ছার ঐহিক সুখের জন্য এ ভীষণ পাপ করিয়ো না।"

তাহারা লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া গেল। মুখুয্যেদের পুকুরে মাছ ধরানো হইতেছে। শিশুহারা মাতার মত সিতেশ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

"রক্ষা কর—রক্ষা কর কি কর তোমরা। এত পাপ সহিবে না। বৃথা প্রাণী হিংসা করিয়ো না।"

মুখুয্যেদের বাড়ী সেদিন কুটুম্ব আসাতে এই মহাপুরুষের বাক্য তাহারা লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইল। সিতেশ যখন দেখিল তাহারই চোখের সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রুই কাতলা মাছগুলাকে ধরা হ[illegible]চ্ছে তখন সে হতাশ হইয়া বলিল—

"চক্ষু অন্ধ হও—ভগবান তোমাদিগকে ক্ষমা করুন।" কেহ দুইটা মাথার কাঁটা যোগাইয়া দিলে একটা বিল্বমঙ্গলের ব্যাপার হইয়া যাইত কিনা কে জানে?

(পরিণত বয়সে)

১

প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের নির্ম্মল সৌরভের মত সিতেশের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিল।

এখন শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন তর্কযুক্তির জন্য দশক্রোশ হাঁটিয়া লোক সিতেশের কাছে আসিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের ত কথাই নাই সে ত সেখানকার সমাজের সম্রাট। কোষ্ঠী গণনা—ভবিষ্যৎ-নির্ণয় লোকের মুখ দেখিয়া তাহার অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ জীবনের আমূল বিবরণ এ সমস্ত এখন সিতেশের বিশেষত্ব হইয়া উঠিল। ই[illegible] ছাড়া বিবাহ শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাপার উপলক্ষ্যে সিতেশ সর্ব্বত্রই সভাপণ্ডিত।

জ্যোতিষী মহাশয় নিজহস্তে সর্প খনন করিয়া বাহির করিয়া এখন অনুশোচনায় কাল কাটাইতেছেন।

• • • •

গ্রামের মধ্যে কৈবর্ত্তদের অবস্থা বেশ ভাল। বৃদ্ধ ভোলানাথ দাসের অতিবৃদ্ধা মাতা সেবার বাটীতে কথকতা দিবার জন্য পুত্রকে ধরিয়া বসিল।

"বাবা! আমার এই শেষ ক'টা দিন গঙ্গামুখো পা। তা দে বাবা দু'টো ইষ্ট দেবতার কথা শুনতে।"

ভোলানাথ বলিল—

"তা মা—কথক ঠাকুর আমাদের এখানে কৈ?"

"ওমা? ওকি কথা! অমন চাটুয্যে ঠাকুরের ছেলে রয়েছেন। যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ!"

ভোলানাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া সানুনয়ে নিজ প্রস্তাব যথাসময়ে সিতেশের কর্ণগোচর করিল। গম্ভীর অথচ ধীরস্বরে সে বলিল "ভোলানাথ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক—দেশে বড় ধর্ম্মাভাব। কখনও ধর্ম্ম হারিয়ো না।"

দিন স্থির হইয়া গেল। যথাসময়ে সিতেশ ফুলের মালা গলায় দিয়া মাথায় ফুলের মুকুট পরিয়া বেদীতে বসিয়া সুললিতকণ্ঠে সুন্দর মহাভারতীয় নল-উপাখ্যানের অতিশয় ভাবপূর্ণ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিল।

গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলে আসিয়া সে কাহিনী শুনিয়া মুগ্ধ হইল।

ভোলানাথের বৃহৎ প্রাঙ্গন তাহাতেই লোকের বসিবার স্থানাভাব। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। সিতেশের কথকতায় সকলেই ভক্তিভরে মস্তক নত করিল, মনে মনে বলিল "ধন্য, ঠাকুর যেন সাক্ষাৎ দেবতা।" সিতেশ যখন সুর উঠাইয়া নামাইয়া হাত নাড়িয়া নানাভাবে ও ভঙ্গিমায় তাহার কলাকৌশল প্রদর্শন করিত তখন বাস্তবিকই সকলে মুগ্ধ হইয়া থাকিত। ঘোর অরণ্য-মধ্যে নল-কর্তৃক পরিত্যক্তা দময়ন্তীর কথায় চোখের জল ফেলে নাই এমন একজনও ছিল না। সকলে তাহার কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। একমাস পরে যখন কথকতা সমাপ্ত হইল তখন দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সিতেশ নিজের প্রশংসায় মস্তক নত করিয়া সকলকে উপদেশ দিল—"ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়ো না—ধর্ম্মাভাবে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে—তোমরা কেহ কখনও এই সুমতি ত্যাগ করিয়ো না, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করিবেন।"

সকলে তাহার পদধূলি লইয়া জীবন সার্থক করিয়া চলিয়া গেল।

২

ভোলানাথ একদিন গলবস্ত্র হইয়া আসিয়া সিতেশের কাছে বলিল—

"বাবা ঠাকুর যদি এত অনুগ্রহই করলেন ত আর একবার আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দিলে আমার জন্ম সার্থক হয়।"

"সে কি কথা ভোলানাথ—যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু লোকের কাছেই ত আমার যাওয়া আবশ্যক—কি চাও তুমি বল?"

ভোলানাথ কাতর হইয়া বলিল "আজ্ঞে বাবা ঠাকুর আমার মা একবার আপনার শ্রীচরণে কি নিবেদন করবেন, আপনি যদি দয়া করে দাসের বাড়ী—"

"ভাল ভোলানাথ—কালই যাব।"

যথাসময়ে ভোলানাথের মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সিতেশ সকল জ্ঞাত হইল। ভোলানাথের মা সিতেশ যে একমাস কথকতা করিয়াছে তাহারই দক্ষিণা-স্বরূপ পঁচিশটি টাকা তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল। সর্প দর্শনে চমকিতপ্রায় সিতেশ দশহাত পিছাইয়া আসিয়া বলিল;—"ও কি কর ভোলানাথের মা—আমি কি অর্থ গ্রহণ করবো?"

"আজ্ঞে বাবাঠাকুর—"

"না—না—তোমরা অতিশয় অল্পদর্শী। অর্থ গ্রহণ করিয়া আমি নরকস্থ হইতে চাহি না" ভোলানাথের মা কাঁদিয়া উঠিয়া তাহার হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা করুন আবেদন জ্ঞাপন করিল। সিতেশ বলিল, দেখ ঐ যে অর্থ আমাকে দিতেছিলে উহা কাজে লাগাও, যাহাতে দেশের উপকার হয়, দেশের লোকের ধর্ম্মে মতি হয় তারই উপায় কর—তোমার ত অর্থের অভাব নেই ভোলানাথের মা।'

"সে কি করে পারবো বাবাঠাকুর?"

সিতেশ বলিল,—"আমার উপদেশ গ্রহণ কর সকল কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করবে—দেশে মন্দিরের অভাব একটা শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পরকালের কার্য্য কর।" সিতেশের কথায় ভোলানাথের মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইল—জিজ্ঞাসা করিল;—

"তাতে পঁচিশ টাকায় হবে ত?"

সিতেশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"দেখ তোমরা অতিশয় ধর্ম্মহীন তোমরা এই সামান্য অর্থে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে চাও?"

"কত টাকা লাগবে বাবাঠাকুর?"

"মন্দির-প্রতিষ্ঠায় সহস্র টাকা ব্যয়।"

ভোলানাথের মা প্রণাম করিয়া জানাইল যে, তাহার পক্ষে উহা একেবারে অসম্ভব। সিতেশ ক্রোধে সেখানে আর ক্ষণকালও দাঁড়াইতে পারিল না; শুধু বলিয়া গেল "অর্থের সদ্ব্যয় না করিলে মহাপাপ।"

ভোলানাথ যখন মাতার নিকট এ সংবাদ শুনিল তখন সে কিছুতেই ধারণা করিতে পারিল না যে কখনও তাহার দ্বারা ঐ কর্ম্ম সম্ভব হইলেও হইতে পারে। তাহার মা কিন্তু ব্রাহ্মণের যাত্রাকালীন রোষকষায়িত লোচনযুগল

মনে করিয়া ব্রহ্মশাপের ভয়ে সাতিশয় ভীতা হইয়া বলিল—

"বাবা! শেষে বামুনের কথা অমান্য করে চোদ্দপুরুষ নরকে যাব।"

ভোলানাথ বলিল ;—

"কি করব মা বল? দুগোলা ধান আর দুটো হালের গরু ত সম্বল—আর নগত দশ পঞ্চাশ কতই আছে; কুড়িয়ে বাড়িয়ে যদি ১৫০৲ শ দেড়েক হয় ত ঢের।"

"তাইত বাবা—বামুনের আজ্ঞে অমান্য করা কপালে ছিল শেষে।"

ভোলানাথের মা যখন কিছুতেই শুনিল না আর ভোলানাথও বারংবার ভাবিয়া দেখিল যে যদিও গরু ও ধান বেচিতে হয় বটে তবু যদি গ্রামে একটা শিবস্থাপনা তাহার দ্বারা হয় তাহা হইলে সে-টাকার ক্ষোভ বেশীদিন থাকিবে না। অবশেষে তাহাই স্থির করিয়া মাকে বলিল। "মা, দেবতা-ব্রাহ্মণের কথা অমান্য করবো না; যা থাকে হবে। না-হয় এ বছর দেনা করবো"।

মা ছেলেকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

ভোলানাথ তাহার হালের গরু দুইটা বিক্রী করিয়া একশ দশ, দুই গোলা ধানে চারিশ' আর নগদে মিলাইয়া যখন সাড়ে সাতশ টাকার বেশী সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন অগত্যা স্ত্রীর গায়ের যে একখানা মাত্র সোনার গহনা ছিল আর মায়ের পুরাণো রূপার গহনা বিক্রী করিয়া মোট ৯০০৲ টাকা লইয়া একদিন সিতেশের কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল ;—

"বাবাঠাকুর—এই নিন এ দাসের আর ক্ষমতা নেই বাবা ঠাকুর! এতেই আপনি যা হয় কৃপা করে একবার বাবার স্থাপনাটা করে দেবেন।"

সিতেশ অনিচ্ছাসত্বে টাকাগুলা উঠাইয়া লইয়া বলিল,—"সাধু ভোলানাথ সাধু—তুমিই যথার্থ ধর্ম্ম-পিপাসু—তোমার মঙ্গল হোক।"

ভোলানাথ অদূর ভবিষ্যতে তাহার পুকুরপাড়ে উন্নত-চূড় শিবালয়ের মূর্ত্তি মনোমধ্যে কল্পনা করিয়া হালের গরু গোলার ধান ও স্ত্রীর গহনা বিক্রয়ের কথা সব ভুলিয়া গেল।

টাকাগুলা সিতেশের হাতে উঠাইয়া দিয়া বাটী গিয়া ভোলানাথ একবার ভাবিল টাকাই যখন খরচা হল তখন নিজে দেখে-শুনে করলে বেশ ভাল হত। আবার ভাবিল ;—

"না চাটুয্যে ঠাকুরের ছেলে লোক ভাল।"

(অবশেষে)

১

সেই কোন অতীত যুগে কঠোর—তপস্যায় শঙ্কিত ইন্দ্র শাতকর্ণ মুনির জন্য পঞ্চাপ্সরার যৌবনরূপ পাশ সৃজন করিয়াছিলেন আর আজ এই কলির শাতকর্ণ সিতেশের কঠোর তপস্যা বুঝি তাঁহাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই ভোলানাথ কৈবর্ত্ত সহস্র রজতমুদ্রার কঠিনতর পাশ আনিয়া সিতেশের সমস্ত জীবনের তীব্র তপস্যা পণ্ড করিয়া দিতে বসিল।

ভোলানাথ-প্রদত্ত নয়শত টাকা যখন সিতেশের বাক্সের মধ্যে বেশ নিরাপদে প্রবেশ করিল, ততক্ষণ পর্য্যন্তও সিতেশের মস্তিষ্ক বেশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু বাক্সের চাবিটা ট্যাকে গুজিয়া সিতেশ পরদিন যখন স্নান করিতে গেল তখন সেই নির্জ্জন পুকুরপাড়ে তাহার মনে কতকগুলা অসম্ভাব্য কথা কোথা হইতে অনাহুত হইয়া ধীরে ধীরে বেশ উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

স্মৃতিটা বড় বালাই। বার্ড কোম্পানীর আফিসে পঁচিশ টাকার জন্য সকালবেলা দুটা নাকে-মুখে গুঁজিয়া বেলা ৫।৬টা পর্য্যন্ত দিস্তা দিস্তা কাগজ লেখা; স্বামীর অর্থাভাবে নলিনীর সেই ক্লিষ্ট মুখখানা, ভ্রাতার পাঠের জন্য অর্থের অভাবে পিতার মনোকষ্ট,নিজে উপার্জ্জনাক্ষম হেতু পিতার নিকট সময়ে-সময়ে দুএকটা কটু মন্তব্য—এই সমস্তগুলা হঠাৎ সেদিন স্নানের সময় সিতেশের ওঁ শন্ন আপ ইত্যাদির স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল।

নয় শত টাকা। সিতেশ আর একবার ভাবিয়া লইল ঠিক—নয়—শত। পাঁচশটাকার নোট—চারশ টাকা নগদ। সে ত নিজেই তাহা বাক্সে উঠাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ তাহার চাবিটার কথা মনে পড়িল—ট্যাকে হাত দিয়া দেখিল ঠিক আছে ত? থাক্ আছে! অনেকক্ষণ জলের ধারে দাঁড়াইয়া এই কথাগুলা কেমন ঘুরিয়া

ফিরিয়া বাঁকিয়া পাক দিয়া তাহার মনে একটা কি অস্পষ্ট ছবি আঁকিতে লাগিল।

"কার টাকা? কৈবর্ত্তর? ঢের টাকা আছে তার। না হয় নাই আছে। যদি—যদি, আচ্ছা ধর যদি আমি ভোলানাথের টাকাটা ফেরত না দিই। নালিস করিবে প্রমাণ কি? রসিদ দিই নাই। কি করিতে পারে সে? ছাই করিবে। কথাগুলা কোন মতে মনের মধ্যে সে সাজাইয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। আবার ভাবিল "সেটা কি ঠিক হবে? বেঠিকই বা কিসে? আজ ছ মাস বাড়ী বসে আছি ব'লে বাবা কি কম কটু-কাটব্যি করেছেন? আর কতদিন এরকম ভণ্ডামি করে চল্‌বে?—আমাদের সমাজ তেমন নয় ধর্ম্মচর্চ্চা এ-সমাজে চলে না। কে কার ধার ধারে? ও কৈবর্ত্তর টাকা আমি পেলে কিছু পাপ নেই—ব্যাটা অনেক জমিয়েছে—অনেক ফাঁকি দিয়েছে। এ সব ভগবানের দয়া; হাতে যখন পেয়েছি একবার, তখন আর ফিরে যেতে দিচ্চি না, আচ্ছা না-হয় একটু চেষ্টাই করা যাক্ না কেন।"

স্নান সমাপ্ত করিয়া সিতেশ যখন বাটী ফিরিল তখন তাহার মস্তিষ্ক বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে তাহাকে কি করিতে হইবে সে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। আর ভাবনা কি? বাস্।"

দিন তিনেকের মধ্যে সিতেশ হঠাৎ একদিন কলিকাতায় চলিয়া গেল কেহ কোনও কারণ বুঝিতে পারিল না। মাসাধিক সেখানে কাটাইয়া বাটী ফিরিল বটে কিন্তু সে সিতেশ আর নাই। তপ জপ অনেক কমাইয়া দিয়াছে। কুলকুণ্ডলিনীর ষটচক্র-ভেদ-নির্ণয় ভুলিয়া গিয়াছে। এখন সে নেহাৎ রাম শ্যাম নবীন, হরিশের মত সাধারণ লোক চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না বটে তবে হঠাৎ পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে একটা বৈরাগ্যের ছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

আরও দিনপনরো পরে সিতেশ রীতিমত সপ্তাহে একবার করিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করিতে লাগিল। কে জানে কেন?

২

দেখিতে দেখিতে মাসের সংক্রান্তিগুলা যেন সপ্তাহে একবার করিয়া আসিয়া পাঁচ পাঁচটা মাস কোথায় চলিয়া গেল কিন্তু ভোলানাথ তাহার ঘরের দাওয়ায় শুইয়া পুকুর পাড়ে তাকাইয়া মন্দিরের একখানা ইটও দেখিতে পাইল না—ভোলানাথের মাও রোজ পূজার ফুল লইয়া ঘাট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

ধৈর্য্যের ভাণ্ডারে একটু হাত পড়ায় ভোলানাথের মা একদিন জিজ্ঞাসা করিল;—

"কই বাবা! মন্দিরের ত কোন যোগাড় দেখি না?"

ভোলানাথও বলিল, "তাই ত মা?—তা চাটুয্যে ঠাকুরের ছেলে লোক ভাল।"

মা মাথা নাড়িয়া বলিল—"হাঁ লোক ভাল তার আর সন্দেহ কি? তবে এত দেরী কচ্ছেন কেন বাবা?"

এক মকর-সংক্রান্তি ঘুরিয়া আবার যখন মকর সংক্রান্তি আসিল তখনও মন্দিরের চিহ্নমাত্র নাই—ভোলানাথ প্রথম অধৈর্য্য—তৎপরে সন্দিহান ও শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন সিতেশের কাছে গিয়া দাবী করিল;—

"কই ঠাকুরমশায়—মন্দির হল কি?" সিতেশ পূর্ব্বের মতই গম্ভীর হইয়া বলিল—

"ধৈর্য্য ধর দাসের পো"

ভোলানাথ জ্বলিয়া উঠিল।

"কত ধৈর্য্য ধরবো ঠাকুর—তুমি ত কেবল ধৈর্য্য ধৈর্য্য কর—গরু বেচে—ধান বেচে আজ একবছর পেটে খাইনে—ছেলেগুলো না খেয়ে মরে—তবু মার ইচ্ছাটা পূর্ণ করবো এই আশা। আর তোমার কেবল ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর?"

সিতেশ এবার কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিল,—"সাবধান ভোলানাথ! কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো মনে রেখো।"

গলা নামাইয়া ভোলানাথ বলিল অপরাধ হয়েছে বাবাঠাকুর পায়ে ধরছি ক্ষমা করুন—কবে হবে বাবাঠাকুর?

সিতেশ বলিল "সে আমি এখন ঠিক বলতে পাচ্ছি নে—তবে এখনও দেরী আছে।"

ভোলানাথ নিরুত্তর হইয়া খানিকটা বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল। বাটী গিয়া নিজের পাড়ার মোড়লের নিকট সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া কি করিবে পরামর্শ চাহিল।

মোড়ল শুনিয়া শিহরিয়া কহিল, "করেছো কি? টাকা তোমার আদায় হবে আর? যাও এখুনি থানায় যাও।"

ভোলানাথ চমকিয়া বলিল, "এঁ্যা থানায়? না তা পারবো না।"

মোড়ল বলিল,—"না পারবে নেই। আমার কাছে কেন এসেছ?—অত টাকা হয়ে থাকে সে আলাদা কথা।"

ভোলানাথ সাত-পাঁচ ভাবিয়া মাতাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে থানায় উপস্থিত হইয়া সিতেশের নামে নালিশ রুজু করিয়া আসিল। দারোগাকে বলিল, "রক্ষে কর হুজুর, বামুন আমার সর্ব্বনাশ করেছে।" দারোগা বলিল, "এতে আমি কি করবো রে। এ যে দেওয়ানী।" ভোলানাথ দারোগাকে সন্তুষ্ট করিয়া বুঝাইয়া আসিল যে এখনও চাটুয্যের বাড়ীটা খানাতল্লাসী করিলে টাকাটা সব না-হোক কতক ফেরত পাওয়া যাইতে পারে। আজ একটা বৎসর সে যে কষ্ট করিয়াছে তাহা ভাবিয়া সে সিতেশের উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছে।

* * * * *

এদিকে সিতেশ প্রতিবার কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়া পিতার পায়ের কাছে কোনোবার ১০৲ কোনোবার ১২৲ কোনোবার ১৫৲ টাকা রাখিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। জ্ঞানমার্গের পথিক বংশকুলতিলক সিতেশের এই অভিনব আচরণ চট্টোপাধ্যায়কে বিহ্বল করিয়া তুলিল। আনন্দের তাঁহার আর সীমা রহিল না। পুত্রের এতাদৃশ ব্যবহারে চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিষী ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণীঅক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইতেছে দেখিয়া মনে করিলেন, "ধন্য আমি—ধন্য পুত্র মম—ধন্য তুমি দৈবজ্ঞ ঠাকুর।"

ইহার দিনকয়েক পরের কথা। সিতেশ সেদিন কলিকাতায়। চট্টোপাধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সেই পূর্ব্বেকার মত ধূমপান করিতেছেন, পাশে সেই জ্যোতিষীঠাকুর। সিতেশের সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় আজ তিনি সদর্পে চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহার অদ্ভুত ভবিষ্যৎ-দর্শন-ক্ষমতা-সম্বন্ধে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "কি গো চাটুয্যে—কেমন বলেছিলুম না? সিতেশের সম্বন্ধে কথাগুলো ঠিক ফলছে কি না?"

চট্টোপাধ্যায় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অধীর হইয়া বলিলেন—

"হ্যাঁ ভাই যথার্থ গণনা করেছিলে। আমার বংশে ছেলেটা দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ।"

দৈবজ্ঞ একটু মৃদু হাসিয়া কথাটার আর একদিক পাড়িয়া ফেলিলেন।

"কৈ—দক্ষিণা কৈ আমার?"

চট্টোপাধ্যায়ের তখন মেজাজ সরিফ। "নিশ্চয় ঠাকুর—পাবে তুমি।"

সিতেশের সম্বন্ধে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করায় জ্যোতিষী ঠাকুরের উদ্দেশ্য যথেষ্টই সফল হইয়াছিল। একটা ধানের গোলা ও একটা চণ্ডীমণ্ডপ ইহা ত চট্টোপাধ্যায়ের খরচেই হইয়াছিল, তাহা ছাড়া সিতেশের দ্বিতীয়বার বিবাহের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত টাকাটা, সিকাটা, মাছটা, দুধটা, দৈবজ্ঞঠাকুর চট্টোপাধ্যায়ের বাটী হইতে একটা মাসিক পাওনা বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। তাহার উপর সিতেশ আবার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে নগদ টাকা দিতে আরম্ভ করাতে দৈবজ্ঞ ত নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতায় নিজেই স্তম্ভিত হইয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে চট্টোপাধ্যায়কে ভগবান তাঁহার জন্য কামধেনু করিয়া পাঠাইয়াছেন।

সেদিন হঠাৎ দক্ষিণার কথা উঠিতেই চাটুয্যে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সিতেশের বাটী আসিবার দিন নিকট দেখিয়া আবার কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সম্ভাবনায় চট্টোপাধ্যায় দৈবজ্ঞের কথামাত্রেই একেবারেই বাটীর ভিতর হইতে একখানি দশটাকার নোট আনিয়া হাজির।

জ্যোতিষীঠাকুর যথারীতি নোটখানি ট্যাঁকে করিয়া চট্টোপাধ্যায়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সিতেশের ভবিষ্যতে যে আরও বহুতর উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে সে-সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া বাটী-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(তিরোভাব)

সেবার কি অশুভ মুহূর্তেই সিতেশ বাটী আসিল। বাটী আসিয়া দু-চার জনের কাছে শুনিল যে ভোলানাথের নিকট সে যে টাকা লইয়াছে সে-কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ নাকি থানায় গিয়া নালিশ পর্য্যন্ত করিয়াছে। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া সিতেশ দেখিল আর বাটীতে থাকা নিরাপদ নহে। তখনও চটোপাধ্যায় শোনেন নাই—এই ভাগ্য। অন্তবারের মত বাটী আসিয়া সিতেশ বেশীদিন আর অপেক্ষা করিল না। যেদিন ঐ কথা তাহার কর্ণগোচর হইল তাহার পরদিন প্রত্যূষেই সে পিতার উদ্দেশ্যে একপত্র লিখিয়া রাখিয়া কলিকাতায় রওনা হইল। পত্রে লেখা ছিল :—

শ্রীচরণেষু,—

আর আমি সংসারে বদ্ধ থাকিব না। মায়া-পাশে-বদ্ধ হইয়া আমার আত্মা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আপনি আমায় বিদায় দিন; আর সাক্ষাৎ হইবে কিনা জানি না। ইতি—

আপনার হতভাগ্য পুত্র "সিতেশ।"

* * * *

পরদিন সকালবেলা চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় সিতেশের পত্রখানা চটোপাধ্যায়ের হস্তগত হইল। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া তিনি সশব্দে 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া দারুণ বিলাপ করিতেছেন এমনসময় ভোলানাথ কৈবর্ত্ত দুইজন কনেষ্টবল ও একটা থানার জমাদার লইয়া চটোপাধ্যায়ের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া খুব গলাবাজি করিয়া বলিল, "এই বাড়ী জমাদার; কালকের ট্রেণে বাড়ী এসেছিল, বাটীর ভিতর আছে হয় ত।" হঠাৎ এই সব পুলিশ-পাহারা দেখিয়া চটোপাধ্যায় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ব্যাপার বুঝিবার আগেই জমাদার বলিল—

"হরদেব চাটুয্যের বাড়ী এই?"

ভয়জড়িতকণ্ঠে চাটুয্যে বলিলেন—"হ্যাঁ আমিই—"

"আপনিই হরদেব চাটুয্যে? বেশ আপনার গুণধর ছেলেটি কোথায়?"

আশ্চর্য্য হইয়া চাটুয্যে বলিলেন, "আমার—গুণধর—ছেলে? কেন? কি হয়েছে?"

জমাদার একটু তীব্রস্বরে বলিল—

"কোথায় সে জুয়াচুরী মকর্দ্দমার আসামী?"

মুমূর্ষু রোগীর মত চট্টোপাধ্যায়ের নাড়ী ক্রমশ ছাড়িয়া আসিতেছিল। অতি কষ্টে বলিলেন, "কি জুয়াচুরী!"

ভোলানাথ আর থাকিতে না পারিয়া বলিল,—"বাবাঠাকুর—হাল-গরু বেচে তোমার ছেলেকে নশো খানি টাকা দিয়েছিলুম—শিবের মন্দির করে দেবে বলে। আজ একবছর না-খেতে পেয়ে মরছি। বামুনের ছেলে, সন্ধ্যে-আহ্নিক আবার করে; ছিঃ ছিঃ' এই কাজ তার!

সিতেশ যে সম্প্রতি তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিতে পারিতেছিল কোথা হইতে, এতক্ষণে চট্টোপাধ্যায়ের মাথায় তাহা ঢুকিল। পুত্রের এতাদৃশ ব্যবহারে চট্টোপাধ্যায়ের আর বাক্‌শক্তি রহিল না। মহাপুরুষ-পুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে চটোপাধ্যায়ের চোখদুটা যেন মরার চোখের মত স্থির হইয়া গেল।

শ্রীমোহিতচন্দ্র মজুমদার।

—o—

বিশ্ব-বিলীন

আমার তরে বিশ্ব তাহার রূপটি নিয়ে আছে
এই ভেবে ত প্রাণটা কেমন করে!
তাইত আমি বাহির পানে কেবল ছুটে আসি
থাকতে নারি ছোট্ট আমার ঘরে।
চাঁদটি হোথা জেগেই থাকে সারাটি রাত ধরে।
শীতল সুধার পাত্রখানি নিয়ে,
বেরিয়ে এসে পাগল চিতে একচুমুকে আমি
বুকটা ভরে সবটা ফেলি পিয়ে।
ফুলের কোঁটা ছোট্ট আঁখি আমার পানে চেয়ে
আবেগভরে কতই হাসি হাসে,
আমার মুখের একটি চুমোয় অধীর পাগল হয়ে
তালে তালে হরষ নিয়ে ভাসে।
বিশ্বজোড়া আকুল হাওয়া করছে আনাগোনা
আমায় নিয়ে বাইরে আসে ছুটে,
তাইত আমি কেবল আমায় বিলিয়ে দিয়ে দিয়ে
উছল আলোর হাওয়ায় ধরি লুটে।
বিশ্ব আমায় কেবল ডাকে,—"আয়রে ওরে আয়,
তোর তরে যে প্রাণটা আমার কাঁদে।"
চপল আমি আমায় নিয়ে বিষম গোলে পড়ি,
বেরিয়ে পড়ি উপচে বুকের বাঁধে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা

দেশের দুরবস্থা দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়? ঐ যে নদী বা পুষ্করিণীর ঘাট কোনরকমে আজ জীর্ণ অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে, কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে কত আনন্দ-কোলাহলই না হইত? ছোট ছোট মেয়েরা আর বালিকাব্রতের ছড়া গাহিবার জন্য আসিয়া ঘাট আলো করে না। সোনার ক্ষেতে ধান আর তেমন ফলে না। বাগানে আর মধুর ফল-ফুল হয় না। মেছুনীরা আর ডালা-ভরিয়া বাড়ী বাড়ী মাছ দিয়া যায় না। গোয়ালে গরু নাই, গোলায় ধান নাই, পেটে অন্ন নাই, মুখে হাসি নাই। পূর্ব্বে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে দাদা কাকা মাসী পিসি প্রভৃতি সম্পর্ক পাতানো থাকিত, সুখে দুঃখে সকলে একাত্ম থাকিত, রাত্রি দ্বিপ্রহরে ডাকিলেও লোক পাওয়া যাইত। বারোমাসে আর তেরোপার্ব্বণ নাই, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কুটীরে রামায়ণ মহাভারত শুনিতে মেয়েপুরুষের গমনাগমন নাই, গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপ ভগ্নপ্রায়। হরি-সঙ্কীর্ত্তন, যাত্রাগান, পাঁচালী আজকাল একরকম বন্ধ। ফকিরের গানে, বৈরাগীর তানে আর সে মাধুর্য্য নাই।

দেশের শিক্ষার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। গত ১৯১১ সালের আদমসুমারির বিবরণ হইতে জানা যায় যে বাংলা দেশে একহাজারে মাত্র ৭৭জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে। পাশ্চাত্য অনেক দেশে পাঁচবৎসর বয়সের শিশুর সংখ্যা বাদ দিলে প্রত্যেক পুরুষ ও মেয়ে লিখিতে পড়িতে পারে। ৫০ বৎসরের মধ্যে জাপানীরাও এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশে একহাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ১১ জন, মাদ্রাজ ও মহীশূরে ১৩, বোম্বায়ে ১৪, বরোদায় ২১, ত্রিবাঙ্কুড়ে ৫0, ব্রহ্মদেশ ও কোচিনে ৬১ জন স্ত্রীলোক লিখিতে-পড়িতে পারে। স্ত্রীশিক্ষায় আমাদের বঙ্গভূমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পশ্চাৎবর্ত্তী। নারীর মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তাহাদের নিকটেই শিশু মানুষ হয়। বাংলাদেশে প্রত্যেক হাজারে সাঁওতাল ৪, বাউরী ১0, মুচি ১২, হাড়ি ১৪, বাগদী ১৯, মালো ২৮, জেলিয়া কৈবর্ত্ত ৪৪, নমশূদ্র ৪৯, রাজবংশী ৫১, ধোবা ৫৫, গোয়ালা ৭৭, সূত্রধর ৮৬ এবং চাষী কৈবর্ত্ত ১০৮ জন লিখিতে-পড়িতে সক্ষম। মুসলমানদের মধ্যে হাজারকরা ৪১ জন লিখিতে-পড়িতে পারে। শিক্ষার জন্য মুসলমান ভ্রাতৃগণের বদ্ধপরিকর হওয়া ভিন্ন গতি নাই। রাজকীয় বিবরণীতে শিক্ষার উন্নতির অনুপাতে বাংলা দেশের নানাজাতির নাম যথাক্রমে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে :—যথা, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক (বৈদ্য ও সুবর্ণবণিক জাতি ব্যতীত অপরাপর জাতির সংখ্যা লক্ষাধিক), ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি ও তেলি, বারুই, কামার, তাঁতী, গোপ, সদ্‌গোপ, যুগী, বৈরাগী, নাপিত, ময়, কৈবর্ত্ত (চাষী), সূত্রধর, জোলা, কৈবর্ত্ত, চামার, মালী, বাগদী, ডোম, মুচি, বাউরী ও সাঁওতাল। সমগ্র বাংলা-দেশের তাম্বুলিজাতির সংবাদ আদমসুমারীর বিবরণীতে দেওয়া হয় নাই।

কলিকাতায় কোন জাতি শিক্ষায় উন্নত।

(আমাদের প্রস্তুত শতকরা হিসাব)

(১) বৈদ্য—৬৯ (২) কায়স্থ—৬০ (৩) ব্রাহ্মণ—৫৭ (৪) তাঁতি, ৪৮ (৫) তাম্বুলি—৪৬'২৯ (৬) সুবর্ণবণিক—৪৫ ৭) গন্ধবণিক—৪৫ (৮) সুঁড়ি—৪৩ (৯) সদ্গোপ—৩৯ (১৩) সূত্রধর—২৭ (১৪) নাপিত—২২ (১৫) চাষী কৈবর্ত্ত—২২ (১৬) গোয়ালা—১৭।

কলিকাতায় কোন জাতির স্ত্রীলোক শিক্ষায় উন্নত

বৈদ্য ৪২, কায়স্থ ৩২, ব্রাহ্মণ ২৭, সুবর্ণবণিক ২১, সদ্গোপ ১৬'৪১৭, তাম্বুলি ১৬·১৭, সুঁড়ি ১৫, গন্ধবণিক ১৪, কাঁসারি ১৪, তাঁতি ১৩, সূত্রধর ১০, তিলি ৮, ময়রা ৭, চাষীকৈবর্ত্ত ৬, নাপিত ৫, গোয়ালা ৩।

কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষায় উন্নত জাতি

বৈদ্য ৪৮, কায়স্থ ৩৩, ব্রাহ্মণ ২৭, সুবর্ণবণিক ১৬, সদ্গোপ ১২, তাঁতি ১১, ময়রা ১১, গন্ধবণিক ১১, সূত্রধর ১১, সুঁড়ি ৯, তাম্বুলি ৮·৯, কাঁসারি ৭, নাপিত ৭, তিলি ৭, গোয়ালা ৬, চাষীকৈবর্ত্ত ৪।

কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষায় উন্নত স্ত্রীজাতি

বৈদ্য ৭, কায়স্থ ৪, ব্রাহ্মণ ৩, সুবর্ণবণিক ১, গন্ধবণিক ১, ময়রা ·১, তিলি ·৯, সুঁড়ি ·৯, তাম্বুলি ·৯, তাঁতি ·৮, সদ্গোপ ·৭, কাঁসারি ·৬, গোয়ালা ·৫, সূত্রধর, ·৩, চাষী-কৈবর্ত্ত ·৩, নাপিত ·২।

পাঠকপাঠিকাগণ আপনারা এক্ষণে নিজ নিজ জাতির অবস্থা তুলনা করুন এবং আমাদের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন। স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। উচ্চশিক্ষার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা অসম্ভব। কলিকাতার নরনারীর নিরক্ষরতার বিষয় চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বাংলার গৌরবস্থল কলিকাতার দশা যখন এমন শোচনীয়, তখন মফঃস্বলের অবস্থা যে কি ভয়ানক তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদের এই দুর্দ্দশা কবে দূর হইবে, কবে এই অজ্ঞানান্ধকার অন্তর্হিত হইবে, কেহ কি তাহা বলিতে পারেন?

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী

আজকাল শিক্ষার যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে ছেলেবেলা হইতে দ্রুতবেগে উদ্ধশ্বাসে কোনদিক না দেখিয়া বিদেশী-ভাষায় লিখিত পুস্তক মুখস্থ করিয়া কোনরকমে পরীক্ষা-সমুদ্র পার হইয়া চাকরীর সন্ধানে ছুটিতে হইতেছে। বি-এ, বা এম-এ উপাধিলাভ করিয়াও বুদ্ধি পুষ্ট বা বলিষ্ঠ হইতেছে না। ইংরাজী শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। ইংরাজী কাজের ভাষা, আমাদের ভাবের ভাষা নহে। ইংরাজীর সহিত বাংলাভাষার পদবিন্যাস, শব্দবিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে মিল নাই। শিশুপাঠ্য ইংরাজী পুস্তকে ভাববিন্যাস ও বিষয়প্রসঙ্গে তাহাদের ঘরের কথাই এত বেশী থাকে যে অপরিচিত বিষয়ের ভাবগ্রহণ করিতে শিশুরা এমন-কি উপাধিধারীরাও অনেকসময়ে অক্ষম হয়। ইংরাজী শিখিতে যাইয়া বালক না পাইল খেলিবার সময়, না পারিল জলে পড়িয়া সাঁতার শিখিতে, না পাইল প্রকৃতি-জননীর উপর দৌরাত্ম্য করিয়া শরীরের বলসঞ্চার ও মনের প্রফুল্লতালাভ করিতে। প্রকৃতির বিচিত্র গন্ধ গীতি রীতি রূপ বর্ণ গতি শক্তি বাঙালী বালকের নিকট রুদ্ধ। কল্পনা ও চিন্তাশক্তির অনাবিল স্বচ্ছপ্রবাহ তাহার মন-নদীর মধ্যে প্রবাহিত হয় না। বড় হইলে এই বালক বুদ্ধি খাটাইয়া কোনো নূতন কাজ করিতে পারে না, কেবল গতানুগতিকের বশবর্ত্তী হইয়া চাকরীর জন্য ছুটিবে।

আমাদের সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের সহিত বিদেশী ভাষালব্ধশিক্ষার সামঞ্জস্য নাই। যে-সমাজের মধ্যে আমরা লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত তাহার উচ্চ আদর্শ আমাদের ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকে বিরল, আমাদের গৃহের উজ্জ্বল ও মহান্ ছবি তাহাতে স্থানলাভ করে না। আমাদের ভাই বোন পিতা মাতা আত্মীয়বন্ধুকে তাহার মধ্যে দেখিতে পাই না। আমাদের বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের বীর বা মহাপুরুষগণের চরিত্র ইংরাজী ইতিহাসে, সংবাদপত্রে ম্লানভাবে দেখিতে পাই, অতীতের গৌরব করিবার কিছু দেখিতে পাই না। যশোরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের পূত কাহিনী আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বারভূঁইয়ার বাঙালী রাজা কেদার রায় প্রচণ্ড রাজশক্তি ও পর্ত্তুগাজ দেশীয় জলদস্যুগণের বিরুদ্ধে যে সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, স্থল ও জলযুদ্ধে যেরূপ সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা আমরা শিখি না।

আমাদের এই প্রিয় কুশদহের অতীত গৌরবকাহিনী সম্বন্ধেই বা কি? জলেশ্বরের কাশীনাথ রায়ের কর্ম্মচারী মহাত্মা রাঘবচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ যে ইচ্ছাপুরের চৌধুরীবংশের আদিপুরুষ তাহা জানি না। অগণ্য সৈন্যসহ প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা প্রতাপাদিত্যকেও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে দ্বন্দ্ব করিতে আসিয়া তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া লজ্জিত ও নতশির হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। একসময়ে কুশদহের অধ্যাপকমণ্ডলীর বিদ্যার গৌরবে বাংলাদেশ যে গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাহাও আমরা জানি না। গোবরডাঙ্গায় জমিদারবংশের প্রাচীন ইতিহাস, স্বনামধন্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ক্ষেত্রমোহন দত্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনচরিত কুশদহবাসী সকলেরই জানা কর্ত্তব্য তাহা ভুলিলে চলিবে না। কুশদহের ইতিহাস, কুশদ্বীপ-কাহিনী প্রভৃতি পুস্তক আমাদের কুশদহের কোনো বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না। জন্মভূমি আমাদের নিকট অস্পষ্ট অথচ বিদেশ আমাদের স্মৃতিপথে সতত বিরাজ করিতেছে। হনলুলু, টিফিস, টিউনিস

প্রভৃতি স্থানের কথা আমরা ভূগোলে শিখি, কিন্তু আমাদের কুশদহে যে ২৩৮ খানা গ্রাম আছে, তাহার কথা খুব কমই জানি। নদী খাল বিল বাবোড়ের দ্বারা কুশদহ পরিশোভিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাধারণ উচ্চতা প্রায় ৩০ ফিট, ৩০ ফিট নীচে জল পাওয়া যায়।

যমুনা নদী—পৌরাণিক মতে যমুনানদী হরিদ্বার হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপ্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। তাহার পর দক্ষিণপ্রয়াগে গঙ্গানদী হইতে স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া কাঁচড়াপাড়ার নিকট বাগের-খাল ভেদ করিয়াছে, পরে পূর্ব্বমুখী হইয়া সোনাখালি, বীরুই, চৌবাড়িয়া, সাতবেড়িয়া, জলেশ্বর, ধর্ম্মপুর, শ্রীপুর, মাটিকোমরা, নাইগাছি, মল্লিকপুর, ইচ্ছাপুর, বাগিনা, গৈপুর, গোবরডাঙ্গা, গয়েশপুর, ঘোষপুর ও চারঘাটের নীচে দিয়া যাইয়া চারঘাটের পূর্ব্বদিকে ইচ্ছামতী নদীর সহিত মিশিয়াছে। কুশদহের অনেক গ্রাম যমুনানদীর কূল আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। যমুনানদীর সহিত চলুন্দিয়া ও টেংরার খাল মিলিত হইয়াছে। টেংরার খাল এখনও বর্ত্তমান, কিন্তু চালুন্দিয়ানদী শুষ্ক হইয়া নানা খাল-বিলে পরিণত হইয়াছে। খাঁটুরার পূর্ব্বসীমানাস্থ বামোড় অনেকের মতে চালুন্দিয়ার অংশবিশেষ। মেদিয়া নামক স্থানকে বামোড় কঙ্কণের মত ঘিরিয়া থাকায় বামোড়ের আর একনাম কঙ্কণা,—ইহা আমরা অনেকেই জানি না—আমাদের শিক্ষা এতদূর অসম্পূর্ণ।

আমাদের ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন জাতির লোক এই দেশেই বাস করে। সুদূর-বিস্তৃত পর্ব্বতমালা, নদ-নদী, জলপ্রপাত, উপত্যকা, মরুভূমি, প্রান্তর, বন, উপবন, কিছুরই অভাব নাই। একই সময় কোথাও বা দারুণ গ্রীষ্ম, কোথাও বা ভীষণ শীত। কোনস্থানে শস্যশ্যামলা ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা আবার শুষ্ক জলশূন্য মরুভূমি। আমাদের এইদেশকে প্রথমে চিনিতে হইবে, তবেই দেশকে যথার্থ ভালবাসিতে পারা যাইবে। বাংলা আবার আমাদের সোনার বাংলা হইবে। মাঠে আবার ধেনু চরিবে, ছায়ায় ঢাকা পল্লীপথ পাখীর গানে মুখরিত হইবে, গ্রামে গ্রামে মাঠে মাঠে আবার ফাল্গুনের নবজাগরণ আসিবে। (ক্রমশ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, খাঁটুরা পাঠাগার।

স্বাস্থ্যবিধি-পঞ্চাশৎ

[ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি]

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোনরকম ভয়ানক কাণ্ড করিতে হয় না; কোনরূপ বিরাট উদ্যোগ আয়োজনও করিবার দরকার নাই। কেবল কতকগুলি অতি সরল ও সহজসাধ্য নিয়ম পালন করিয়া গেলেই শরীর চিরকাল সুস্থ থাকিতে পারে। এইসকল নিয়ম পালনে কিছু মাত্র ব্যয় নাই, কোন কষ্টও নাই। কিরূপ সামান্য চেষ্টায় আপনি চিরসুস্থ থাকিতে পারেন, তা' দেখুন।

১। আপনার নিত্য অভ্যাসগুলি স্বাস্থ্য-সাধনোপযোগীভাবে সংশোধন ও সংযত করিতে হইবে। সে কাজ এখনই আরম্ভ করিয়া দিন।

২। সকল বিষয়ে মিতাচারী হইতে হইবে।

৩। সর্ব্বদা সুস্থকায় লোকের সঙ্গ করিবেন। পীড়া যেমন সংক্রামক, স্বাস্থ্যও সেইরূপ সংক্রামক।

৪। প্রত্যহ ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করিয়া শীতকালে ঈষদুষ্ণ জলে এবং অন্যান্য ঋতুতে শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিবেন। প্রতি সপ্তাহে দুই তিন দিন রাত্রে ঈষদুষ্ণ জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিয়া শয়ন করিতে যাইবেন। গাত্রচর্ম্মের অদৃশ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি পরিষ্কার রাখা দরকার, যাহাতে ঐসকল সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বায়ু দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে; এবং চামড়ার নিম্নে যেসকল ময়লা ও আবর্জ্জনা আসিয়া জমে সেগুলি বাহির হইয়া যাইতে পারে। নচেৎ, চর্ম্মের ছিদ্রগুলি বুজিয়া গিয়া দেহের মধ্যে ক্লেদ জমিয়া নানা পীড়ার সৃষ্টি করিতে পারে।

৫। আপনার স্নায়ুমণ্ডলী যদি অত্যধিক তেজস্বী ও চঞ্চল হয়, যদি সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বশে রাখিতে অভ্যাস করুন; আত্মসংযম অভ্যাস করুন।

৬। ঠিক সোজা এবং খাড়াভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস করিবেন। চেয়ারে বা ফরাসে বসিয়া থাকিবার সময় কদাচ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বা চেয়ারের পিছনে অথবা দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিবেন না। তাকিয়া

হেলান দিয়া বসা কেবল অলসতার লক্ষণ নয়,—উহাতে আয়ুক্ষয় হয়। ঠিক খাড়াভাবে বসিলে মেরুদণ্ড সোজা থাকে; পেটেও চাপ পড়ে না।

৭। সর্ব্বদা, অর্থাৎ যখনই মনে পড়িবে,—দীর্ঘনিশ্বাস লইতে অভ্যাস করিবেন। এক একবারে ধীরে ধীরে যতখানি পারেন, শ্বাস বায়ু টানিয়া লইয়া ফুসফুসকে পূর্ণ করিবেন। সাধারণত লোকের অতি সামান্য মাত্র বায়ু শ্বাসরূপে লওয়া অভ্যাস। এ অভ্যাস যতদূর সম্ভব ত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া গাত্র মার্জ্জনার পর অন্তত দশ মিনিট একটু চেষ্টা করিয়া, ব্যায়ামের হিসাবে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। শয়নের পূর্ব্বেও একবার এই ব্যায়ামটি করা চাই। তারপর দিনের মধ্যে যখনই মনে পড়িবে, তখনই দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে ভাল হয়। এই শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ যতটা ধীরে ধীরে করিতে পারা যায় ততই ভাল। এ সময় যদি ঘরের ভিতরে থাকেন, তাহা হইলে জানালাগুলি যেন খোলা থাকে। অন্যসময়ে সম্ভব হইলে ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে এই ব্যায়াম করা সঙ্গত। দিনের মধ্যে যতক্ষণ পারেন, ঘরের বাহিরে কাটাইবেন। রাত্রে সমস্ত রাতই যেন শয়নগৃহের অন্তত একটা জানালা, যতটা সুবিধা হয়, খোলা রাখিতে হইবে।

৮। প্রত্যহ একটু একটু করিয়া শারীরিক ব্যায়াম রকা চাই-ই চাই। যদি কাহারও পেশা এমন হয় যে, সমস্ত দিন একজায়গায় বসিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ নিয়ম করিয়া অবসর সময়ে অন্তত একঘণ্টা ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে অবস্থান করিতে হইবে। এই সময়টা বেড়াইতে পারিলেই ভাল। ঘরের ভিতর বদ্ধ বায়ুতে সমস্তদিন কাজ করিতে হইলে বিলক্ষণ ক্লান্তি বোধ হয়। অবসরকালে প্রবহমান খোলা হাওয়ায় এক আধ ঘণ্টা দ্রুত ভ্রমণ করিলে, সমস্ত ক্লান্তি ও শারীরিক গ্লানি দূর হইয়া বেশ প্রফুল্ল বোধ হয়। মানসিক শ্রমের পর শারীরিক পরিশ্রম বেশ বিশ্রামের কাজ করে। ঘরের ভিতর তাকিয়া হেলান দিয়া তামাক খাওয়া কিম্বা শয্যায় গা-হাত-পা এলাইয়া দেওয়া অপেক্ষা দ্রুত ভ্রমণ বহুগুণে উৎকৃষ্ট বিশ্রাম।

৯। আহারের পূর্ব্বে হাত-পা ধুইয়া লইতে কখনও ভুলিবেন না। আমাদের আচমন-প্রথা খুব স্বাস্থ্যসম্মত বিধি। উহা কেবল ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কুসংস্কার নহে। হাত না ধুইয়া খাইতে বসিলে, হাতের ময়লার সঙ্গে নানা রোগের বীজাণু খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইয়া পীড়া জন্মাইতে পারে। হাতে বিশেষতঃ নখে অনেকরকম বিষাক্ত পদার্থও লাগিয়া থাকিতে পারে। তদ্দ্বারা শরীরের মধ্যে বিষক্রিয়া উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে।

১০। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে খাওয়ার অভ্যাস থাকা খুব দরকার। দুইবার খাওয়ার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কখনও কিছু খাওয়া উচিত নহে। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও, তাহা সহ্য করিয়া থাকা ভাল। তাহাতে কোন অনিষ্ট নাই; পক্ষান্তরে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

১১। প্রত্যহ দেড়সের হইতে দুইসের পরিমাণ জল পান করা কর্ত্তব্য।

১২। পেট ঠাসিয়া খাওয়া ভাল নয়। বরং ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবার পূর্ব্বে আহারে বিরত হওয়া ভাল। তা' বলিয়া যতটুকু খাওয়া আবশ্যক, তদপেক্ষা কম খাওয়া উচিত নহে। আহার শেষ করিয়া উঠিবার সময়, "উঃ! বড় খাওয়া হয়েছে" এরকম মনের ভাব হওয়ার অপেক্ষা, মনের ভাব "এখনও একটু ক্ষিদে আছে, আরও কিছু খেতে পারতুম" এ রকম হওয়া আরও ভাল।

১৩। খাদ্যদ্রব্যে অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করিবেন না। নুন-খর তরকারী খাইতে মুখরোচক হইলেও শরীরের পক্ষে অহিতকর।

১৪। সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

১৫। চা, কফি প্রভৃতি পানীয় শরীরের কোন উপকার করে না, বরং যথেষ্ট অপকার করে। উহা মাদকতা আনয়ন না করিলেও নেশার প্রায় কাছাকাছি এই শ্রেণীর পানীয় সেবনের অভ্যাসের অধীন না হওয়াই শ্রেয়ঃ।

১৬। খাদ্য যত সাদাসিধা অথচ পুষ্টিকর হইবে ততই ভাল। খুব ঝালমসলা দেওয়া অন্ন-ব্যঞ্জন তৃপ্তিকর হইলেও তাহাতে শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। আমাদের

গরম দেশে মাংস স্বাভাবিক খাদ্য নয়। উহা না খাইলেই ভাল। যাঁহাদের মাংস না হইলে চলে না, তাঁহারা যথাসম্ভব অল্প পরিমাণে উহা খাইতে পারেন। মাংস খাইলেও শরীরের বিশেষ কোন উপকার হয় না, না খাইলেও কোন অনিষ্ট হয় না। সেজন্য মাংস ভিন্ন যাঁহাদের মুখে অন্ন রুচে না, তাঁহারা উহা যত কম পারেন খাইবেন।

১৭। ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া খাইবেন। খাদ্য জীর্ণ হওয়ার কার্য্য মুখ হইতে আরম্ভ হয়। প্রত্যেক গ্রাস অন্ন উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবার পর তবে তাহা গলাধঃকরণ করিবেন। চর্ব্বণের ফলে খাদ্য সহজে জীর্ণ হয় এবং চর্ব্বণে খাদ্যের সম্পূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায়।

১৮। অতিরিক্ত লবণের ন্যায় অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্যও শরীরের পক্ষে অহিতকর। তরকারীতে বেশী নুন দিলে যেমন তাহা "নুনে পোড়া" তরকারী হইয়া যায়—তাহা যেমন মুখে করিতে পারা যায় না, অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্যও সেইরূপ মুখরোচক হয় না। সন্দেশ রসগোল্লা এবং অন্যান্য মিষ্টদ্রব্যে চিনির আধিক্য হইলে তাহা খাইতে ভাল লাগে না। অথচ পরিমিত মিষ্ট ব্যবহার করিলে খাদ্য কেমন সুস্বাদু হইয়া থাকে।

১৯। একদিনে একই সময়ে অনেকরকম খাদ্য একসঙ্গে খাওয়া ভাল নয়। শরীর পোষণার্থই খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়; পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একসঙ্গে না খাইলে শরীর পোষণের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ৪।৫ রকম ব্যঞ্জন হইলেই বৈচিত্র্যের পক্ষে যথেষ্ট হয়, মুখরোচকও কম হয় না। তবে প্রত্যেক দিন একই রকম খাদ্য খাইতে হইলে অরুচি হইতে পারে; সেইজন্য মধ্যে মধ্যে খাদ্যের উপকরণ বদলানো উচিত।

২০। মাথা ঠাণ্ডা, পা গরম ও উদর পরিষ্কার রাখা চাই। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এই দুইবার কোষ্ঠ সাফ করিবার অভ্যাস থাকা ভাল।

"হয়-না-হয় দু'বার যায়,
খায় না খায় সকালে নায়—
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?"

২১। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া একবার, এবং প্রত্যেক-বার আহারের পর একবার করিয়া দাঁত মাজিয়া ফেলা আবশ্যক। রন্ধন ও আহারাদির পর সকড়ি এবং এঁটো বাসন না মাজিয়া লইলে তাহাতে গৃহস্থের কোন কাজই হয় না। দাঁতও সেইরূপ সকড়ি হয়। আহার ও আচমনের পর উহাতে যেসব খাদ্য-কণা লাগিয়া থাকে, তাহা মাজিয়া পরিষ্কার না করিলে উহা পচিয়া দাঁত নষ্ট হয়, শরীর বিষাক্ত হইতে পারে, খাদ্য হজম হয় না, এবং দেহ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। দাঁতন করা, খড়কে লওয়া ভাল অভ্যাস। তবে খড়কে লওয়ার সময়ে প্রায় মাত্রাধিক্য ঘটে; তাহাতে দুইটি দন্তের মধ্যস্থ ফাঁকগুলি বড় হইয়া যায় ও বিশ্রী দেখায় এবং অন্য অসুবিধাও হয়। খড়কে লওয়ার সময় একটু সাবধান হওয়া উচিত—দাঁতের গোড়ায় খোঁচা দিয়া রক্তপাত করা কর্ত্তব্য নয়।

২২। ঘরের দরজা জানালা দিবারাত্রি এমনভাবে খুলিয়া রাখিতে হইবে, যেন দিনের বেলা ঘরে রোদ আসিতে পারে এবং রাত্রে বায়ু প্রবাহিত হয়।

২৩। হাওয়াকে কখনও ভয় করিবেন না। ঋতুভেদে উপযুক্ত গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট;—ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া অসুখ করিবার কোন ভয় নাই। সহরে দিনের হাওয়া অপেক্ষা রাত্রের হাওয়া অধিকতর বিশুদ্ধ।

২৪। সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া গায়ে একবার কিছুক্ষণ হাওয়া লাগিতে দিলে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একবার গা-হাত-পা ঘর্ষণ করিলে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে।

২৫। গাত্রবস্ত্র ঋতু-অনুযায়ী পরিমিত হওয়া আবশ্যক। শীতকালে অতিরিক্ত গরম বস্ত্র ব্যবহার নিষ্ফল বরং তাহাতে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে; আর অনাবশ্যক ভারবহনের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। আর গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালেও চব্বিশ ঘণ্টা আদুড় গায়ে থাকাও কর্ত্তব্য নয়। একটা হালকা কিছু—চাদর বা জামা গায়ে থাকা ভাল।

২৬। যাহাদিগকে কেবলমাত্র মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে যেমন নিত্য নিয়মিতভাবে একটু শারীরিক পরিশ্রম অত্যাবশ্যক—যাহাদিগকে কেবল কায়িক শ্রম করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে তেমনি প্রত্যহ

১০। ১৫ মিনিট বা আধঘণ্টা কিম্বা একঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম হিতকর। গল্পের বই কি অন্য কোন লঘু সাহিত্য পাঠ করিলে মন প্রফুল্ল থাকে। লেখাপড়া না জানিলে অপরের কাছে রামায়ণ মহাভারত পাঠ শোনাও মন্দ নয়। এই শ্রম-বৈচিত্র্য শরীর ও মন উভয়ের পক্ষে ক্রমান্বয়ে শ্রম ও বিশ্রামের কাজ করে।

২৭। একাধিক যোড়া জুতা ব্যবহার করা আবশ্যক। একই যোড়া জুতা রোজই পরা অপেক্ষা, আজ একযোড়া কাল অপরযোড়া এমনইভাবে বদলাইয়া পরিতে পারিলেই ভাল। ভিজা জুতা পরিয়া থাকা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বরং খালি পায়ে থাকা অনেক ভাল।

২৮। স্নায়ুঘটিত মাথাধরা ধীরে ধীরে খানিকক্ষণ চুল আঁচড়াইলে ভাল হইয়া যায়।

২৯। বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা কিছুক্ষণ রৌদ্র উপভোগ করিলে অনেকটা আরাম পায়; এমন-কি, সূর্য্য-কিরণ লাগাইলে বাত ভাল হইয়া যাইতেও পারে।

৩০। শরীরে বেদনা বা যন্ত্রণা বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করা উচিত; কারণ, ইহা রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। আলস্য বশতঃ অবহেলা করিলে রোগে ভুগিতে হইবে।

৩১। সর্ব্বদা নিজেকে সুস্থ মনে করিবার চেষ্টা করিবেন। পাছে অসুখ করে—এই ভয়ে কখনও ভীত থাকা কর্ত্তব্য নয়। ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতার সীমা নাই। প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অনেক রোগের আক্রমণ নিবারণ করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়। ইহা খুব শক্তিশালী রোগ-প্রতিষেধক। যে সর্ব্বদা নিজেকে অসুস্থ মনে করে, রোগও তাহাকে সর্ব্বদা পাইয়া বসে।

৩২। বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার জন্য যদি স্বাস্থ্যকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা হইলে সে বিদ্যা নিষ্ফল। আগে স্বাস্থ্য তার পর বিদ্যা।

৩৩। শিক্ষকেরা এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, ছাত্রদের মানসিক উন্নতিসাধনই তাঁহাদের একমাত্র কাজ নহে—ছাত্রগণের শরীর সুস্থ রাখা এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধির জন্যও তাঁহারা দায়ী।

৩৪। অনেকে চলিবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলেন; তাহাতে তাঁহাদের পিঠ কুব্জাকার, এবং স্কন্ধদ্বয় গোল হইয়া আসে। ইহা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ অথবা ইহার পরিণাম অস্বাস্থ্য। এই বদভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য সামনের দিকে চক্ষুর সমতল অপেক্ষা উচ্চ জিনিসের প্রতি নজর রাখিয়া চলিতে পারিলে কুব্জ ভাব দূর হয়। যদি কোন রাস্তার ধারে ঘড়িওয়ালা গির্জ্জা কিম্বা উচ্চ মন্দির থাকে, তবে ঐ ঘড়ি কিম্বা মন্দিরের চূড়ার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। গির্জ্জা বা মন্দির না থাকিলে ঐ রকম কোন উঁচু জিনিসের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে অবশ্য, গাড়ী ঘোড়া মোটর প্রভৃতি হইতেও নিজেকে সাবধান রাখিতে হইবে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

৩৫। দিবসের শেষ আহার অর্থাৎ নৈশ আহারের পর কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম—কি মানসিক, কি শারীরিক—করা উচিত নহে। আহারের পর এবং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে কোন লঘু সাহিত্য পাঠ বা একটু আধটু আমোদ প্রমোদ করিতে পারিলে ভাল হয়।

৩৬। একইসময়ে একসঙ্গে ফল ও শাকসব্জি আনাজ তরকারী না খাইলেই ভাল।

৩৭। প্রত্যহ প্রাতরাশের খাদ্য-তালিকায় ফলমূলের সংখ্যাধিক্য হিতকর।

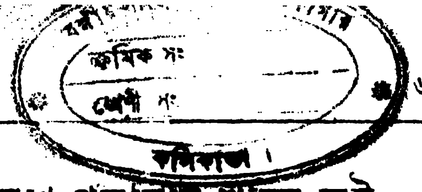
৩৮। সপ্তাহের মধ্যে একদিন কেবল ফল খাইয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে উত্তম হয়। এই অভ্যাসের সুফল অতি শীঘ্র প্রত্যক্ষ করা যায়।

৩৯। যেটুকু খাদ্য সহজে হজম করিতে পারিবেন বলিয়া বুঝিবেন, সেই পর্য্যন্ত খাইয়াই নিরস্ত হইবেন,—তাহার অধিক আর কিছুই খাইবেন না।

৪০। যে ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নপর তাহাকে কখনও অপরের গলগ্রহ হইতে হয় না।

৪১। খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া, গুরু ভোজন, উত্তমরূপে খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ না করিয়া খাওয়া—এই গুলির ফলে অধিকাংশ পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

৪২। চক্ষের চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখা গেলে বুঝিতে হইবে, স্বাস্থ্য খারাপ হইবার উপক্রম হইয়াছে; তখনই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।



৪৩। যেখানে বায়ু চলাচল করিতে পারে না, সে রকম কক্ষে থাকা উচিত নয়। বাধ্য হইয়া থাকিতে হইলে, যত অল্প সময় সে-ঘরে থাকিতে হয় ততটুকু ভাল। জনতাপূর্ণ স্থানের বায়ুও স্বাস্থ্যকর নহে।

৪৪। ছেলে যদি কাঁদে, তবে তাহাকে শাসন না করিয়া, কান্নার কারণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। ছেলে কাঁদিলেই তাহাকে মাই দেওয়া, কি লজেঞ্চুস দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। ইহাতে ছেলে তখনকার মত ঠাণ্ডা হইলেও, কান্নার প্রকৃত কারণ দূর না হওয়ায় তাহার ফল ভাল হয় না।

৪৫। যাহাতে আপনার শরীরের অনিষ্ট হইবে বলিয়া বুঝিবেন, তাহা যতই সুখাদ্য হউক না কেন, তাহা কখনই খাইবেন না,—লোভ সংবরণ করিতেই হইবে।

৪৬। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন উপবাস দিলে শরীর খুব ভাল থাকে; এমন-কি অনেক পীড়ার আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

৪৭। কাজ করিতে যদি ক্লান্তি বোধ হয়, তবে কাজ বন্ধ রাখিয়া বিশ্রাম করিবেন। ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করিতে যাওয়া বিবেচনাসঙ্গত নয়, নিরাপদও নয়। কাজ না করিলে যতটা ক্ষতির সম্ভাবনা—ক্লান্ত শরীরে কাজ করিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়া থাকে।

৪৮। শয়ন-গৃহের মেঝে অনাবৃত থাকা ভাল; কিন্তু বিলাসিতার খাতিরে তাহা সর্ব্বদা কার্পেট ইত্যাদি মণ্ডিত করিয়া রাখায় অনিষ্ট হয়; উহাতে অনেক রোগের বীজ আশ্রয় লইতে পারে।

৪৯। পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে অবশ্য তাহার কোন ক্ষতি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৫০। চুরি ডাকাতি খুন জখম মিথ্যা-ভাষণের ন্যায় শরীর অসুস্থ থাকা একটা পাপ বলিয়া মনে করা উচিত। যাহাতে সে-পাপের ভাগী না হইতে হয়, সেদিকে সকলের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমাজেরও এদিকে লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

পাষাণ গলাবার শক্তি কই

সুরেনদা' এসে একঘণ্টা ধরে দুঃখের কান্না কেঁদে গেলেন, বল্লেন, "দাদা, কে আমার কথা শোনে? গ্রামে যাদববাবুর দীঘিতে শ্যাওলা ও দল হয়ে দীঘি মাঠ হয়ে এসেছে—ওপরে ছাগল চরতে পারে, তবু বাবুরা তা' সাফ করাবে না। আমরা পয়সা দিয়ে পরিষ্কার করাব তাও করাতে দেবে না। গাঁয়ে করিমচাচার জমিটুকুর ওপর দিয়ে বিশহাত একটা নালা কেটে দিলে গাঁয়ের পচা বিলটা বাঁচে তা' খেসারৎ দিলেও ঐ টুকু জমি দিয়ে উপকার করবে না। গাঁয়ে দুপুরবেলা একঘণ্টা মেয়েদের আর রাত্রে একঘণ্টা পুরুষদের পড়াবার ব্যবস্থা করলুম, তা' কা কস্য পরিবেদনা! বলে কিনা, "বাবুদের কি মৎলব আছে।" হারু চকোত্তি সারা গাঁ-টায় সুদে টাকা ধার দিয়েছে, হাটেরদিন এসে জেলে-বৌ তরকারীওয়ালা চাষার কাছে ধমক-চমক দিয়ে বিনি-পয়সায় সব মাছ তরকারী নিয়ে গেল। শুনে আমি কিছু বল্লাম না, সুরেনদা' ছল-ছল-চোখে বসে রইল। আমার অন্তরাত্মা তখন সুরেনদাকে স্বগতঃ বলছিল, দাদা, কার নামে নালিশ করছো? এ তো আমাদেরই শত শত বছরের অবহেলার পাপ এইসব রূপ নিয়েছে। গ্রামবাসীরা তোমার কথা শোনে নি, কিন্তু তুমি কি শোনাতে পেরেছ? সে শক্তি বুকে ধরে তারপরে কি কাজে নেমেছ? এযে পাষাণ গলাবার কাজ ভাই! (কাজের কথা)—"বিজলী"।

* * * *

বাঙ্গালার লোকসংখ্যা ৪ কোটী ৫২ লক্ষ ও এক বৎসরের মোট ব্যয় ১২ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে ২৸/১০ হিসাবে ব্যয় করিতেছে। উহার মধ্যে পুলিশের জন্য ।৶০, শিক্ষার জন্য ।০, হাঁসপাতালাদির জন্য /১০, স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য ৵১০, কৃষি-বিভাগের জন্য ৵১০ ও শিল্প-বিভাগের জন্য ৵১০ ব্যয় করিতেছে। পুলিশ শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রহরী মাত্র। কিন্তু যাহার শরীর ও সম্পত্তি দুইই জীর্ণ, তাহার পক্ষে প্রহরীর জন্য এত ব্যয়—কেন?—"নীহার"।

তামাদী আরজী

চৌকী নিশ্চিন্তপুর ইনসাফী আদালত

বাদী—ম্যালেরিয়া সিংহ বর্ম্মা, পিতা—এনোফিলি মশা,
জাতি—ব্যাধিক্ষেত্র, নিবাস—সর্ব্বত্র, মানব-ক্ষয়-ব্যবসা।
বিবাদী—কাঙ্গাল, অভাগ্যদিগর, মা বাপ নাহিক কেহ,
জাতি—দীন দাস, পেশা—উপবাস, নিবাস—দুর্ব্বল দেহ।
সরিক বিবাদী বিসূচিকা ব্যাধি, বসন্ত ও নিমোনিয়া,
যক্ষ্মা কাস ক্ষয়, রক্ত আমাশয়; উপদংশ, গণোরিয়া।
অন্নবস্ত্রাভাব ডাক্তারের চাপ, মেয়ের বিয়ের পণ,
জলে ডুবে মরা, কেরোসিনে পোড়া,আরও আছে কতজন।
দাবী পরিমাণ—গরীবের প্রাণ, কড়ার অধিক নয়,
যাবত খাজনা। বাদীর বর্ণনা—নিম্নে দিনু পরিচয়:—
(১) এই আদালত-এলাকাস্থিত ডিবিজান মরঘাটী,
পরগণে ঝিল তরফ মুস্কিল, মৌজে বাঁশ-বাঁধা পাটী।
নিম্নের লিখিত চৌহদ্দিস্থিত স্বনামে লিখিত তার,
চোদ্দ পো'য়া জমি জীবন জমায় বিবাদী দাখিলকার।
(২) পূর্ব্বোক্ত মৌজায়, পনের আনায় মৌরসীদার বাদী,
সরিকগণের একআনা অংশে স্বত্ব শুধু মেয়াদী।
বাদীর অংশের খাজনাদি সব পৃথক আদায় হয়;
(ক) তফশীল মত বাদীর অংশে বাকী আছে সমুদয়।
তলব তাগাদা সর্ব্বাঙ্গ সত্ত্বেও নষ্টামি ক'রে বিবাদী,
দিবে ব'লে ফাঁকি [illegible] বাকী [illegible] খাজানাদি।
(৩) আষাঢ় আ[illegible] পৌষ ও চৈত্র আদায়ের প্রথামতে,
উক্ত মৌজার [illegible] ঘটিয়াছে কিস্তি গতে।
(৪) সরিকগণ ও বিবাদীর কাছে চেষ্টা করিয়া বাদী
জানিতে পারেনি সরিকের বাকী সঠিক সংবাদাদি।
১৪৮ (ক) ধারার মতে সরিক বিবাদীগণে
মোকাবিলা করি হুজুরাদালতে এ নালিশ সে কারণে।
(৫) বাদীর প্রার্থনা:—(ক)বাদীর খাজনা ডিক্রী হয় সুবিচারে,
মুলতবী কালের সুদসহ যেন উক্ত ধারা অনুসারে।
(খ) মোকাবিলাগণ বাদী হ'য়ে যদি হিসাব দাখিল করে,
অতিরিক্ত কোর্টফি দিতে রাজি বাদী সংশোধিত দাবি ধ'রে।
(গ) সম্পূর্ণ খরচার ডিক্রী পাইতে বাদী হন হকদার,
আইন ইকুইটী মতে যেন পায় অন্য সব প্রতিকার।

তফশীল হিসাব (ক)

খাজানা— জীবন-ধন সে—পুত্র-পরিজন,
সুদ—তার যা-কিছু সঞ্চিত।

চৌহদ্দী

উত্তরেতে রুক্ষ কেশ, দক্ষিণেতে পাদ দেশ,
পূর্ব্বে প্লীহা পশ্চিমে যকৃত।

সত্যপাঠ

আমি ব্যাধি ম্যালেরিয়া প্রকাশ করিনু এই—
আর্জির লিখিত যত তথ্য।
জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে স্বাক্ষরিনু আদালতে
সব মিথ্যা কতকাংশ সত্য।—(জঙ্গিপুর সংবাদ)।

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমাদের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডগুলির কাজ আদৌ সুবিধাজনক হইতেছে না। যাহাদের অসুবিধা প্রতিকার করিবার উদ্দেশ্যে ট্যাক্স আদায় হয় তাহাদের কথায় কর্ণপাত বা তাহাদের সুবিধা-অসুবিধা অনুসারে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কাজ করেন না। সুতরাং মামুলী ধরণের বজেট, দলিল-দস্তাবেজ ও মিটিং ছাড়া আমাদের ডিঃ বোর্ডগুলি কৃতকার্য্যতা দ্বারা বিশেষত্ব লাভ করিতে পারিতেছেন না। একটা দৃষ্টান্ত:—

চৌবেড়িয়ার জনৈক পত্রলেখক একখানি ইংরাজী দৈনিক কাগজে যশোহর ডিঃ বোর্ডের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি রাস্তানির্ম্মাণ, জলকষ্টনিবারণ এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এই তিনটি বিষয় লইয়া লেখালেখি করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় চৌবেড়িয়া হইতে চাঁদপাড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত এই নয়মাইল একটি পাকা

রাস্তা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ডিঃ বোর্ড লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের দ্বারা ইহা সম্ভব হইবে না। জলকষ্টের জন্য পত্রলেখক লিখিয়াছেন 'মাত্র দুইটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিবার জন্য যশোহর ডিঃ বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়। চিঠির উত্তর আসিতেই ৭।৮ মাস সময় লাগিয়াছিল এবং উত্তরে জানাইয়াছেন যে যথাসময়ে পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে বোর্ড হস্তক্ষেপ করিবেন। সে-সময় কবে যথা হইবে কে জানে?'

দাতব্য চিকিৎসালয় জন্য ৺দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মিত্র তাঁহাদের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটীখানি ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ৺কালীকৃষ্ণ মিত্রের পত্নী নগদ ৫০০০৲ টাকা ডিঃ বোর্ডকে দিয়াছেন। ডিঃ বোর্ড দুইবৎসর হইল ডাক্তারখানা মঞ্জুর করিয়াছেন অথচ এখনও কাজ আরম্ভ হয় নাই। এ সম্বন্ধে শীঘ্র কাজ করিবার জন্য তাগাদা করায় পত্রলেখক বলেন, ডিঃ বোর্ড তাঁহাদের মামুলী পন্থা ধরিয়াছেন অর্থাৎ পত্রের উত্তর দেন না।

* * * *

কুশদহ-সমিতির এ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা একই রকম। ডিঃ বোর্ড হইতে চিঠির উত্তর পাইতে কখনও কখনও দুইবৎসরও উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত সমিতির কাগজপত্রের মধ্যে আছে। তাহার উপর যখন জলাভাবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আবেদন করা হয় অথবা রাস্তা-ঘাটের প্রাণান্তকারী অসুবিধার প্রতিকারের জন্য জানানো হয় ডিঃ বোর্ড তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত হন না। এক-একসময়ে এমন বিরক্তিকর উত্তর পাওয়া যায় যে, তাহা হইতে ডিঃ বোর্ড দ্বারা যে-ভাবে কাজ চলিতেছে, বেশ বুঝা যায়। কতকগুলি মামুলী গৎ ডিঃ বোর্ডের মুখস্থ :—

(1) The Board is not in a position to consider the application. &c. &c.

(2) The Board cannot undertake the work......... .....

অনুকূল উত্তর :—

(1) The question will be considered in due course — (কখনই সে সময় আসে না)।

(2) Your letter is receiving attention (অর্থাৎ ইতি)

কাজে পরিণত হইলে :—

একটা কাজের নমুনা

(1) Arrangements have been made to throw sands on the.........road. ইত্যাদি।

বিশেষ দৃষ্টান্ত বারান্তরে উল্লেখ করিব।

কুশদহ-সমিতি বহু বিষয় লইয়া ডিঃ বোর্ডের শরণাপন্ন হইয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-পর্য্যন্ত কোনও কাজ ডিঃ বোর্ড দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

ঘোঁজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সমিতির হস্তে তিন সহস্র টাকা দিতে রাজী হ'ন। সমিতি যশোর ডিঃ বোর্ডকে সেকথা জানান এবং তাঁহাদের হাতেই ঐ টাকাটি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে আবেদনের উত্তর পাইতেই যে কতদিন গেল তা [illegible] দরকার নাই। যদিই-বা উত্তর পাওয়া গেল, তাহা এত উদাসীনতার ভাব যে ডিঃ বোর্ড যে আমাদের নিজেরই পরিচালিত সেকথা বিশ্বাসই হয় না।

—•—

যশোহর ডিঃ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার রায় বাহাদুর স্বরং সমিতির ১ম বার্ষিক অধি-বেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে কয়েকখানি গ্রামের সকলরকম দুরবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যখন বিশেষভাবে তাঁহাকে গ্রামের ভিতর ঘুরাইয়া রাস্তাঘাট ও ইস্কুলের অবস্থা দেখানো হয়। কিন্তু বোধ হয় তিনি এই ক্ষুদ্র সমিতির কথা স্মরণ রাখেন নাই। ফলও কিছুই হয় নাই।

—০—

গাইঘাটা হইতে গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা আছে। কি দুর্দ্দশা সে রাস্তার! বর্ষাকালে গোরুর গাড়ীর চাকার প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী কাদার মধ্যে ডুবিয়া যায়। তাহার উপর মাটিকোমরার প্রান্তে ঐ রাস্তার উপর একটা কাঠের পুল আছে। সেটা যে কেন এখনও ভাঙিয়া পড়িতেছে না তা ভগবানই জানেন। গাইঘাটা ও গোবরডাঙ্গা দুইই ব্যবসা-হিসাবে খুব আবশ্যকীয় স্থান।

সুতরাং মাঝের এই রাস্তাটির উপর দিয়া বিস্তর ব্যবসায়ীর মালবোঝাই গাড়ী প্রায়ই যাতায়াত করে। যশোহর ডিঃ বোর্ডকে এই জীর্ণ পুলটির কথা বিশেষ করিয়া লেখা হয়। সে আজ তিনবৎসরের কথা। উত্তর আসিতেই গেল ছয়মাস। শেষে পুনঃ পুনঃ তাগাদার ফলে শোনা গেল যে বনগ্রামের ওভারসিয়ার এ বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার পাইয়াছেন। দুইবৎসর আগে বনগ্রামে এই ওভারসিয়ার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে "আর দেরী নাই কাজ আরম্ভ হইল বলিয়া।"—

ডিঃ বোর্ডের কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না—সুতরাং দুই বৎসর সময় কাটিয়া গিয়াছে। পুল ও রাস্তা এখনও তদন্তাধীন। —

কুশদহ-সমিতি ডিঃ বোর্ডের সহিত একযোগে এই সকল কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং এবার আমরা শুধু এইগুলি কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিয়াই বিরত রহিলাম।

* * * * *

ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য জল নিকাশের ব্যবস্থা

"বসুমতী" লিখিয়াছেন বাঙ্গালা সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগ হইতে নিম্নোক্ত কমিউনিকখানি প্রকাশিত হইয়াছে—

ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের মন্ত্রী নিম্নোক্ত কয়েকটি স্থানে জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আরাপঞ্চ

২৪ পরগণার অন্তর্গত আরাপঞ্চ জল-পথটির জন্য প্রায় ৩০ বর্গমাইলব্যাপী স্থানে বর্ষার জল আটকাইয়া থাকে। এই মরা গাঙ্গের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ যদি এই ব্যয় মঞ্জুর করেন তাহা হইলে এই কার্য্য একমাত্র সরকারী ব্যয়ে সম্পন্ন হইবে।

আমতা

হাবড়া জেলায় অন্তর্গত এই স্থানের প্রায় ১২৮ বর্গ মাইল পরিমাণ জনপদের জলনিকাশ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রায় গত ৩৫ বৎসর ধরিয়া ইহার আলোচনা হইয়া আসিতেছে কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। এক্ষণে ১৯২০ সালের কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতি সংক্রান্ত আইন অনুসারে এখানকার জলনিকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এজন্ত ১০।।০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সরকার এই ব্যয়ের সাহায্যার্থ দেড় লক্ষ দিয়াছেন এবং আরও ৫০ হাজার টাকা দিবেন। তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষে দেড়লক্ষ টাকা ঋণ দিবেন।

আরুল বিল

আরুল বিল কুশাহর সহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এ বিলটির জন্য ঐ অঞ্চলের প্রায় ৫৩ বর্গমাইল পরিমাণ স্থান জলসিক্ত থাকে। ইহার জলনিকাশের জন্য ২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সরকার ইহার সাহায্যার্থ ৮০ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই কার্য্য কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতি সংক্রান্ত আইনানুসারে সম্পন্ন করা হইবে এবং অবশিষ্ট ব্যয়ের জন্য ঋণ লওয়া হইবে।

নাউই শুঁঠি জলপথ

নাউই ও শুঁঠি (লক্ষণাবতী ও স্বর্ণাবতী) এ দুইটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার এলাকায় অবস্থিত। ইহা এক্ষণে একেবারে মজিয়া গিয়াছে এবং উহার গর্ভে স্থানে স্থানে এক একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুইটি নদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া পূর্ব্বে যেমন উহার জল নিকটবর্ত্তী বিলে গিয়া পড়িত সেইরূপ করা হইবে। আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা এজন্য ব্যয় হইবে। সরকার এজন্য ২ লক্ষ টাকা দিয়াছেন এবং বাকী টাকার জন্য ঋণ দিবেন। কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতি সংক্রান্ত আইন অনুসারে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এই নদীদ্বয়ের সংস্কার হইলে ১৫৬ বর্গমাইল স্থানের জল নিকাশ হইবে।

যমুনা

২৪ পরগণা, যশোহর ও নদীয়া জেলার মধ্যবর্ত্তী এই মরা গাঙ্গের সংস্কার হইলে উল্লিখিত জেলাত্রয়ের ৩৬০ বর্গমাইল স্থানের উপকার হইবে। ইহার জন্য ১০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সরকার ইহার সাহায্যার্থ দুইলক্ষ টাকা দিয়াছেন এবং বক্রী টাকার জন্য ঋণ দিবেন।

ভৈরব নদী

যশোহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, এই নদীটির সংস্কার হইলে ও উহার জলনিকাশের ব্যবস্থা হইলে ঐ অঞ্চলের ৮০০ বর্গমাইল ব্যাপী ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানের উপকার হইবে। এজন্য ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সরকার ইহার জন্য ২ লক্ষ টাকা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু সেজন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের মঞ্জুর আবশ্যক। এই কার্য্যটির এখন প্রাথমিক অবস্থা। এখন কেবল এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে।

কার্য্যতঃ কতদূর কি হয় জানিবার জন্য আমরা বিশেষ ভাবে উৎকণ্ঠিত রহিলাম। যমুনা সংস্কার যেভাবে চলিতেছে অপরগুলিও কি সেইরকম উৎসাহের সহিত কার্য্যে পরিণত করা হইবে? যমুনা-সংস্কার সম্বন্ধে বারান্তরে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্থানীয় সংবাদ

রেড্ডগম-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বর্ত্তমান বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রের কর্ম্ম জীবন সর্ব্বথা জয়যুক্ত হউক এবং দেশবাসীর প্রতি-কর্ত্তব্যে সুচিহ্নিত হউক। তাঁহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শুভইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

এ বৎসর গোবরডাঙ্গা হাই ইস্কুল হইতে যে চারিটি ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার ৺গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ অমিয়মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে এবং শ্রীমান্ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিভাগে, গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত যষ্টীবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান নীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিভাগে এবং খাটুরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ গুরুকিঙ্কর ঘটক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কুশদহবাসী শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ৺ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জামাতা কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার কাপ্টেন পি, গাঙ্গুলি আই-এম্-এস্ বর্ত্তমানে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বিডন ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছেন। যক্ষারোগ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী।

শোক সংবাদ

গত ১২ই বৈশাখ, ১৩২৮ তারিখে কুশদহের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় ৪৪ বৎসরকাল গোবরডাঙ্গা ইস্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে পণ্ডিত মহাশয়ের বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।



ঘরের কথা

কুশদহ-সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ও তদুপলক্ষ্যে কৃষি শিল্প প্রদর্শনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাহায্যকারিদিগের নাম ঃ—

(দ্রষ্টব্য—সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত কার্য্যবিবরণীর মধ্যে দ্বিতীয় বার্ষিক সভা ও প্রথম প্রদর্শনীর ব্যয়ের হিসাব পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে। স্থানাভাবে উক্ত রিপোর্টের মধ্যে চাঁদাদাতৃগণের প্রত্যেকের নাম ও দানের পরিমাণ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তাই [illegible] এখানে প্রকাশিত হইল)।

শ্রীযুক্ত মহামনারায়ণ পাল—খাঁটুরা	১০৫৲
,, কুশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ	৪১৲
,, ব্রজকিশোর মিত্র—গৈপুর	৪১৲
,, মহামূল্য আশ—খাঁটুরা	৩৫৲
,, শিবদাস রক্ষিত—ঐ	৩৫৲
,, সতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, গোবরডাঙ্গা	২৫৲
,, শরৎচন্দ্র রক্ষিত—খাঁটুরা	২৫৲
,, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার	২৫৲
,, কার্ত্তিকচন্দ্র দে—গৈপুর (মোক্তার শিলিগুড়ি)	২০৲
,, হরিনারায়ণ রক্ষিত—খাঁটুরা	২০৲
,, গুণেন্দ্রনাথ মল্লিক (জমিদার হৃদয়দাদপুর)	২০৲
,, পি, এন্ বসু—গৈপুর (রাঁচি)	১০৲
,, পতিরাম চট্টোপাধ্যায়—গৈপুর (কাশ্মীর)	১০৲
,, খগেন্দ্রনাথ পাল—খাঁটুরা (বাগবাজার)	১০৲
,, হরিচরণ ঘোষ—খাঁটুরা	৫৲
,, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র—চৌবেড়িয়া	৪৲
,, পঞ্চানন মিত্র (ষ্টেশনমাষ্টার গোবরডাঙ্গা)	৪৲
শ্রীযুক্ত হরিপ্রিয় কোঁচ	৪৲
,, জগদ্বন্ধু মোদক—খাঁটুরা	২৲
,, ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র—গৈপুর	২৲
,, অন্নদাচরণ [illegible]	২৲
,, শরৎচন্দ্র মিত্র—বালিয়ানি	২৲
,, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—গৈপুর	২৲
,, শ্রীশচন্দ্র মিত্র	২৲
,, পঞ্চানন সাহা	১৲
,, রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—কলিকাতা	১৲
,, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র—গৈপুর	১৲
২৪ পরগণা ডিঃ বোর্ড	১০০৲
মোট—	৫৫৪৲

——:০:——

প্রবাসে কুশদহবাসী

পুরী

গৈপুর-নিবাসী

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র বি-এ,

এক্ষণে পুরীধামে আবগারী বিভাগের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট পদে কার্য্য করিতেছেন। ইহার বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৫৩ বৎসর। পিতার নাম ৺কেদারনাথ মিত্র, পিতামহ ৺বারাণসী মিত্র।

চারুবাবু গোবরডাঙ্গা হাটস্কুলে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া কলিকাতা মেট্রপলিটন কলেজে এট্রেন্স হইতে বি·এ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ২১ বৎসর বয়সে শিক্ষা শেষ করিয়া দুইবৎসর শিক্ষকতা করেন। তৎপরে পঞ্চাশ টাকা বেতনে আবগারীর সবইনস্পেক্টর হইতে পদোন্নতি ক্রমে বর্ত্তমানে ৩০০৲ টাকা বেতনে সুপারিন্টেডেন্ট

পদে উন্নীত হইয়াছেন। ইনি প্রথমে খুলনা এবং আলিপুরে কার্য্যারম্ভ করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। যথা—ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, মজঃফরপুর, মতিহারী, সারণ ছাপরা, রাঁচি,সিংভূম, চাঁইবাসা, বালেশ্বর, পুরুলিয়া, মানভূম। বর্ত্তমানে ইনি পুরীতে প্রায় এক বৎসর কার্য্য করিতেছেন।

ইনি যশোহরের বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত বৈরমপুর গ্রামে ৺যদুনাথ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার বর্ত্তমানে ২টি পুত্র ও ১টি কন্যা। ১ম পুত্র শ্রীমান্ বিভূতিভূষণের বয়স এক্ষণে ২৫ বৎসর। ইনি বিবাহিত। ইঁহার স্ত্রী কলিকাতা আমহার্ষ্ট-রো-স্থিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা। বিভূতিভূষণ এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, উপস্থিত কোন কাজকর্ম্ম আরম্ভ করেন নাই। ২য় পুত্র, শ্রীমান্ সত্যভূষণ, বয়ঃক্রম ১১ বৎসর-পাঠ্যাবস্থা। কন্যাটির বিবাহ হইয়াছে দত্তপুকুরের অন্তর্গত নিবাধুই গ্রামের শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দত্তের সহিত। ইঁহাদের ২টি পুত্র ২টি কন্যা। কার্ত্তিক বাবু ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দত্ত বি-এল,কলিকাতা কীর্ত্তি মিত্রের লেনে থাকেন। কার্ত্তিক বাবু আপিষে চাকরি করেন এবং গণেশবাবু আলিপুর কোর্টে ওকালতি করিতেন, এক্ষণে সন্তান জন্মস্থানের প্রতি অনুরাগ বশত নিবাধুই হাইস্কুলে হেডমাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ইস্কুলের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন।

চারুবাবু কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গায় একখানি বাসগৃহ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা আশা করি তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট জীবনে আপনার জন্মভূমি গৈপুর গ্রামের সুখ-দুঃখের কথা স্মরণ রাখিবেন।

গোবরডাঙ্গা-নিবাসী

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস—এক্ষণে পুরীধামে কোর্ট সব ইন্‌স্পেক্টরের পদে কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। ১২৭৮ সালে ভাদ্রমাসে গোবরডাঙ্গা অঞ্চলে প্রবল জলপ্লাবন-সময়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতামহ স্বর্গীয় হলধর দাস বিখ্যাত চিনির ব্যবসায়ী ছিলেন। আশুবাবু যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—"কুশদহের মধ্যে গোবরডাঙ্গা একটি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। এই গ্রাম একসময়ে চিনির ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চিনির কারখানা হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের সহস্রাধিক লোকের অন্নসংস্থান হইত। কালক্রমে এই চিনির ব্যবসায় একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই চিনির কারখানা প্রথম স্থাপন করিয়াছিলেন হলধর দাস।" ফলত আমরা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এখানে শতাধিক চিনির কারখানা ছিল, তন্মধ্যে ৺হলধর দাসের কারখানার চিনি প্রস্তুত-প্রণালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। গোলে "হ" মার্কা চিনি অন্য চিনি অপেক্ষা মণকরা আটআনা পর্য্যন্ত বেশী দরে বিক্রয় হইত। শেষে অনেকে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ইনি অশীতিপর বয়সে সংক্রামক বসন্তরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আশুবাবুর পিতা ৺রামকৃষ্ণ দাসও ঐ চিনির কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনিও ৩৩।৩৪ বৎসর বয়সে ঐ বসন্তরোগে পিতার সঙ্গেই দেহত্যাগ করেন।

আশুবাবু গ্রাম্যপাঠশালা হইতে গোবরডাঙ্গা হাইইস্কুল তৎপরে কিছুদিন মুর্শিদাবাদ, শেষে কলিকাতা জেনারল এসেম্ব্লিজ (এক্ষণে স্কটীস্ চার্চ্চ) হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন মাতা ঠাকুরাণীরও মৃত্যু হয়। তাহাতে তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। এই ঘটনাই তাঁহার শিক্ষা শেষের অন্তরায় কারণরূপে পরিণত হইল। যাহা হউক তৎপরে তিনি গৈপুর-নিবাসী পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রসিদ্ধ ৺সূর্য্যকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের সাহায্যে পোষ্টাফিস-সংক্রান্ত চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে গৈপুর বাটীতে তাঁহার আপিসে, পরে কালারোয়া, চাঁহড়ে অনধিক ৪ বৎসর কার্য্য করেন। কোনোকারণে ঐ বিভাগের কার্য্যে তাঁহার সুবিধা বোধ না হওয়ায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৭৲ টাকা বেতনে লোয়ারগ্রেডের রাইটার কনেষ্টবল পদে আলিপুরে কার্য্য প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৯৮ সালে এপ্রেল মাসে ১২৲ টাকা বেতনে হেড কনেষ্টবল্ হইয়া সমুদ্রপথে পুরীতে আসেন (তখন রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই)। সেসময় পুরীতে

বাঙালীর সংখ্যা খুব কম ছিল কুশদহের বেড়গুম্-নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ এবং ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেইসময় পুরী পুলিশ-বিভাগে কার্য্য করিতেছিলেন। আশুবাবুর সহিত তাঁহার প্রথমেই পরিচয় হয়। তৎপরে ১৮৯৯ সালে প্রতিযোগীতার পরীক্ষায় (তখন মনোনয়ন পদ্ধতি হয় নাই) উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বেতনে প্রবেশনার সাবইনস্পেক্টর-পদে নিযুক্ত হইয়া ভাগলপুর গমন করেন। ১৯০০ সালে তথায় পুলিশ ট্রেণিং ইস্কুলে একবৎসর শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে পাকা সবইনস্পেক্টর হইয়া পুনরায় পুরী সদরে আসেন। মধ্যে ছয় মাসের জন্য ১৯০৬ সালে একবার সম্বলপুর বদলী হন। তদ্ভিন্ন এ পর্য্যন্ত ক্রমশ পদোন্নতিক্রমে এই পুরীতেই যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে কোর্ট সাব ইন্-স্পেক্টর পদে ১৫০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইতেছেন।

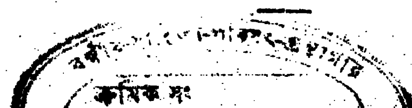
পিতা-পিতামহের মৃত্যুর পর ২১ বৎসর বয়সে গোবরডাঙ্গা সরকারবাড়ী নিবাসী ৺রামসাগর দাসের কন্যার সহিত আশুবাবুর বিবাহ হয়। রামসাগর দাস কর্ম্মশীল সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বিশ্বস্ততার সহিত স্বর্গীয় কালাচাঁদ কুণ্ডুর চিনির কারখানায় অংশীদার ছিলেন। আশু বাবুর ৪টি পুত্র, ৩টি কন্যা। ১ম পুত্র শ্রীমান্ জগন্নাথ বয়স ১৮ বৎসর; এবার রিপণ কলেজে ২য় বার্ষিকী আই-এস্‌সি পড়িতেছেন। ২য় পুত্র শ্রীমান বলরাম ১৫ বৎসরের। ৩য় শ্রীমান্ ভগবতীপ্রসন্ন ১২ বৎসরের। উভয়ে দেশের বাটীতে মাতার সহিত অবস্থিতি করিয়া গোবরডাঙ্গা ইস্কুলে পড়িতেছেন। ৪র্থ শ্রীমান্ শচীকান্ত ৩ বৎসরের শিশু। জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা এবং সন্তানবতী। আর ২টি কন্যা অবিবাহিতা।

আশুবাবু দীর্ঘকাল আত্মশক্তির উদ্‌বোধন করিয়া ৭৲ টাকা বেতনে রাইটার কনেষ্টবল হইতে ১৫০৲ টাকা বেতনে সাবইন্‌স্পেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি তিনি এখন এই কঠোর চাকুরী হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভের প্রয়াসী। কিন্তু সংসারের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম এখনো তাঁহার শেষ হয় নাই; ঈশ্বর কৃপায় তিনি পুত্রদিগকে যদি সদাচার এবং সৎশিক্ষা দিয়া যাইতে পারেন তাহাও যথেষ্ট। কিন্তু তাঁহার দেশ-জননী জন্মভূমিকে তিনি ভুলিতে পারেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে বিবিধ উপায়ে দেশের সেবা করিতে পারেন, সে ইচ্ছা—সে শক্তি তাঁহাতে আছে। তিনি গোবর-ডাঙ্গার পুরাতন বাসগৃহ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণের পরিচায়ক। * (ক্রমশঃ)

---

* গত অগ্রহায়ণ মাসে কাশীধামে আমার অবস্থিতি কালে তথায় সাতজন উৎসাহী কুশদহবাসীর উদ্‌যোগে একটি আনন্দ-সম্মিলনী সভায় দুইটি গুরুতর প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১ম, সমস্ত কুশদহবাসীর একটি তালিকা প্রস্তুত; ২য়, সমিতির একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপন। তদ্ভিন্ন মৎপ্রচারিত "কুশদহ"র শেষ ১৩২৫ সালে যে "কুশদহ-পঞ্জী" বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাও আমার সম্পাদন-কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় বন্ধ হইয়া গেল; জানি না এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আর কোনো নবীন সেবক প্রেরিত হইবেন কি না। এক্ষণে কাশীধামে অধিবেশনের প্রস্তাবদ্বয় সম্বন্ধে কলিকাতাস্থ সমিতির সভ্যগণ ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে আমাকেই নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমার জীবিতকালের মধ্যে আর আমার দ্বারা উহা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে উপস্থিত আমার নানাস্থান ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী কুশদহ-বাসীগণের একটি তালিকা প্রকাশ করা যাইতে পারে বলিয়া বোধ হয়। তাই ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া এইকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। "তাঁহার" করুণা এবং প্রবাসী কুশদহবাসী এবং তাঁহাদিগের আত্মীয়-স্বজন, দেশস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্য সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু,
পুরী ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।



"কুশদহ"র নিয়মাবলী

১। "কুশদহ"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ২।৶৹। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য তিন আনা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে বৈশাখ হইতে কাগজ লইতে হইবে। মূল্য "সম্পাদক, কুশদহ" এই নামে প্রেরিতব্য।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের শেষ তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে ও পত্রিকা-কার্য্যাধ্যক্ষকে জানানো আবশ্যক।

৩। রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৪। অমনোনীত রচনা ফেরত চাহিলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

৫। পুরাতন গ্রাহকগণ যে-কোনো পত্র লিখিবার সময় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৬। নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে গ্রাহকনম্বর সহ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৌঁছানো আবশ্যক।

'কুশদহ'র বিজ্ঞাপনের মূল্য

১। মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা—

পূর্ণ পৃষ্ঠা ১২৲। ½ পৃষ্ঠা ৭৲। ¼ পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা।

২। মলাটের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা—

পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲; ½ পৃষ্ঠা ৬৲; ¼ পৃষ্ঠা ৩৷৹ টাকা।

৩। বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা—

১ পৃষ্ঠা	৬৲ টাকা।
½ "	৩৷৹ টাকা।
¼ "	২৲ টাকা।

৪। বিজ্ঞাপনের ফর্ম্মার ১ম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা—

১ পৃষ্ঠা	৭৲ টাকা।
½ "	৪৲ টাকা।
¼ "	২৷৹ টাকা।

৫। উক্ত বিজ্ঞাপনের হার সমস্তই মাসিক।

৬। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৭। এক বৎসরের চুক্তিতে অগ্রিম টাকা জমা দিলে শতকরা ৫৲ টাকা কম লওয়া হয়।

৮। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

"কুশদহ"-কার্য্যাধ্যক্ষ
৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

—•—

আষাঢ়, ১৩২৮

Printed at the Carmichael Press, 179, Manicktola Street, by N. N. Mukerjee and published by him from 87, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

কুশদহ

মাসিক পত্রিকা

কুশদহ-সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত

—o—

কার্য্যালয়—৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বার্ষিক মুল্য সডাক ২৷৵০] [প্রতি সংখ্যা ৵০

সূচী

শ্রাবণ—১৩২৮

কাল অন্য দেশ তাহাদিগকে অতিক্রম করিল; পরন্ত অন্যত্র সেই জাগরণ সূচিত হইল। এমনিভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানবীয় শ্রেষ্ঠতা জাতিতে জাতিতে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু ইহার অন্যথ কেবল দেখিতে পাই ধর্ম্মবিষয়ে। মানুষ সেই প্রাচীনকালেই ধর্ম্ম লইয়া তাহার যতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিল আজ তাহার সবগুলিই একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া না গেলেও অধিকাংশই যে ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খৃষ্টধর্ম্মের সেই অটুট বন্ধন একেবারে আল্গা হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সেই অপার্থিব উপদেশ আজ অবহেলিত হইতেছে। আর্য্যজাতির আচারব্যবহার ও অলৌকিক আত্মতত্ত্ব এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য ভারতবর্ষের উপনিষদ-যুগের সেই ঋষি মহর্ষিরা ধর্ম্মকে যে উচ্চসুরে বাঁধিয়া গিয়াছেন তাহার আর তুলনা হয় না। গুহাহিত ধর্ম্মতত্ত্বকে তাঁহারা যতটুক্ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, মানুষের বাণী তাহাকে ইহারও অধিক কোনোদিন ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহাতে কি হইল? উপনিষদের বাণীকেই না-হয় ধর্ম্মজগতের পরম বাণী বলিয়া স্বীকার করিলাম, বর্ত্তমান যুগে ইহাকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্মকথা বলাও না-হয় অসম্ভব বলিয়াই মানিয়া লইলাম। তবুও উপনিষদের সেই পরম বাণীই কেন আজ আমাদের নিকট পুরাতন হইয়া আসিতেছে? যাহা পরম তাহাই তো চিরন্তন; এবং চিরন্তনই আবার চিরনবীন। তবে ধর্ম্মের এই চিরনবীন উৎসও কেন আজ আমাদের নিকট শুষ্ক বলিয়াই প্রতীত হইতেছে? এই ধরণীও তো একহিসাবে চিরন্তন; কিন্তু ইহা তো কোনোদিন আমাদের দৃষ্টিতে পুরাতন হইয়া আসিল না! প্রতিদিনই যদি ধরণীদেবী তাঁহার তরুণী মূর্ত্তিতে আমাদের দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করিয়া হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার না করিতেন, তবে কেমন করিয়া এই মৃত্তিকার স্তূপকে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এই সুদীর্ঘ পার্থিব জীবন কাটাইয়া দিতে পারিতাম! জীবন তো একটা যোগ একটা মিলন ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এই মিলনের মূলে আছে প্রীতি ও প্রেম। জীবন হইতে এই প্রীতি ও প্রেমকে মুছিয়া ফেল, তোমার জীবনের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে; মৃত্যু তোমার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইবে। তাই বার্দ্ধক্যে মানুষের নয়ন হইতে ধরণীর তারুণ্য যখন সরিয়া যায়, ধীরে ধীরে সেখানে জাগিয়া উঠে তাহার শ্রীহীন ধূলি-মলিন রুক্ষ মূর্ত্তি। তখন রুদ্ধ রোদনের বেদনাকে মন্থন করিয়া তাহার অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষা করুণ সুরে ফুটিয়া উঠে—"আবার কবে ধরণী হবে তরুণা।"

ধরিত্রীর তারুণ্যকে ফিরিয়া পাইবার এই যে মানুষের কাতর প্রার্থনা ইহা হইল তাহার নিজেরই জীবনভিক্ষা। জীবনপথের পুঁজি আজ তাহার ফুরাইয়া আসিয়াছে। সে তাহার তারুণ্যকে—জীবনসংগ্রামের প্রধান অস্ত্রটিকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই তাহারি অন্তরের এই দারুণ রিক্ততা আজ বিশ্বগ্রাসী মূর্ত্তি ধরিয়া দিকে দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন এই ধরণী হইতে—জীবন হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে।

আজ ধর্ম্মকথাও যে আমাদের নিকট পুরাতন হইয়া আসিয়াছে, বেদবেদান্তের লক্ষ লক্ষ আধ্যাত্মিক উক্তিকেও যে নিতান্ত রিক্ত বলিয়াই মনে হইতেছে, তাহাও কি এইরূপ ধর্ম্মজীবন হইতে আমাদের বিদায়সূচনা করিতেছে? ধর্ম্মের প্রতি এই যে বিরক্তি—এই যে আমাদের আকস্মিক ধর্ম্ম-বৈরাগ্য ইহার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার হইয়াছে।

ধর্ম্মের দুইটি দিক্ বা স্তর আছে। একটি উর্দ্ধের আর একটি নিম্নের। একটি অন্তর্ম্মুখীন আর একটি বহির্ম্মুখীন। ধর্ম্মের যে অংশটি বিবিধ নিষেধমূলক তাহাই হইতেছে ইহার বহির্ম্মুখীন স্তর। আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে এই স্তরে ফেলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের এই অংশটি প্রধানত ইহলোকের সঙ্গে সংবদ্ধ। ইহাতে মানুষের কি করা উচিত এবং কি অনুচিত তাহারই বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই বিধানগুলি অবশ্য সর্ব্বত্র সার্ব্বভৌমিক হয় নাই। জাতি বা সম্প্রদায়গত বিশেষত্বের ছাপ ইহার অধিকাংশ স্থলেই পড়িয়াছে। ইহা জানিয়া শুনিয়াই করা হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। তবে তখন যে ইহার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত! কেন তাহা বলিতেছি। একটি জাতি বা সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবার পক্ষে ধর্ম্মের শক্তি যে কত অধিক সহায় তাহা আমরা সকলেই জানি; কিন্তু শক্তির প্রেরণা মানুষ পায় প্রধানত

ধর্ম্মের নিম্নস্তর হইতে। ঊর্দ্ধস্তরে ইহার অস্তিত্ব আদৌ নাই বলিলেই হয়। ধর্ম্মকে মূল ভিত্তি করিয়া যখনই কোনো জাতি, সম্প্রদায় বা সঙ্ঘ প্রকাশ পায়, তখন তাহার স্বগত বৈশিষ্টের জন্য—অন্য হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া চিনিবার জন্য—সেই সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। এগুলি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ হইলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। একটি জাতিকে জীবন-সংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য তাহার বাঁচিয়া থাকার পক্ষে অনুকূল কতকগুলি আচার-ব্যবহার অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে; তবে তাহার জীবনে ধর্ম্মের উন্নততর প্রেরণা লাভের অবকাশ ঘটিবে। আধেয় আমার লক্ষ্য বটে; কিন্তু আধার না পাইলে তাহাকে রাখিব কোথায়? ধর্ম্মের উন্নততর প্রেরণালাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু আগে তো আমার জীবনটিকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সংগ্রাম চলিয়াছে, জাতিতে জাতিতে তাহা আরও তীব্রতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যক্তি যেমন ব্যক্তিকে গ্রাস করিতেছে; জাতিও তেমনি জাতিকে গ্রাস করিতেছে। এমনি করিয়া পৃথিবী হইতে কত জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। অতএব জাতিকে প্রথমে অন্যের আক্রমণ হইতে নিজকে ঠেকাইয়া রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এবং তাহার জন্য অনুকূল উপায়পদ্ধতি অনুসন্ধান করিয়া অবিলম্বে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। নিজের মঙ্গল-জনক আচার-পদ্ধতি বিধিব্যবস্থার বিশেষত্ববিশিষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া জগতের বক্ষে টিঁকিয়া থাকিতে হইবে! এইজন্যই একটা জাতির পক্ষে ধর্ম্মের অন্তর্ম্মুখীন অংশ অপেক্ষা তাহার বহির্ম্মুখীন অংশেরই দরকার বড় বেশী। ধর্ম্মের অন্তর্ম্মুখীন অংশ তুমি আয়ত্ত করিতে পারিতেছ কি না সমাজ তাহার অনুসন্ধানও করিবে না। সে কেবল দেখিতে চায় যে তুমি বহির্ম্মুখীন অংশটি ঠিক্ ঠিক্ মানিয়া চলিয়াছ কিনা। কারণ প্রধানত ইহারই উপরে সমাজস্থিতি নির্ভর করিতেছে। সমাজের বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে যদি একটি লোকও ধর্ম্মের অন্তর্ম্মুখীন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, তবে তাহাও পরম গৌরবের বিষয়। কিন্তু ইহাতে সমাজের কোনই লাভ নাই। কারণ সমাজ-তরুর ইহা ফুল কিন্তু মূল নহে। সমাজের ইহা পাইবার কথা বটে, কিন্তু গড়িবার উপকরণ নহে। কারণ এক-রকমের একজন বা পাঁচরকমের পাঁচজনকে লইয়া তো সমাজ দাঁড়াইতে পারে না। তাহাকে দাঁড়াইতে হইলে পাঁচজনকে একছাঁচে ঢালাই করিয়া লইতে হয়। এবং সেই ছাঁচই হইতেছে ধর্ম্মের বহির্ম্মুখীন অংশ। কারণ তাহারই চাপে কতকগুলি মনুষ্য একইপ্রকার আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্যে জমাট বাঁধিয়া উঠে। অবশ্য বহির্জ্জগতের মত অন্তর্জ্জগতে সাদৃশ্য পদার্থটি একান্ত দুর্লভ হইলেও একেবারে অপ্রাপ্য নহে। কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোনো জাতি বা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ এখানে বাহিরের চাপ না থাকায় সমস্তই অন্তরের প্রেরণায় হয় বলিয়া সেই সাদৃশ্যের মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র্যের ভাব, ব্যক্তিত্বের ছাপ লাগিয়া থাকে। একইজাতীয় কতকগুলি চারাগাছকে একসঙ্গেই পুঁতিয়া দিলেও যদি তাহাদিগকে মালীর ছুরির আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে আপনার শক্তিতে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠিলেও ঠিক্ কেয়ারী-করা গাছের মত হয় না। এইজন্যই বোধ হয় আমাদের দেশে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" প্রবাদটি প্রচলিত হইয়াছে। যাহাহউক সমাজকে প্রধানত ধর্ম্মের বহির্ম্মুখীন অংশ লইয়াই কারবার চালাইতে হয়; অন্তর্ম্মুখীন অংশের সহিত তাহার বড় যোগ নাই। উহা নিতান্তই ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়।

কেবল মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িলেই লোকে ধার্ম্মিক হয় না। হিতোপদেশের সেই কঙ্কণলোভী পথিকের যেরূপ ভয়ানক অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা সকলেই যেন এখন একটু সাবধান হইয়া চলিতেছি। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, ধার্ম্মিকের সহবাস প্রভৃতিকে কখন কখন ধর্ম্মের উচ্চতর প্রেরণালাভের অবান্তর কারণরূপে পাইলেও ইহারা যে উহার মুখ্য কারণ নহে, তাহা সকলদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রকারই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষত আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা দৃষ্টান্তের সহিত এ-বিষয়টিকে বেশ সরল করিয়া বোঝানো হইয়াছে।

এইজন্যই না উপনিষদের ঋষি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

তবে কোন্ উপায়ে আত্মাকে—মনুষ্যজীবনের উন্নততম প্রেরণাকে লাভ করিব? ঋষির অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। তিনি এক আশ্চর্য্য উত্তর দিতেছেন,—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"

তোমাকে কোনো উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে না। তোমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। যখন তিনি তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া বরণ করিয়া লইবেন, তখনই তুমি তাঁহাকে পাইবে; তাহার পূর্ব্বে নহে। বুদ্ধিজীবী মানুষ আমরা— আমাদের নিকট এ-উত্তর যে আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হইবে তাহা তো নিঃসন্দেহ। তিনি আমাদের বরণ করিয়া লইবেন, কিন্তু তাহার জন্য কি আমাদের কোনো যোগ্যতা অর্জ্জনের দরকার নাই? তবে কি ইহা নিতান্তই একটা সঙ্গতিহীন খেয়াল? যখন দেখি একজন মানুষ জ্ঞানে-গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া জীবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তবুও সেই ঊর্দ্ধলোকের আলোক তাহার মধ্যে এতটুকু নামিয়া আসে নাই। অথচ একজন নিরক্ষর বালকের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার ইহাতে একেবারে আলো হইয়া উঠিয়াছে। যখন দেখি গুরু ও শিষ্য উভয়েই বরণপ্রার্থী শিষ্যকেই গ্রহণ করিলেন। যখন দেখি আজন্ম সদাচার ও সদনুষ্ঠান করিয়াও কেহ হয় তো তাঁহার নিকট হইতে একটুও আনন্দ পাইল না, অথচ একজন ব্যভিচারী অনুতপ্ত হইয়া একটিবার তাঁহাকে ডাকিতেই তিনি আসিয়াই তাহাকে বরণ করিলেন, তখন বুদ্ধিজালে ছাঁকিয়া সত্যই আমরা ইহার মধ্যে অসঙ্গতি ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু বাহিরের দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা অসঙ্গতি বলিতেছি ইহা অপেক্ষা তাহার অন্য কোনো সঙ্গত উত্তর আছে কি?

এতক্ষণে আমরা দেখিতে পাইলাম ধর্ম্মের এই বহির্ম্মুখীন অংশটি সমাজ-জীবনের পক্ষে কত দরকারী। সমাজে বা জীবনে যাহার প্রয়োজন রহিয়াছে তাহার প্রতি তো অবহেলা আসিতে পারে না। ইহা যে জীবপ্রকৃতির নিতান্তই বিরুদ্ধ। প্রকৃতির এই বিরুদ্ধাচরণ যে মৃত্যুকেই বরণ করিয়া আনে। এইজন্যই যোগশাস্ত্রে স্বভাব-বিপর্য্যয়কেই মৃত্যুর অগ্রদূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে কি মানুষ আজ তাহার জীবনের প্রয়োজনকে অবহেলা করিয়া অকালে মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনিতেছে? চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় জাতিগঠন বা সমাজস্থিতির জন্য প্রাচীনকালে ধর্ম্মের বহির্ম্মুখীন অঙ্গের যত বেশী দরকার হইত এখন আর তত হইতেছে না। বর্ত্তমান সমুন্নত রাষ্ট্রশক্তি ধর্ম্মের এই বহির্ম্মুখীন অংশের প্রয়োজন অনেকটা সমাধান করিয়া লইতেছে। এই জন্যই রাষ্ট্রশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে আইন আদালত প্রভৃতি নব নব প্রতিষ্ঠান। ইহারাই আজকাল সমাজস্থিতি বজায় রাখিবার কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজকে উন্নতি বা অবনতির পথে লইয়া চলিয়াছে, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। তবে ইহাতে যে সমাজের বহির্ম্মুখীন ধর্ম্ম-বন্ধন, আচারপদ্ধতি শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে ইহা যেমন সত্য তেমনই স্বাভাবিক। কারণ নদীর যে জলস্রোত তাহার স্বাভাবিক গতিপথ ধরিয়া সমুদ্রে পড়িতেছিল, তাহাকে যদি একটা কৃত্রিম পথে পরিচালিত করা হয়, তবে যেমন উহার পূর্ব্বপথ ক্রমে ক্রমে মজিয়া আসে এবং কালে একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়, ইহাও কতকটা সেইরূপ রাষ্ট্রশক্তি যেখানে স্বাধীন সেই প্রতীচ্য সমাজ জাতিগত বা সমাজগত প্রয়োজন নিষ্পত্তির এই প্রাচীন পথ বোধ হয় একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্যের রাষ্ট্রশক্তি সর্ব্বত্র সমুন্নত ও স্বাধীন নয় বলিয়া এখনকার এই পথ বুজিয়া আসিলেও আজিও বন্ধ হইয়া যায় নাই। কাজেই মনে হইতেছে; জীবনে যাহার প্রয়োজন আছে কার্য্যত তাহাকে আমরা অবহেলা করি নাই—করিতে পারিও না। তবে সেই প্রয়োজন পূর্ব্বে যে উপায়ে সিদ্ধ হইত এখন তাহার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। অবশ্য এই পরিবর্ত্তনেরও যে ভালমন্দ একটা ফল আছে ইহা স্বীকার করিতেই হয়। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যে-কোনো খাদ্য গ্রহণ করিয়া তাহার ক্ষুধাকে শান্ত করিতে পারে, আপাত প্রয়োজন নিষ্পত্তির পক্ষে ইহাতে কোনো বাধা ঘটে না; কিন্তু সুখে ও শান্তিতে স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকিতে চাহিলে সঙ্গে সঙ্গে একটু বিবেচনার দরকার আছে।

এখন ধর্ম্মের অন্তর্ম্মুখীন অঙ্গের সহিত আমাদের বর্ত্তমান জীবন-ধারার কতটুকু যোগ আছে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এই অন্তর্ম্মুখীন ধর্ম্ম যে নিতান্তই ব্যক্তিগত ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য মানবাত্মার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের পথ ধরিয়া নিত্যকাল ফুটিয়া উঠিতেছে এই অন্তর্ম্মুখীন ধর্ম্মে। কাজেই ইহার সহিত জাতি বা সম্প্রদায়ের কোনো সম্বন্ধ নাই। ইহা কেবল ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়। কিন্তু ব্যক্তিগত হইলেও ইহা সার্ব্বভৌম। জাতি, সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের ছাপ ইহাতে পড়ে না। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাহাদের প্রবর্ত্তকের জীবনের এই অন্তর্ম্মুখীন সাধনাটাকে নিজেদের মধ্যে ঠিক্ আয়ত্ত করাইতে পারিতেছেন না। পদে-পদেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। ধর্ম্মের বহির্ম্মুখীন অঙ্গ সমাজ গড়িয়া উঠিবার প্রধান সাধন বলিয়া মানুষের সামাজিক জীবনে ইহা যেমন ব্যাপকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই অন্তর্ম্মুখীন অঙ্গ তেমন উঠে নাই। উন্নততর প্রয়োজনের বোধ সকলের জীবনে সাধারণত ঘটে না। ইহা ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে কদাচিৎ প্রকাশ পায়। সকল মানুষেরই ইহা সাধ্য; নিজস্ব সাধনা দ্বারা একদিন ইহাকেই সকলের পাইতে হইবে; নচেৎ জীবনের সার্থকতা ঘটিবে না—জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু যতদিন না সেই আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, অভাব অনুভূত হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাতে অনুরাগের আশা করিতে পারি না। দেখা যায় মানুষের হৃদয়ের কতকগুলি বৃত্তি কালকে অপেক্ষা করিয়া উদ্বুদ্ধ হয়; এবং সেই বৃত্তিগুলি উদ্বুদ্ধ না হইলে মানুষ তাহার আলোচনায় প্রীতি অনুভব করে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হিতোপদেশ বা ঈসপস্ কেবল (Esop's Fable) পড়িতেই ভালবাসে, কালিদাসের "শকুন্তলা" বা সেক্সপীয়ারের "রোমিও জুলিয়েট" তাহাদের ভাল লাগে না। ইহাও কতকটা তাই। জীবন-সংগ্রাম চালাইবার জন্য আমাদের যে মনোভাব-গুলি অনুকূল, প্রকৃতির প্রেরণায় তাহাদের উদ্বোধনের যেমন কালের বা অন্য কিছুর দিক্ দিয়া একটা সঙ্কেত খুঁজিয়া পাই, এখানে তাহা পাই বলিয়া মনে হয় না। আমার কাম, ক্রোধ, লোভ; আমার আশা, ভয়, সংশয়; আমার ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ—সকলই আমার জীবনযাত্রার অনুকূল হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট কারণে জাগরণ লাভ করে দেখিতে পাই। কিন্তু ধর্ম্মের এই অন্তর্ম্মুখীন অংশের উচ্চতর প্রেরণা যে কখন কাহাকে অপেক্ষা করিয়া জীবনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে তাহার ঠিক্ নির্দ্দেশটি খুঁজিয়া পাই না।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা পাইলাম এই যে, ধর্ম্মের এই অন্তর্ম্মুখীন অঙ্গের অভাবে সমাজ-জীবনের মুখ্যত কোনো ক্ষতি না হইলেও ব্যক্তির জীবন ইহার অভাবে অপূর্ণই থাকিয়া যায়। আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে ইহা বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু কবে কোন্ কারণটিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে উহা অঙ্কুরিত মঞ্জুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে তাহার কোনো যথার্থ নির্দ্দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্তর্দেবতার জাগরণ কোনো বাহিরের ব্যবহার দ্বারা নিয়মিত নয়। কিন্তু তাহা হইলেও বাহির হইতে যে অসংখ্য ডাক আসিতেছে মানব-হৃদয় হইতে তাহার সকলগুলিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না। এই বৈষম্যের কারণ কি তাহা আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হইবে। কারণ ইহার উপর আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসা অনেকটা নির্ভর করিতেছে। একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। গোড়াতেই বলিয়াছি এখন ধর্ম্মকথা অপেক্ষা কাব্য-কথা আমাদের অধিক ভাল লাগে; কিন্তু কেন ভাল লাগে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলিবেন যে, কাব্য সরস আর ধর্ম্ম নীরস বলিয়াই এরূপ বৈষম্য ঘটিতেছে। উত্তর অবশ্য ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু আমাদিগকে ঐ সরস ও নীরস কথাদুইটিকে আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে। "রস" কি আগে বুঝিলেই সরস-নীরস বুঝিতে পারিব। অবশ্য এই 'রস' শব্দটির অর্থনির্ণয়ে নানা আলঙ্কারিক জটিল ভাব সৃষ্ট হইয়াছে; সে-সমস্তের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিবার দরকার নাই। 'রস' শব্দের সেই সঙ্কীর্ণ অর্থের প্রয়োজন এখানে নাই। সহজভাবে এইটুকু বুঝিলেই হইল যে, এই রস হইতেছে জীবনেরই রস—আমাদেরই বিচিত্র অনুভূতিময়ী প্রাণশক্তি। তাই মানুষ প্রাণের টানে যাহা-কিছু গড়িয়া তুলে তাহাই

সুন্দর ও সরস হইয়াই প্রকাশ পায়—তা সে সাহিত্যেই হউক বা শিল্পেই হউক। তবে এই অনুভূতি বা প্রাণের টান সকলের সমান থাকে না। এই বিপুল জন-সঙ্ঘের মধ্যে যে-কয়েকজন লোক সেই দিব্যশক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের সকলের শক্তি আবার একই ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না। কেহ ইহাকে বিকশিত করিয়া তুলেন জগতের স্থূল বস্তুময় অংশে কেহ-বা সূক্ষ্ম বাঙ্ময়ে। আমাদের মত সাধারণ লোকের এই প্রাণের টান বা অনুভূতি-শক্তি বড় অস্পষ্ট। তাই আমরা জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম কোনো অংশেই বড় কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি না। কিন্তু তবুও আমরা যখন কোনো অনুভূতিসম্পন্ন লোকের প্রভাবে আসি তখন আমাদের হৃদয়ের সেই অস্পষ্ট অনুভূতিগুলি কেমন সুস্পষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠে। মনে করা যাক্ আমি এক জন বড় কবির কোনো একখানা ভাল কাব্য পড়িতেছি। একেবারে মুগ্ধ তন্ময় হইয়াই পড়িতেছি। পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছে যেন আমারই হৃদয়ের যুগযুগান্তের মানসী সুন্দরী—এই অনুভূতিগুলি আজ কবির কোন সোনার কাঠির স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। একটি ছোট ছেলে আয়নায় যেমন নিজেকে দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া যায়, আমিও তেমনি কাব্যের মধ্যে আমারই হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। আমি যেন আমার হারাইয়া-যাওয়া অনুভূতিগুলিকে আবার ফিরিয়া পাইতেছি।

এই হারাণোকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দই আমার কাব্য পাঠের আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দ তো কেবল কাব্যেরই নিজস্ব সম্পত্তি নয়। প্রাণের তারে তো কেবল কাব্য-রাগিণীই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে না। যদি কেহ ধর্ম্মকে তাঁহার জীবনের রসে সিক্ত করিয়া তুলেন, অনুভূতি দিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, প্রাণের তারে তাহাকে বাজাইয়া তুলিতে পারেন, তবে ধর্ম্ম আর তাঁহার নিকট শুষ্ক নীরস তত্ত্বকথা বলিয়া মনে হইবে না। ধর্ম্ম তখন তাঁহার জীবনের সহিত যুক্ত হইয়া তাহারই রসধারায় সিঞ্চিত হইয়া অঙ্কুরিত মঞ্জুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। তাহারি পত্র-পুষ্পের স্নিগ্ধ ছায়া ও মুগ্ধ গন্ধ তাঁহার জীবনে যুগপৎ শান্তি ও প্রীতি বহন করিয়া আনিবে। তাঁহার কণ্ঠে তখন যে মধুর বাণী ফুটিয়া উঠিবে, তাহা জগদ্‌হৃদয়ের প্রীতিকেই জাগাইয়া তুলিবে। এইজন্যই দেখিতে পাই, কোথাও যখন একজন ধর্ম্মাত্মার আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহার চারিপাশের জনসঙ্ঘের মধ্যে ধর্ম্ম আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। আপন জীবনে উপলব্ধ সেই ধর্ম্মকে তিনি যখন ভাষায় ও ভাবে ব্যক্ত করিতে থাকেন, তখন তাহা কাব্য অপেক্ষাও মধুর বলিয়া মনে হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, একজন যথার্থ ধার্ম্মিকের আবির্ভাব জগতে বড়ই দুর্লভ। তাই যখন একজন ধার্ম্মিকের আসন শূন্য হইয়া পড়ে, তখন সবসময়ে তাহাতে উপযুক্ত অধিকারীর স্থান হওয়া সম্ভব হয় না। এইরূপে ধর্ম্ম আবার জীবন হইতে বিমুক্ত হইয়া শুষ্ক শাস্ত্রবাণীতে পরিণত হয়। যুগে যুগে এমনইভাবে এই ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কখন উত্থান, কখন পতন, কখন সুপ্তি, কখন জাগরণ, ইহাই জগতগতি—আজ নূতন কিছুই হয় নাই। তবে প্রাচীনের সহিত বর্ত্তমানের তুলনায় শুধু এইটুকু প্রভেদ আজ আমাদের চোখে পড়িতেছে যে, তখনকার দিনে ধর্ম্মের অন্তর ও বাহির দুইটি স্তর লইয়াই তাজ্জব কারবার চলিত; কিন্তু বর্ত্তমানে শুধু অন্তরকে লইয়াই কারবার চালাইতে হইবে। এবং এইজন্যই মনে হইতেছে পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম যেন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মের এই অন্তর্ম্মুখীন স্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি-বিশেষের উন্নত জীবনে কদাচিৎ ফুটিয়া উঠে। ঋষির কণ্ঠ হইতে তাই বাহির হইয়াছে, "শ্রবণায়াপি বহুর্ভির্যোন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবোযন্নবিদ্যুঃ" প্রথমত ইহা অনেকে শুনিতেই চায় না। দ্বিতীয়ত শুনিয়াও অনেকে ইহা বুঝিতে পারেন না, তাই ধর্ম্মের এই অন্তর্ম্মুখীন স্তরের দীনতা চির-কালই সমান। আজিও যেমন সত্যযুগেও তেমনি। তবে তখনকার দিনে এই দীনতাকে ধর্ম্মের বহির্ম্মুখীন স্বচ্ছলতা দিয়া ঢাকিয়া রাখা চলিত; কিন্তু এখন আর তাহা চলে না। এখন এই অংশটি ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া রাষ্ট্রশক্তির হাতে গিয়া পড়িতেছে। তাই সে নিরাকরণ-রিক্ততা আমাদের চক্ষে বড় বাজিতেছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী—বেদান্তরত্ন।

———

শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিদ্যালয় দুঃখের আগারস্বরূপ হইয়াছে। দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অর্দ্ধভুক্ত বা অপর্য্যাপ্ত ভোজন করিয়া হাজির হইতে হইবে, ফটকে দ্বারবান দ্বার রুদ্ধ করিয়া পাহারা দিতেছে—ক্লাসে শিক্ষক নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন, কখনও বা বেত্রহস্তে প্রহার করিতেছেন—ইহাই শিক্ষার আগার! কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা একজন বালককে নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছিলাম, ইহা হইতে বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগ জানা যাইবে :—

ভোর না হতে পাখীরা জোটে,
গানের চোটে ঘুমটি ছোটে।
চোখটি খোলো গাত্র তোলো
আরে মলো সকাল হলো।
হায় কি দশা প'ড়্‌তে বসা
অঙ্ক কসা কলম ঘসা।
দশটা হ'ল হট্টগোলে
দৌড়ে চলে বই-বগলে।
স্কুলে পড়া বিষম তাড়া
কানটি নাড়া বেঞ্চে দাঁড়া।
বেত্র নাচে নাকের কাছে
মরে কি বাঁচে সাম্‌নে পাছে।
খেলতে যে চায় খেলতে কি পায়?
বৈকালে হায় সময় কি পায়
খেলবো কি ছাই সন্ধ্যাবেলায়।
খেলাটি ক্রমে যেমনি জমে,
দখিনে বামে সন্ধ্যা নামে।
ভাংলো খেলা সাধের মেলা
আবার ঠেলা সন্ধ্যাবেলা।
মুখটি হাঁড়ি তাড়াতাড়ি
যাচ্ছে সবাই যে-যার বাড়ী।
ঘুমের ঝোঁকে ঝাপসা চোখে
ক্ষীণালোকে অঙ্ক টোকে।
ছুটী পাবার সুযোগ আবার
আর রবিবার হপ্তা কাবার॥

শিশুশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শরীরগঠন। বাঙালী ছেলেরা যে সবল হইতে পায় না, বর্ত্তমান ভ্রান্ত শিক্ষাপ্রণালী তাহার জন্য দায়ী। অন্ধকার ঘরে বসিয়া একরাশি পুস্তকের বোঝা ঘাড়ে করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য পাঠ মুখস্থ করা ভিন্ন তাহারা কিছুই শেখে না। ইহাতে যে তাহাদের শরীর ও মন কতদূর নষ্ট হয় তাহা সকলেই জানেন। ৮।১০ বৎসরের ছেলেরা পর্য্যন্ত চশমা লইতেছে। বেত্রাঘাতরূপ অত্যাচার বালকগণের কেবল কষ্টের কারণ হয় না, ইহা দ্বারা তাহাদের পৌরুষ ও আত্মমর্য্যাদা নষ্ট হয় এবং তাহারা মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা করে।

আমরা Ethnology বা নৃতত্ত্ব পড়ি। কিন্তু আমাদের গৃহের দ্বারে কৈবর্ত্ত বাগ্দি হাড়ি ডোম প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় লোক রহিয়াছে; তাহাদের যথার্থ পরিচয় পাইবার জন্য অথবা তাহাদের সহিত মিশিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা নাই। শিক্ষার সহিত ব্যবহারের কোনরূপ মিল না থাকায় বিজ্ঞানের উচ্চ উপাধিকারী বা ন্যায়শাস্ত্রের সুপণ্ডিতগণকেও অল্পবিস্তর কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষাদ্বারা যদি মন উন্নত উদারই না হইল, তবে সে শিক্ষায় লাভ কি?

কিছুদিন পূর্ব্বে খাটুরা ইস্কুল পরিদর্শন কালে ডেপুটি বাবু একটি ছেলেকে তাহার পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহা বলিতে পারে নাই। অথচ গৃহে যাইয়া সে ইংলণ্ডদেশের রাজাদের নাম মনে রাখিবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছিল! বিদেশের সমাজ, বিদেশের ইতিহাস আমাদের নহে,—আমরা যেন বিদেশের কেবল নকলই না করি। বিদ্যালয়ের টেবিল চেয়ার আমাদের গৃহে নাই, বিদ্যালয় বা ছাত্রনিবাসের প্রাসাদ বা বৈদ্যুতিক পাখা ও আলো ছাড়িয়া যখন ছুটীর দিনে আমরা গ্রামের নির্জ্জনতার মধ্যে ফিরিয়া যাই, তখন মনে হয় দূর ছাই এসব সহরের বিলাসিতা ও কৃত্রিমতা—সেসব তখন আমাদের ভাল লাগে না,—গৃহ-বাতায়ন হইতে মৃত্তিকানির্ম্মিত সন্ধ্যা-প্রদীপটি দেখিতে পাই, তাহারই স্নিগ্ধ আলোকে চক্ষু জুড়াই—বৈদ্যুতিক পাখার পরিবর্ত্তে প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে শান্তি পাই।

আমাদের আবার পুরাকালের তপোবনের দিকে ফিরিয়া দেখিতে হইবে। অধ্যয়নকালে গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য্যসাধনকে সাধনার অঙ্গ করিতে হইবে। নীল আকাশ, খোলা বাতাস, নির্ম্মল জলাশয়, সুরম্য বৃক্ষলতা যে টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক, বাক্স, বেঞ্চ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ ও আবশ্যক তাহা ধারণা করিতে হইবে। প্রভাতের প্রথম অরুণালোকের সহিত বিশুদ্ধস্বভাব বালকগণ সরলমনে ভগবানের স্তবগান করিতেছে,—এ দৃশ্য কত সুন্দর কত মহান্! প্রকৃতির সহিত পরিচয় করিতে হইবে। আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইলে লোকালয় হইতে দূরে উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে বৃক্ষের ছায়াতলে শিক্ষার আয়োজন করুন। সহৃদয় শিক্ষক সেখানে গুরুর আসন গ্রহণ করিবেন। শিক্ষক মনে রাখিবেন যে, জীবনধারণের জন্য পারিশ্রমিক লইতে বাধ্য হইলেও, প্রীতির সহিত আপন জীবনের আদর্শ দেখাইয়া ছেলেদের মধ্যে মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায়তা তাঁহাকে করিতেই হইবে। কেহ কেহ হয় তো আপত্তি করবেন যে ছেলেদের দূরে বিদেশে পাঠাইয়া নিশ্চিন্তমনে থাকা যায় না এবং খরচও অধিক লাগে। তাঁহারা চান বাড়ীর কাছে একটা ইস্কুল এবং বড়জোর একজন গৃহশিক্ষক। কিন্তু বাড়ীর হাওয়া তো সবসময় শিক্ষার অনুকূল হয় না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, বড়লোকের সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া বড়মানুষী শিখিতে থাকে। অভিভাবকগণের শিক্ষাদান সম্বন্ধে অক্ষমতা, তাঁহাদের বিলাসিতা ও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, রাজনৈতিক গোলমাল প্রভৃতি বালকগণের শিক্ষার বিরোধী। সহরে প্রলোভনও কম নহে। নির্জ্জন স্থানে শিক্ষকগণ জ্ঞানের চর্চ্চায় বিভোর, ছাত্রগণও ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া শরীর সুস্থ, চরিত্র দৃঢ়, ইন্দ্রিয় সবল, ঈশ্বরভক্তি ও স্বদেশপ্রীতি সহজে শিক্ষালাভ করিবে। মুক্ত বায়ুতে শিক্ষার ফলে ছেলেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। যক্ষ্মারোগ হইতে পারিবে না—চোখ্ কান্ খোলা রাখিয়া তাহারা নিজেরাই প্রকৃতির রহস্য বুঝিতে পারিবে। বৃষ্টি কেমন করিয়া হয়, রামধনু কেমন করিয়া উঠে, গাছ হইতে পাকা আম পড়ে কেন, পূর্ণিমাতে চাঁদ কেন বড় দেখায়, এই ভাবের নানারকম প্রাকৃতিক তত্ত্ব আনন্দের সহিত শিখিতে পারিবে। আমাদের দেশে উদ্ভিদবিদ্যা শিখিবার এত উপাদান আছে, যাহা অন্য দেশে নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে বিলাতে শিক্ষার জন্য একটি ফুল কিনিতে তাঁহাকে দুইটাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া বিজ্ঞানরীডারের ছবি দেখিয়া পাঠ মুখস্থ করিলে ফল হইবে না। বাগানে বা ক্ষেতে যাও, সেখানে যাহা শিখিবে, চিরদিনের মত তাহা হৃদয়ে গাঁথিয়া যাইবে। আমরা কলিকাতার কলেজের বিজ্ঞানাগারে অনুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে উদ্ভিদের সূক্ষ্ম অবয়ব দেখিয়া মুগ্ধ হই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উপাধি লাভ করি,—কিন্তু জানি না দেশে কতরকম ধান হয়, কোন্ সময়ে কোন্ ফুল ফল হয়। গাছ ফুল ফল পাতা লতা চিনি না—সামান্য নিরক্ষর কৃষকবালক যাহা জানে আমরা তাহাও শিখি না। ছেলেবেলা হইতে যদি পাতাসংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া হাতে-কলমে উদ্ভিদ-তত্ত্ব শিখি, পরে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করি, তবেই আমাদের শিক্ষা কাজের হয় এবং দেশের উপকারে আসিতে পারে। সেইরকম প্রাণীতত্ত্ব। গ্রামের ছায়ায় ঢাকা মাঠে ঘাটে কত পাখী মধুর গান করিতেছে—নদী পুষ্করিণীতে কতরকম মাছ খেলা করিতেছে—কেমন করিয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়—গবাদি পশু যাহা আমাদের কত উপকারে লাগিতেছে তাহাদের লালন-পালন ও উন্নতির চেষ্টা করিলে খাঁটি দুগ্ধ ও ঘৃত খাইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে পারিবে। হাঁস গোরু প্রভৃতি পশুপক্ষীপালন মধুমক্ষিকাপালন, শাক্‌সবজী তরকারী উৎপাদন, চাটনী, মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ সমস্তই শিখিতে হইবে। যাহারা গ্রামে থাকে তাহারা মধ্যে মধ্যে আত্মীয়স্বজনের সহিত কলিকাতায় আসিয়া আলিপুরের চিড়িয়াখানা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন যাদুঘর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া নূতন নূতন আমোদ ও জ্ঞান সঞ্চয় করিবে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বিদ্যালয় হইতে ছেলেদের কৃষিসম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করা আবশ্যক। বিদ্যালয়ের সঙ্গে চাষের জমি রাখিতে হইবে। সেখানে আহার্য্যদ্রব্য যথাসম্ভব জন্মিবে। তাহারা বাগান তৈয়ারী করিতে শিখিবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে, আবশ্যক

হইলে মাটি কাটিবে। প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের কাজেরও শিক্ষা হওয়া চাই।

ঘরের বদ্ধ বাতাস ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে যেমন প্রকৃতির মুক্ত বায়ুতে বাস স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক, মনুষ্যত্বলাভ এবং জ্ঞানার্জ্জনের হিসাবেও বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ছাড়া স্বাধীন পাঠ আবশ্যক। বাংলাভাষার দৈন্য আর নাই। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, জ্যোতিষতত্ত্ব, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, ললিতকলা, আখ্যায়িকা, কাহিনী প্রভৃতি বিষয়ে আজকাল সরলভাষায় এত সুন্দর সুন্দর বই বাহির হইয়াছে যে, সকলের পক্ষেই প্রাথমিক শিক্ষা এবং কিয়দংশ উচ্চশিক্ষালাভ কেবলমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রস্তাব উঠিয়াছে যে, ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ে পরীক্ষার উত্তর বাংলাভাষাতে লিখিলেও গ্রাহ্য হইবে। আজকাল এম-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলাভাষায় গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং বাংলাভাষার সাহায্যে আমাদের শিক্ষাকার্য্য যে চলিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজী না শিখিয়াও যে শিক্ষালাভ হয় ইহা ভুলিলে চলিবে না। বিশেষত যেসকল বালিকার ১২।১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া যাইবে বা যাহাদের উচ্চশিক্ষালাভের সুবিধা বা সুযোগ নাই, তাহারা শিক্ষারম্ভের কয়েক বৎসরের মধ্যে যে ইংরাজীতে শুদ্ধরূপে কথা বলিতে বা চিঠি লিখিতে সক্ষম হইবে তাহা নহে। এইরূপে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া এবং অকারণে বুদ্ধিবৃত্তিকে ভারগ্রস্ত করিয়া কোনো লাভ নাই বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই আছে — ইংরাজী বা বাংলা কোনোটাই ভাল করিয়া শিক্ষা হইয়া উঠে না। তাহার পরিবর্ত্তে যদি বাংলাতে রচনা লিখিতে, সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে ও সরল বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে তাহাতে জীবনসংগ্রামের জন্য যথেষ্ট বললাভ করিতে পারিবে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির কমিটি ও নিয়ম দস্তুরমত থাকিতে পারে, টাকাও থাকিতে পারে, কিন্তু ভাবের দৈন্য থাকায় উদ্দেশ্যসাধন হইতেছে না। দেশের এখন অনেক অভাব আছে, যাহাতে তার পূরণ হয় সকলে মিলিয়া তাহাই করিতে হইবে।

আমাদের নানারকম অভাব অভিযোগ আছে। তাহা নিবারণের একমাত্র উপায় সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার বিস্তার (mass education)। মহাত্মা গোখেল্ ভারতবাসীগণের চক্ষুদান করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সমগ্রদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রচলনের জন্য অনেকবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। বরোদা প্রভৃতি ভারতীয় করদরাজ্যগুলিতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে—তাহাতে কোনো ভয়ের কারণ উপস্থিত হয় নাই। সেখানে সকলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া আপনাপন পুরাতন কাজই করিতেছে। দেশের শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে বা ভৃত্য না পাওয়া সম্বন্ধে কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। আর আমাদের সুসভ্য গভর্ণমেণ্ট তাহা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই! কিন্তু তজ্জন্য কি আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য? অভাব আমাদের, আবশ্যক আমাদের, অজ্ঞ আমরা, অভাব-মোচন আমাদিগকে করিতে হইবে, আমরাই দায়ী।

দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের উপায় কি? কাজটি সহজ নহে। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমিতে রত্নের অভাব নাই, অভাব কেবলমাত্র সংগ্রাহকের। দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোগী কর্ম্মীর প্রয়োজন। যেদেশে নিরক্ষরতা অতুলনীয়, সেই দেশকে দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত করিতে হইলে মাঠে ঘাটে গাছের তলায় ভগ্নকুটীরে হাজার হাজার ইস্কুল চাই। আর চাই হাজার হাজার জাগ্রত পুরুষ ও নারী-শিক্ষক। একজন স্বার্থত্যাগী যুবককে শিক্ষাবিস্তারের জন্য গাছের তলায় বসিতে দেখিলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হইবে। একজন রামমোহন, একজন বিদ্যাসাগর, একজন বিবেকানন্দ, একজন গোখেল্ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেশে কি অসাধ্যসাধন করিয়া গিয়াছেন। যাহাদের প্রাণে ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেম ও উৎসাহ আছে, একাজ তাহাদেরই উপযুক্ত। আমাদের দেশে কি মানুষ আছে? যদি থাকে এস ভাই, এস বোন্, সকলে মিলিয়া কাজে লাগিয়া যাই। যদি গ্রামে একজনও জাগা মানুষ থাকে এবং সে যদি কাজ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অন্যান্য কর্ম্মী শীঘ্রই আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে। প্রকৃত কাজ দেখিলে কর্ম্মী নীরব থাকিতে পারে না। চাই স্বার্থত্যাগী মানুষ যাহারা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে যাইয়া

শিক্ষার আবশ্যকতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিবে। দেশের সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের সাময়িক পত্রে, সাহিত্যে, কাব্যে, শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দিবেন। বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ সরল ভাষায় লিখিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন। দেশের লোক যেসব ব্যবসা বহুকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেমন করিয়া সে-সকলের উন্নতিসাধন করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে সরল ভাষায় পুস্তক প্রচার এবং হাতে-কলমে (Practical) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদ্বারা দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত—খাঁটুরা পাঠাগার।

ভুলু মুচি

বৈশাখের নিদারুণ রোদে
স্নান করি' ভাগীরথী-জলে,
ফোঁটা কাটি' শুদ্ধ বস্ত্র পরি'
ফিরিতেছে সবে দলে দলে।
দান করি অকাতরে ধনী
গাড়ী চড়ি' যায় নিজ ঘর।
মুষ্টিভিক্ষা দিয়া কতজন
পদব্রজে চলিছে সত্বর।
নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
যায় চলি মন্ত্র উচ্চারিয়া।
অশ্বত্থ ও বট-বিল্ব-মূলে
গঙ্গাজল দিতেছে ঢালিয়া।
বৈশাখের জ্বলন্ত তপন
করিতেছে অগ্নি বরিষণ।
সাঁই সাঁই আগুন-বাতাস
বহে, দেহ পুড়ে অনুক্ষণ।
সেই তীব্র বহ্নিসম রোদে
বসে' এক দরিদ্রা রমণী,—
তৃষ্ণাতুরা ধূলি-ধূসরিতা।
কিবা তার কাতর চাহনি!
"ও গো জল দাও মোর মুখে
তেষ্টায় যে বুক ফেটে যায়।"
বলিতেছে কষ্টে বার বার
তাও শোনা যায়-কি-না যায়।
যেই দেখে ঘৃণিত সে দেহ
থুতু ফেলি' ভূঁয়ে বার-বার,
নাসারন্ধ্র ঢাকি' বস্ত্র দিয়া
দ্রুত যায় টানিয়া হাকার।
ভুলু মুচি যেতেছিল নে'য়ে
অভাগিনী প'ল চোখে তার।
দেখে ভুলু হ'ল মর্ম্মাহত
দুই চোখে বহে অশ্রুধার!
চিন্তান্বিত ভুলু যেতে যেতে
বুক-ফাটা দুঃখে ভোর হ'য়ে—
"সারাদিন খেটে দুই আনা!
কেমনে পালিব ছেলে-মেয়ে?"
দেখেই সে দুঃখিনীর দুখ
নিজ দুঃখ গেল পাসরিয়া।
সযতনে ধরি' দেহ তার
বৃক্ষ-মূলে আনিল তুলিয়া।
পরে তার শিরে দিয়া হাত
পিয়াইল সুশীতল জল।
"দু আনা"ও দিল সে সঁপিয়া
ছিল যাহা ভুলুর সম্বল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রাবণে শ্যামরূপ

(গান)

দলিত-কাজল-উজল চারু সজল-জলদ বরণ।
বাজে কেকা বাঁশী, কেতকী সুহাসী অধরে মানস-হরণ।
চমকে সুপীত তড়িত-জড়িত বিনোদ-বসন-প্রান্ত,
শিরে শিখি-পাখা, ইন্দ্রধনু আঁকা, চূড়া রমণীয় কান্ত;
মুকুতা—বকালী, একি বনমালি! রাতুল কমল-চরণ।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

স্বরলিপি (মল্লার—একতালা)

আস্থায়ী

II { রা পা পা । মা গা মা I রা পা মা । পা -া পা ।
দ লি ত কা জ ল উ জ ল চা ০ ক্ল

। পা ধা মা । পা না র্সা I ধা না র্সা । -া -া -া ।
স জ ল জ ল দ ব র ণ ০ ০ ০

। র্সা র্রা না । র্সা ধা পা I মা গা মা । রা সা সা ।
বা জে কে কা বা শী কে ত কী সু হা সী

। র পা মা । গা মা রা I সা ন্া রসা । -া -া -া } II
অ ধ রে মা ন স হ র ণ ০ ০ ০

অন্তরা

II { মা পা পা । না না না I ধা নর্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা ।
চ ম কে সু পী ত ত ড়ি ০ ত জ ড়ি ত

। না ন্না না । না র্সা র্সা I ধা -নর্সা -র্রা । র্সা -া -া ।
বি নো দ ব স ন প্রা ০০ ন্ত ০ ০

। র্রা র্মর্গর্মা র্রা । র্রা র্সা র্সা I না -ননা না । র্সা র্সা র্সা ।
শি রে০০ শি খি পা খা ই ন্দ্র ধ নু আঁ কা

। র্সা র্রা র্সা । না না র্সা । ধা -নর্সা -র্রা । র্সা -া -া } ।
চূ ড়া র ম ণী য় কা ০০ ন্ত ০ ০

। মা পা পা । পা পা পা I মা পা র্সা । র্সা র্সা র্সা ।
মু কু তা ব কা লী এ কি ব ন মা লি

। র্সা রা র্সা । ধা পা মা I গা মা -রা । সন্া -সা -া II II
রা তু ল ক ম ল চ র ০ ণ০ ০ ০

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

প্রতিধ্বনি

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী

ছেলেদের স্বাস্থ্যের কথা।—শীতপ্রধান দেশে যতটা physical exercise করা যায়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ততটা পারা যায় না। Englandএ children's health সম্বন্ধে অনেক journal আছে। আমাদের দেশে ওরূপ কিছু নেই। আমার ত মনে পড়ে না When I ceased to be a student, অথচ আমি এখনও লেবরেটরিতে ৭।৮ ঘণ্টা করে' কাজ করতে পারি। ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে আমরা মোটেই দৃক্‌পাত করি না। যেমন বেশী খেলে আর রুচি থাকে না, তেমনি বেশী mental labour করলে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে।

স্যার নীলরতন সরকার পরীক্ষা করে বলেছেন, "আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে 66 p.c. have got some sort of organic complaints.

এরূপ অবস্থায় লেখাপড়া শিখে কি হবে? কাজেই তাদের 'যজ্জীবত্তি তন্মরণং সন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ।'

যখন আমি শুনি কেউ গ্রাজুয়েট্ হয়েছে তখন আমার palpitation হয়। ভাবি যে ওই যাঃ সব গেছে। ওর ভিতরে যা ছিল সব বেরিয়ে গেল। Volcanoটা strained হয়ে গেল।

অনেক মা-বাপ গর্ব্ব করেন—"আমার ছেলে য়ুনিভার্সিটিকে দু'বছর ফাঁকি দিয়ে অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে বয়েস কম লিখিয়ে পরীক্ষা পাশ করেছে।" এতে যে ছেলের কি সর্ব্বনাশ হলো তা তাঁরা বুঝেন না।

Precocious development is followed by premature decay. ছেলেদের ইঁচড়ে পাকানো হয়—যাকে বলে জাঁক দিয়ে পাকানো। তার বীজে গাছ পর্য্যন্ত হয় না।

চারটের পরে আজকাল দেখতে পাই অনেক ছেলে বই নিয়ে বসে। তখন যে বই ছুঁতেই নেই। কল্‌কাতায় অনেক সময় দেখি চারটের পর ছেলে বাসায় এলো। বাড়ীর মধ্যে গিয়ে মা'র কাছ থেকে জলখাবার খেল, তখনই ঝি এসে সংবাদ দিল "মাষ্টার এসেছে।" অমনি ছেলে-মেয়েরা পড়তে বস্‌লো। চারটের পরে ছেলেরা একটু জল খেয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দৌড়োদৌড়ি যত ইচ্ছে করুক।

আজ অর্দ্ধশতাব্দী সবই ত দেখ্‌ছি। ছেলেদের নাড়ী-নক্ষত্র সবই জানি। ছেলেদের মুখেও আজকাল হাসি নেই। Saddler সাহেবও তাঁর রিপোর্টে এই কথা লিখেছেন—"বাংলায় কোনো ছেলেকে মন খুলে হাস্‌তে দেখি নাই।" কোথায় সেই—And the loud laughter that speaks the vacant mind. আমাদের ছেলেদের মধ্যে দেখি lifeটা যেন একটা dismal valley of tears.

ইংলণ্ডে সব ছেলে-মেয়ে একটু গাইতে বাজাতে পারে। আর আমাদের দেশে ওটা যেন একটা মহা পাপ। অভিভাবকের সাম্‌নে গান করবে একথা ভাব্‌লে ছেলেরা মরমে মরে যায়। আজকাল কোনো গ্রামে সভা-সমিতিতে গান গাওয়াতে হলে গ্রামশুদ্ধ খুঁজে ছেলে পাওয়া যায় না। ওটা একটা divine gift. ওর জন্য prize দেওয়া উচিত।

আমার একটি বন্ধু বল্‌তেন, "আমার ছেলেটা বি-এ পাশ করতে পারবে না, কারণ সারাদিন কেবল foot ball খেলে কাটায়, বইএর সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধ নেই।" কিন্তু পরীক্ষার আগে দেখ্‌লাম ও এর কাছ থেকে অমুক প্রফেসরের ভাল নোট্‌খানা, ওর কাছ থেকে অমুক নোট্‌খানা সংগ্রহ করে বেশ পরীক্ষা পাশ করে ফেল্‌লো। ওরা কুকুরের মত বেশী খেয়ে বমি করে আসে।

Emerson বলেছেন—"যে ছেলে যত out book থেকে বেশী উত্তর দিতে পারে সে ছেলে তত ভাল।"

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত এখানে ইস্কুল দেখবার জন্যে আমাকে ডেকে নিতে পারেন। কিন্তু তা করবেন না। খাল কেটে কুমীর নেবেন না। আমি গেলেই ছেলেদের আউট্ বুক্ থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। ঐ যে দেখিয়ে দেবেন অমুক পৃষ্ঠা থেকে অমুক পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়েছে সেটা আমি দেখ্‌বো না। দেখ্‌বো কে কেমন আউট্ বুক্ থেকে উত্তর দিতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় কোনো ছেলে হয়ত mathematics এর ক্লাসে "নেপোলিয়ন্" পড়ছে। তখন

মাষ্টার মশায় হয়ত তাকে ধরে বেত্রাঘাত করলেন। সেটা কিছুতেই উচিত নয়। বরং তাকে তখন নেপোলিওনের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি জিজ্ঞাসা করুন।

এই সব আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর দোষ। তবে যে জগদীশ বোস্ বের্ হয়েছেন—Is it because of the system or inspite of it? আমি ত বলি inspite of it. বাংলার মধ্যে যাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁরা ত বরাবর Universityর সঙ্গে আলেকম্-সেলাম দিয়ে চলেছেন। যথা—রবীন্দ্রনাথ।

R. N. Mukherjee যদি এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করতেন তা হলে বড় জোর একজন ভাল এঞ্জিনিয়ার হতে পারতেন।

J. C. Banerjeeকে এপ্রেন্টিস্ ক্লাসে দুইবার রাষ্টিকেট্ করলে। তারপর তাঁর স্বাধীন ব্যবসা করবার প্রবৃত্তি জাগ্‌লো। রাধাচরণ পাল মিউনিসিপ্যাল্ এড্‌মিনিষ্ট্রেশনে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। নিবারণচন্দ্র ঠাকুর —Prince of coal merchants একজন কৃতী পুরুষ। তিনি বলেছেন—"I p. c. of what I know, I owe to school, and 99 p. c. to what I did not read in school.

আজকাল একজন এম্-একে ইউরোপের একখানা ম্যাপ্ নিয়ে বলুন—"বার্লিন দেখাও ত অথবা প্যারিস্ দেখাও ত।" সে তখন অন্ধের মতন ম্যাপের উপর হাত্‌ড়াতে থাক্‌বে। কিংবা ভারতবর্ষের ম্যাপ্ নিয়ে বলুন "কান্‌পুর দেখাও কি দিল্লী দেখাও।" তখনও সে তাই কর্‌বে। দেখুন কি-রকম গণ্ডমূর্খ হয়ে এম্-এ পাশ করে বের্ হয়। এরা হচ্ছে শিখীপুচ্ছধারী বায়স, অথচ বিদ্বান্ বলে অভিহিত। School final পরীক্ষা হ'লে বেশ ভাল হয়। পরীক্ষা-বিভীষিকার চাপে ছেলেদের health যে কি-রকম মাটি হচ্ছে তা বলা যায় না। পরীক্ষার আগে অনেক প্রফেসর্ আমাকে বলেন 'কি করলেন? আজও ক্লাস্ ছাড়্‌লেন না।" আমি কিন্তু ক্লাস্ ছাড়ি না। আমি চাই মানুষ তৈরি করতে।

আমি আমার কৃতীছাত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বরোদা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলুম। ঝাল্‌ওয়ারের মহারাজা আমার বিছানা দিলেন তাঁর palaceএ আর জ্ঞানেন্দ্র ঘোষের বিছানা দিলেন তাঁর দেওয়ানের বাড়ীতে। আমি বল্লাম "মহারাজ করেছেন কি? আমার বিছানা দিয়েছেন এখানে, আর তাঁর বিছানা ওখানে?" তখন তিনি তাঁর পরিচয় শুনে বল্লেন "Oh, then he is my friend also"। তারপর আমার সঙ্গে তাঁর বিছানা দেওয়া হলো।

Lord Ronaldshey উপযাচিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্র ঘোষের অনেক প্রশংসা করেছেন। Ghosh's Law জগতে নূতন আবিষ্কার।

ডাঃ মেঘনাদ সাহার মত Mathematician ভারতবর্ষে জন্মায় নাই। তিনি এখন জার্ম্মেণীতে গিয়েছেন। Sciller, গেটে প্রভৃতি সব তিনি পড়েছেন। তিন জন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে জিজ্ঞেস্ করলে, "Do you know Dr. Ghot, ডক্টার ঘট্?"

তিনি ভাব্‌লেন একি ঘট্ ঘট্ কি বলে। তখন তারা বল্লে Law of dilution যিনি আবিষ্কার করেছেন। তখন তিনি বুঝ্‌লেন জ্ঞানেন্দ্র ঘোষের কথা বল্‌ছে। তিনি বল্লেন "Sirs, we pronounce it as Ghosh." তারা তাঁর বই সম্বন্ধে বল্লে "It is an epoch-making work." মেঘনাদ সাহা লণ্ডনের D. Sc. উপাধি নিচ্ছেন না। তাঁকে সাধছে, তবু তিনি নিচ্ছেন না। কেন নেবেন? আমার Calcutta University কোন্ অংশে London Universityর চেয়ে ছোট? জাপানীরা এরূপ উপাধি নেয় না। সুইডেনের লোকেরাও নেয় না।

আর এক কথা এই,—আমাদের মাতৃভাষাকে প্রধান ভাষা করতে হবে। কয়েক বছর আগে আমি রাজসাহীতে সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব করেছিলাম। সেই সভায় রাজসাহীর একজন মুসলমান—তিনি এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়েছেন, একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন—"বঙ্গীয় মুসলমানদের ভাষা কি?" আমি তাঁকে সভার মধ্যেই আলিঙ্গন করেছিলাম। তাঁর নাম ইয়াকুবালী। তিনি বলেছিলেন, মুসলমান ও হিন্দু উভয়েরই মাতৃভাষা বাংলা। আমাদের এই মাতৃভাষাকে প্রধান স্থান দিতে হবে। আরবী, পার্শী, সংস্কৃত থাক্ optional, আমার ঐ ষত্ববিধান, ণত্ববিধান, আত্মনেপদ বা পরস্মৈপদ এ-সব

শিখে সময় নষ্ট করলে চলবে না। আচ্ছা, আপনারা ক'জন জার্ম্মান শিখে প্লেটোর কথা পড়েছেন? ক'জন গ্রীক্ শিখে সক্রেটিসের কথা পড়েছেন? জার্ম্মান ভাষায় কেমিষ্ট্রীর বিষয় অনেক শিখবার আছে। আমি একজন কেমিষ্ট। আমি জার্ম্মান্ শিখি বটে, কিন্তু শুধু ঐ কেমিষ্ট্রী শিখ্‌বার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু শিখি, তার বেশী শিখি না। তার বেশী শেখ্‌বার আমার সময় নেই। বিলাতে অনেক জাপানী ছাত্র আছে। তারা বেশী ইংরেজী শেখে না। তাদের বিজ্ঞান শেখ্‌বার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু মাত্র শেখে। Science কি না? কতকগুলি technical terms শিখে নিলেই হলো। জাপানী কোনো ছাত্রের সহিত যদি ইংরেজীতে আলাপ করেন তা হ'লে সে বল্‌বে, "Sir, I understand you with difficulty, but please excuse me I can't express my idea in English." ইংলণ্ডের ছেলেরা অনেক বেশী শেখে, কারণ তারা মাতৃ ভাষায় শেখে।

জগতে এরূপ হাস্যাস্পদ আর কিছুই নেই যে, আমরা যা-কিছু শিখি, সব ইংরেজীতে শিখি। আমাদের মাতৃ-ভাষাকে করতে হবে সর্ব্বপ্রধান ভাষা। English হবে Secondary language. অন্যান্য দেশের লোকেরা ত আমাদের মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে থাকে।

আচ্ছা বলুন ত আপনাদের মধ্যে চণ্ডীদাস ক'জন পড়েছেন? মুকুন্দরাম ক'জন পড়েছেন? সেই—"তৈল বিনা কল্লু স্নান—উদক করিনু পান—শিশু কান্দে ওদনের তরে।" বাংলার তখনকার জাজ্জল্যমান চিত্র বেশ সুন্দর বর্ণিত হয়েছে। তখন দেশে নবাবের অত্যাচার। অথচ এই সমস্ত ভাষা কেমন সরল, কেমন সুন্দর, পড়লেই বোঝা যায়। আর সংস্কৃত শিখে কি হবে? অনেকে বলবেন, "আমরা শাস্ত্র পড়্‌বো।" আচ্ছা বলুন দেখি আপনারা ক'জন সংস্কৃত শিখে মূল মহাভারত পড়েছেন? পূজারি ব্রাহ্মণ ক'জনে পাণিনি পড়েছেন? তাই বল্‌ছি অনুবাদ পড়ুন, অনুবাদেই কাজ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অতি সুন্দর বিশুদ্ধ ভাষায় অনুবাদ। তা পড়ে ফেলুন। ক'জন মুসলমান আরবী পড়ে' কোরাণ পড়েছেন?

অনুবাদের সাহায্যে সব পড়্‌তে হয়। আর কৃষি শিক্ষা দিতে হবে। Agricultural Class—নিজহাতে জিনিষ তৈরি করতে শিখুন।

(সৌরভ, চৈত্র, ১৩২৭) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রত্যেক গাঁয়ে চাই কি

প্রত্যেক গাঁয়ে গাঁয়ে একটি করে জাগা মানুষ নিজে জেগে পরকে জাগাবে, নিজে বেঁচে মরা বাঁচাবে, নিজে পরম আশ্রয় পেয়ে গ্রামবাসীর আশ্রয় হয়ে দাঁড়াবে। প্রতি আঙিনা তার হবে ঘর, প্রতি রোগশয্যা তার হবে তীর্থ, প্রতি শক্তিহীন অর্থহীন জ্ঞানহীন তার হবে কোলের শিশু। সে-মানুষ এমন হওয়া চাই যার কাছে এসে কোনো অতিথি ফিরে না যায়। যে ধর্ম্ম চায় সে যেন তার কাছে এসে দেবতা হতে পারে, যে জ্ঞান চায় সে যেন তার কাছে থেকে অফুরন্ত জ্ঞান নিতে পারে, যে বিপদ রোগ দুঃখ হতে ত্রাণ চায় সে যেন শরণ পায়, যে তার প্রতি বিমুখ হয়ে ফিরে চায় সেও যেন তার কাছে প্রেমে হেরে যায়। এই মানুষটি শুধু জীবন বিলাবে—গ্রামটিকে সমবেদনায় শক্তিতে আনন্দে জ্ঞানে বাঁচিয়ে তুলবে। গ্রামবাসীর অন্তর-নিহিত ঘুমন্ত মানুষ জাগিয়ে তুলবে। রাজা প্রজা কারুর সঙ্গে বিরোধ না করে সে আগে—ঠাঁই ঠাঁই ভাইকে একদেহ একপ্রাণ একআত্মা হতে শেখাবে। সেই হবে জীবন্ত জাতীয় বিদ্যালয়। তার শক্তিমন্ত্রে জ্বালানো জীবন-দীপ থেকে যে-যার বিধান-জীবন-প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে নিয়ে যাবে। তার পরে দেখবে গাঁয়ে গাঁয়ে লেগে গেছে জীবনের দীপালী উৎসব।

সদরে ও অন্দরে

কাজের খাতিরে একবার গ্রামে যেতে হয়েছিল। সেখানকার মেয়েদের ইস্কুলে গিয়ে দেখি সাত-আট বছরের কচি মেয়ে তালপাতায় ক'খ, লিখচে। পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞাসা করলুম, ইস্কুল কেমন চলচে? তিনি জবাব দিলেন, বড় মেয়েরা আসে না বলেই শিক্ষাও 'ক' 'খ' এর বেশী ওপরে ওঠে না। স্ত্রী-শিক্ষার বহর দেখে ফিরে এসে দশ বছরের একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওরে! ইস্কুলে যাসনে কেন?" সে জবাব দিলে "মা যেতে দেয় না যে। ছাড়বার পাত্র নই, তার মাকে গিয়ে বল্লুম—"মেয়েকে ইস্কুলে

দাওনা কেন ?" প্রৌঢ়া তার চোখদুটো কপালে তুলে বল্লেন—"ওমা ! মেয়ে যে সোমত্ত হয়ে উঠেচে এখনো ইস্কুলে যাবে !" দশ বছরের মেয়ে ইস্কুলে যাবে না সোমত্ত হয়েছে বলে—আর পঁচিশ বছরে রাষ্ট্রীয় অধিকার নিয়ে কাউন্সিলে কাজ করবে, এমন দুরাশাও আমরা পোষণ করি ! যে গ্রামটির কথা বল্লুম, সেখানে যে শিক্ষার আলো একেবারেই ঢোকে নি, তাও নয়। এই গ্রাম হতেই আধ ডজন ছেলে Sub-Deputy হবার চেষ্টা করচে। দারোগা-গিরির চেষ্টা যে কত করচে, তার আর লেখা জোকা নেই। শিক্ষাই হোক আর অ-শিক্ষাই হোক ছেলেদেরে তারা ইউনিভার্সিটিতে পাঠাচ্ছেন—আর মেয়েদের বেলায় শুধু 'ক' 'খ' এর ব্যবস্থা। কোনো জিনিসই আমরা সবটুকু মন দিয়ে চাই নে, যেন কারু অনুরোধে পড়ে একটা-কিছু করতে উদ্যত হই। ফলে পাবার মত কিছুই পাই না। আজ স্বরাজ চাইচি, তাও সমস্ত মন দিয়ে নয়। তাই সদরে আর অন্দরে দু রকম ভাবে চল্‌চি। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য আজকার দিনেও যে আন্দোলন করতে হয়, সেটা লজ্জার কথা নয় কি ? (বিজলী)

বিধবাদের অন্নসংস্থান

দেশ-জোড়া দুর্দ্দশার মাঝে বিধবাদের কথা ভাব্‌তে গেলে অশ্রু-সম্বরণ দুরূহ হয়ে পড়ে। এমন সংসার অতি অল্পই আছে যেখানে বিধবা নেই। অথচ এই বিধবারাই অনেক সংসারের প্রধান অবলম্বন ; সেবা ও সমপ্রাণতায় এঁরাই অনেক সংসারকে টিকিয়ে রেখেছেন। গ্রামের মধ্যে দু'একদিন ঘুর্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন নানা বয়সের বিধবায় প্রত্যেক গৃহস্থ ভারাক্রান্ত।

এই দেবীদের ক্লেশ-লাঘবের জন্য আমাদের হাতে কি কিছুই নেই ? পল্লীগ্রামের ভদ্র গৃহস্থের বাটীতে দু'একজন মহিলা ডালা, কুলা, চালা, ধামা, মাদুর, চাটাই প্রভৃতি তৈরি কর্‌তে বেশ পটু। এমনি এক-একজনকে ধরে গ্রামের বিধবা মেয়েদের ডেকে ঐ-সব শিল্প কাজ শেখাবার ব্যবস্থা কর্‌তে ত আমাদের বেশী বেগ পেতে হয় না। সহরে অনেক মহিলা আছেন যাঁরা পশমের কাজ, কার্পেট বুনা, ছাতা, ট্যাগ, কুশান, চেন তৈরী, কাঁথা ও রুমাল সেলাই প্রভৃতি জানেন। পল্লীর অনেকে চর্‌কায় সূতা কেটে এরি মধ্যে গামছা তোয়ালে তৈরিও শিখে নিয়েছেন। সহরে ও গ্রামে এক-একটি "বিধবা-সাহায্য-সমিতি" গড়ে তুলে আবশ্যক-মত অর্থ সাহায্য করে নিঃস্ব বিধবাদের এইসব কুটীরশিল্প শেখানো দরকার। এঁরা যে তা'হলে সংসারের গলগ্রহ না হয়ে বাপ-ভাইদের কিঞ্চিৎ সাহায্য কর্‌তে পারেন সে-বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে না।

ফরিদপুরে প্রায় ৫০টি ভদ্র-পরিবারের বিধবা কেবল সুন্দর কাঁথা তৈরি করে মাসিক ১০।১৫৲ টাকা আয় করছেন। অল্পদিনের চেষ্টাতে দু'তিনটি ভদ্র-মহিলা অবসর সময়ে চর্‌কায় সূতা কেটে গামছা তোয়ালে তৈরি করে প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের জেলায় সে-চেষ্টা করলে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবা এই অন্ন-সমস্যার দিনে দেশের কল্যাণের সঙ্গে নিজেদেরও দুমুঠা অন্নসংস্থানের উপায় করতে পারেন।

অর্থ বা মূলধন নৈলে যে এসব হয় না তা নয়। চাই প্রবল ইচ্ছা, আন্তরিকতা আর নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সৎসাহস। মায়ের জাতিকে আজ জাগ্‌তেই হবে ; ছেলেদের হাত ধরে কর্ম্মের পথে চালিয়ে দিতে হবে। তাঁদের চেষ্টা জাগ্‌লে অর্থ আপনা হতে এসে পৌছুবে। ধনকুবেরগণ ভাণ্ডার মুক্ত না করে থাক্‌তে পার্‌বেন না।

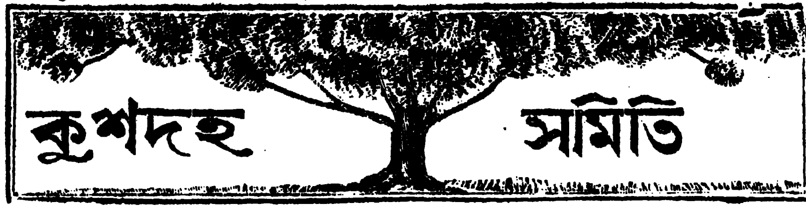
(কল্যাণী, মেদেনীপুর)

শক্তি-ভিক্ষা

(Burns)

কে তুমি, কেমন জানি না তবুও
ওগো ভগবান তোমায় ডাকি,
এইটুকু জানি বিশ্বে তোমার
জানিতে কিছুই নাহিক বাকী।
দুখ-বেদনায় বুক ভেঙে যায়
দুর্ব্বল জীব কতই স'বে ?
জানি তবু মোর যন্ত্রণা-জ্বালা
তোমারি আদেশ পালিতে র'বে।
তুমি দয়াময় পীড়ন করো না
নিষ্ঠুর হয়ে, জানিও তাও,
মুছাও আমার নয়ন-সলিল
অথবা মরণে মুদায়ে দাও।
যদি মোরে প্রভু দহিতেই হবে
তোমার বিশ্ব-শুভের লাগি,
বল দাও তবে দৃঢ় কর প্রাণ,
সকলি সহিতে শকতি মাগি।

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর।



কুশদহ-সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য

আজ তিনবৎসর ধরে কুশদহ-সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারিত হয়ে আসচে। বিশেষত প্রতিবৎসর সমিতির বার্ষিক অধিবেশন ও কৃষিশিল্প-প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে সমবেত চেষ্টার একটি বিরাট উদ্বোধন দ্বারা সমিতির যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়, সেটা এই ক্ষুদ্র শিশু-সমিতির পক্ষে সামান্য নয়। তথাপি বলা যায়, এখনো সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য তেমন-কিছুই প্রচারিত হয়নি। আরো সেটার প্রমাণ হয়ে যায় প্রতিদিনের কুশদহ-বাসীর কথাবার্ত্তায়।

কুশদহ-সমিতির বিস্তৃত নিয়মাবলীর "বীজমন্ত্রে" গোড়ায় ছিল, ছয়টি কি সাতটি কথা। তার প্রধান কথা দুটি। প্রথম—সমগ্র কুশদহবাসীর মেলামেশা—আলাপ-পরিচয়—সদ্ভাববর্দ্ধন, প্রীতিস্থাপন। দ্বিতীয়—সমবেত চেষ্টায় কুশদহর সেবা।

যাকে ভালবাসি তার সেবা করি। এ-টা স্বাভাবিক অবস্থা—সরল সহজ কথা। আমার জন্মভূমি আমার দেশকে আমি ভালবাসি, তাই আমার দেশের মানুষকেও এত ভালবাসি; তাই চাই মেলামেশা—আলাপ-পরিচয়। প্রীতির স্বভাব সদ্ভাব বর্দ্ধন করা। অপ্রেম অহঙ্কারই সদ্ভাব নষ্ট করে—অসদ্ভাব আনে। ভালবাসা তো আর কিছু চায় না—কেবল ভালবেসেই সুখী—সেবা করেই সুখী।

কেহ কেহ বলেন, কেবল মেলামেশা করলেই কি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? এ-কথার উত্তরে জোর করে বলতে হবে, হাঁ। কেবল মেলামেশাতেই সব কাজ হবে। তুমি মেলামেশা চাও কেন? যাকে ভালবাসো তার সঙ্গে মেলামেশা করতে চাও না? আগে হৃদয় খুঁজে দেখ, তোমার হৃদয়ে ভালবাসা আছে কি না; তুমি দেশকে—দেশবাসীকে ভালবাসো কি না। ব্যক্তিগত হিংসা-দ্বেষ, অভিমান অহঙ্কারে হৃদয় ভরে রাখলে ত চলবে না। দেশমাতৃকার নামে—তাঁর প্রেম-পূতসলিলে হৃদয় ধুয়ে ফেলে দেখ—হৃদয় কি বলে, হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর ভালবাসো কি না। যদি মেলামেশায় তোমার অনুরাগ না থাকে তবে তুমি ভালবাসো না। এই ভালবাসার শক্তি হতেই মেলামেশার ইচ্ছা আসবেই আসবে। এই মেলামেশার ফলেই নানা শুভ কাজের সূচনা হবেই হবে। তুমি যদি দেশকে ভালবাসো, তবে দেশের দুঃখে তুমি নিশ্চয়ই দুঃখিত। দেশের পাঁচ ভাইয়ে যদি আজ মিলেছ আর কি তুমি চুপ করে থাকতে পার? কি করলে এ-সব দুঃখ দূরের উপায় হয় তার পরামর্শ করতে তোমার কত উৎসাহ কত সুখ বোধ হবে বল দেখি।

যতদিন এই মেলমেশার কথা—এই মূলমন্ত্র ঘরে-ঘরে প্রচারিত না হবে ততদিন সমিতির কাজ হবে কি করে? এইটিই এখন সব চেয়ে মস্ত বড় কাজ!

কুশদহর গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে শাখা স্থাপন এ-ও সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। সুখের বিষয় এই তিনবৎসরে তারও কিছু কিছু সূচনা হয়েচে। কোথাও কাজও কিছু কিছু হচ্চে। কিন্তু তার মূলেও চাই ঐ মেলামেশার শক্তি। যদি এমনই হয়, কোনো যোগাযোগের ফলে ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টায় কিছু কাজ আরম্ভ হয়েচে। কিন্তু সে-কাজে আর পাঁচ-জনের মন—আর পাঁচজনের হৃদয় তেমন করে আকৃষ্ট হচ্চে না, অন্তত দু'চার জনের মনে বিশ্বাসের বল আসচে না, তবে বলতে হবে, সে-কাজ কি স্থায়ী হবে? ও সে সমিতির ঠিক আদর্শ গঠন হচ্চে না। কাজ যতটুকু হয় ততটুকুই ভাল; সমবেত চেষ্টায় সেটুকু হওয়া চাই। তবেই বুঝা যাবে সমিতির আদর্শ উদ্দেশ্য প্রচারের ফলেই এ কাজটুকু হয়েচে।

পল্লীর সেবায়, পল্লীর দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টায়, সকলের আগেই চোখে পড়ে শীর্ণ-মলিন নর-নারী ও বালক-বালিকার মুখ। কানে বাজে "ম্যালেরিয়া দূর কর, ম্যালেরিয়া দূর কর।" জঙ্গল-কাটা থেকে আরম্ভ করে মশা-মারা পর্য্যন্ত যতরকম উপায় সবই কুশদহ-সমিতির উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে। তা-ছাড়া শিক্ষা দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান না দিলে কিছুই হবে না। আবার শুধু জ্ঞান দিলে কি হবে, পেট ভরে' খেতে না পেয়েই তো দুর্ব্বল দেহে রোগ-বীজানুরা প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়েছে। অতএব অর্থাগমের জন্য শিল্প-কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। এ-ও সমিতির উদ্দেশ্যের বাহিরে নয়। এমনি করে যে-কাজেই হাত দেবে তাতে চাই সমবেত শক্তি—মেলামেশা ও ভালবাসার বল।

পেট ভরে' খাওয়া পশুর পক্ষেও দরকার, মানুষের পক্ষেও দরকার। কিন্তু মানুষের পক্ষে সেইটেই কেবল যথেষ্ট নয়। তার দরকার হিতাহিত জ্ঞান লাভ করা। এর 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত মুক্তির সমাচার এনে দ্যায়। কিন্তু এর ক-বর্গ আরম্ভ করতে হয় নীতিতে, নৈলে মানুষও তোতা পাখী হয়। কেবল কুশদহর মধ্যে কেন, এই নীতির অভাব আমাদের সর্ব্বত্রই। কুশদহ-সমিতির মধ্যে পল্লীতে পল্লীতে দুর্নীতিপূর্ণ বিবাদ-বিসম্বাদ কত! আদালতে ফৌজদারী মোকর্দ্দামা পর্য্যন্ত হচ্চে। সুতরাং নীতি-ধর্ম্ম প্রচারের কত দরকার। তার ব্যবস্থাও চাই। এ-ও কুশদহ-সমিতির উদ্দেশ্য। তাই পাঠাগার, জ্ঞানধর্ম্মপ্রচারার্থে সংবাদ পত্র, ব্যক্তিগত সচ্চরিত্রতাসাধন, সর্ব্বত্র স্বদেশ-প্রেমের পবিত্র বাণী ঘোষণা, আপদ-বিপদে পরস্পরে সহানুভূতি দান—ঐ মেলামেশার ভাবই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রচার করতে হবে। এ-কাজে অগ্রণীদের সহায় মাতৃপ্রেম।

—চিরদাস।

নৈশ বিদ্যালয়

কুশদহ-সমিতি খাঁটুরা-হায়দাদপুর শাখার উদ্যোগে গত বৈশাখ মাসে রঘুনাথপুর গ্রামে একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান ছাত্র-সংখ্যা ৪৫। সমিতি হইতে ছাত্রদিগকে পুস্তক, কাগজ, শ্লেট-পেন্সিল ইত্যাদি দেওয়া হইয়া থাকে এবং আলো-বাতির ব্যয় বহন করা হয়। শ্রীমান দেদারবক্স ও শ্রীমান গোলাম রব্বানী অবৈতনিকভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া সমিতিকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীহানিপ মণ্ডল বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য একখানি উৎকৃষ্ট ঘর দিয়া সমিতির অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অধিকাংশই কৃষক-বালক এবং মুসলমান। ইহাদিগকে বাংলা, অঙ্ক, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, উর্দ্দু, আরবী শিক্ষা-দেওয়া হইয়া থাকে। মুসলমান বালকদিগকে ঐ-সঙ্গে নমাজ-পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়।

খাঁটুরা বালিকা-বিদ্যালয়

গত জুলাই মাসে উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ-সভা খাঁটুরা দত্ত-বাটীতে হয়। বারাসতের Sub Divisional Officer মাননীয় শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র চন্দ্র আই-সি-এস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। খাঁটুরার স্বভাব-কবি সুগায়ক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চৌধুরী সময়োপযোগী একটি সঙ্গীত করিলে পর বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয় গত ১০ বৎসর ধরিয়া এই বিদ্যালয় কতপ্রকার বাধা বিঘ্ন ও আর্থিক অনাটনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহা বলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমান যুগে স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বালিকাদিগকে উপদেশ দেন এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে অনুরোধ করেন যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কন্যাদিগকে অবিলম্বে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

বালিকাগণের স্তোত্রপাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বিশেষ তুষ্ট করিয়াছিল। তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য রৌপ্য-পদক, পুস্তক, সেলাই-সরঞ্জাম ও পুতুল ইত্যাদি উপহার দেওয়া হয়। শিক্ষা-বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য শ্রীমতী ক্ষান্তমণি রক্ষিতকে এবং বিদ্যালয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপস্থিতির জন্য শ্রীমতী উষারাণী দেবীকে রৌপ্য-পদক প্রদত্ত হয়। আগামী বৎসর বালিকাদিগের জন্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ২টি, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ বি-এস-সি ১টি, এবং বিদ্যালয়ের জনৈক হিতার্থী ২টি রৌপ্য পদক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এতদুপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের একটি স্থায়ী ফণ্ড করিবার আলোচনা হয় এবং সভাস্থলে প্রায় ২০০৲ দুই শত টাকা প্রতিশ্রুত হয়। শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র চন্দ্র ৫১৲, শ্রীযুক্ত

শরৎচন্দ্র রক্ষিত ১০১৲ দান করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয় বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে এবং উদ্যোক্তা ও অভ্যাগতদিগকে জলযোগ করাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রাণ-স্বরূপ। এত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও তিনি যেরূপ নিষ্ঠার সহিত স্ত্রী-শিক্ষার এই একমাত্র অনুষ্ঠানটিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহা আর কাহারো দ্বারা হইত কি না সন্দেহ। আনন্দের বিষয় এই যে, একমাসের মধ্যেই বিদ্যালয়ে আরও ২০টি বালিকা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান ছাত্রী-সংখ্যা ৫০টি। ইহা আশার কথা।

দেশবাসিগণ সকলে এই বিদ্যালয়টিকে সাহায্য করিয়া বাচাতে ইহা সুচারুরূপে চলে তাহার সুব্যবস্থা করিলে দেশের একটি যথার্থ উপকার হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় অধিবেশন

স্থান—১১।১ ঘোষের লেন, কলিকাতা। তারিখ ৭ই আষাঢ় শুক্রবার, সময় সন্ধা ৭ ঘটিকা।

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নীলাচল মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, প্রবোধচন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ পাল এবং সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—(১) প্রদর্শনীর অবশিষ্ট দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা। (২) কুশদহ পত্রিকার জন্য অর্থের ব্যবস্থা। (৩) বিবিধ।

প্রথম আলোচ্য বিষয়ে কুমুদ বাবুর হিসাব পঠিত হইল। এখনো প্রদর্শনী-সম্পাদকের নিকট হইতে ও অন্যান্য হিসাব মিলাইয়া আগামী সভায় সম্পাদক একটি মোট হিসাব দাখিল করিবেন। এবং অর্থসংগ্রহের জন্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক-জন যুবকের প্রতি ভার দেওয়া যায় যে, তাঁহারা সম্পাদকের পরামর্শমতে সমিতির সভ্যগণের নিকট হইতে বাকী চাঁদা আদায় করিবেন।

২য়— নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি সাব-কমিটী গঠিত হউক, যথা শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, নীলাচল মুখোপাধ্যায়, নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ পাল এবং ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)। ইঁহারা অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন। আবশ্যক মত এই কমিটী সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল। (সমিতি-সম্পাদক)।

প্রবাসে কুশদহ-বাসী

ঘোষপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক্ষণে ই,বি, রেলওয়ের ষ্টেশন-মাষ্টার। তাঁহার বয়স এক্ষণে ৪৯ বৎসর। পিতা স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত স্বর্গীয় জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যশোহর কোর্টে নাজীরের কাজ করিতেন। তথায় যোগেন্দ্র বাবু প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন। মধ্যে গোবরডাঙ্গা ইস্কুলেও কিছুদিন পড়েন, শেষে কলিকাতায় ভবানীপুর সাউথ্ সুবারবন্ ইস্কুলে এন্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ই,বি, রেলওয়ে ১৫৲ বেতনে সীগ্‌নালারের কাজ আরম্ভ করেন। ক্রমে বুকিংক্লার্ক, পরে এসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন-মাষ্টার, তৎপরে ১৮৯৯ খৃঃ হইতে ষ্টেশন-মাষ্টারের পদে কার্য্য করিতেছেন। রেলওয়ে কোম্পানীর নিয়মানুসারে তাঁহাকে বহু স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ও-দিকে সোনারপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবার, এদিকে বেণঘরে হইতে রাণাঘাট এবং দত্তপুকুর গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া উপস্থিত সাড়ে তিনবৎসর যশোহরে ষ্টেশন-মাষ্টার আছেন। এই পদের বর্ত্তমান বেতন ৯৫৲ টাকা।

ধর্ম্মপুরনিবাসী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত ১৯।২০ বৎসর বয়সে যোগেন্দ্র বাবুর বিবাহ হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রেসিডেন্সি কমিসেরিয়েট আপিসে কাজ করিতেন।

যোগেন্দ্র বাবুর ২টি পুত্র, ১টি কন্যা। প্রথম পুত্র শ্রীমান্ কিশোরীমোহনের বয়স ২১ বৎসর। এইবার বঙ্গবাসী কলেজ হইতে বি-এ পাস করিয়াছেন। কিশোরী-মোহন বিবাহিত। দিনাজপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে। ২য় পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণমোহনের বয়স ১৯ বৎসর। পাঠ্যাবস্থা। যশোহর ইস্কুলে ১ম শ্রেণীতে পড়িতেছেন। কন্যা বিধবা। বয়স ২৫ বৎসর। —দাস।

আলোচনা

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ—ত্যাগীপুরুষ ধর্ম্মাত্মা গান্ধী পরমগুরু পরমেশ্বরের প্রেরিত ত্যাগ-মন্ত্রদাতারূপে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সেই বাণী আজ সর্ব্বত্র প্রচার করচেন। সর্ব্বপ্রকার নেশা ত্যাগ কর, বিলাতী বস্ত্রাদি ত্যাগ কর, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা ত্যাগ কর, মামলা মোকদ্দমা ত্যাগ কর ইত্যাদি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ বলচেন,—"কেবল ত্যাগের দ্বারা হবে না গ্রহণও করতে হবে।" এ গ্রহণ, কি গ্রহণ? শিক্ষা।

কেন? কি জন্য আর পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে? পাশ্চাত্য শিক্ষা বেশী কি দিয়েছে—এখন আরো বেশী কি দেবে? কেবল অহঙ্কার নয় কি? বিজ্ঞান শিখতে হবে! তার জন্য আমাদের বিলাতী ছাঁচে শিখতে হবে! এমন কি কথা।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতের শতকরা দু'তিন জন শিক্ষিত, সাতানব্বুই জন অশিক্ষিত। যারা অশিক্ষিত মূর্খ তারা কি করে দেশের কথা, রাজ-নীতির কথা, স্বাস্থ্য-তত্বের কথা বুঝবে। সকলদিকেই শিক্ষার দরকার। যে একেবারে চাষা তারও আজকাল একটু শিক্ষার রস পেটে থাকা চাই নৈলে এই প্রতিযোগীতার দিনে কেবল যে, সেই সেকেলে চাষবাসে কুলোবে তাও নয়। বিদেশীয়েরা বা দেশের শিক্ষিতেরা যে অশিক্ষিতদের কাছ থেকে ঠকিয়ে নিচ্চেন—মুখের ভাত কেড়ে নিচ্চেন, তার থেকে তাদের বাঁচতে হলেও একটু চোখ ফোটার দরকার; অন্তত একটু শিক্ষার আবশ্যক। *

এপর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যয় যেরকম চড়া হয়ে উঠেছে এখন ঐ সাতানব্বুই জনের শিক্ষার সুর যদি সেই পথেই চালিত

---

* মহাত্মা গান্ধী ও কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের পরস্পর তুলনা করিবার সময় ঠিক আসে নাই। ইঁহাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সকলকথা জন-সাধারণ সকলেই বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, অথচ পরস্পরের তুলনায় একটা মত-দ্বৈধ ও দলগঠনের ভাব গড়িয়া উঠিতে পারে। এবং সম্ভবতঃ যখন উভয়ের মধ্যে কোনও মজ্জাগত পার্থক্য নাই তখন এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই ভাল। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে তাহা এই যে, আজ দেড়শত বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য ইংরাজী আদর্শে ভারতবাসীকে গড়িয়া তুলিয়া, ইয়ুরোপের শিক্ষা-দীক্ষার সহিত প্রতিযোগীতায় সমকক্ষ হইয়া ভারতবর্ষের দুর্দ্দশামোচনের চেষ্টা হইতেছিল, তাহার ফল যাহা হইয়াছে তাহা আমরা জানি। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আজ যে নূতন বাণী দেশমধ্যে প্রচার করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান অবস্থার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার সম্বন্ধে যে কতদূর আশাপ্রদ তাহা বুঝিবার আমরা সম্পূর্ণ অবসর পাই নাই। অন্নাভাবক্লিষ্ট, দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ভারতবাসীর পক্ষে যিনি তাহাদের এই দুঃখ মোচনের উপায় করিতে পারিবেন তিনিই বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসীর পরম হিতৈষী। গান্ধীর এই ত্যাগের মন্ত্রের যে ফল ফলিতেছে তাহা ইংরাজী সংবাদ পত্র "Capital"এর নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে।

Concluding a remarkably outspoken article on "Manchester and Monsoons, "The Saturday Review" of 30th July, 1921, wrote :—"Without India and the mons we (United Kingdom), as a trading nation, sink into commercial decay" The argument supporting that scurtling proposition is as follows :—"On the monsoon I depend for its rainfall ; on the Indian rainfall depends the Indian crops ; on the Indian crops largely depends our export cotton trade ; on our cotton trade depends to a great extent our other industries ; on our industries as a whole depends our national life." So there is such method in Gandhi's madness given a complete boycottof English cloth and England's raj in India will dwindle into the semblelance of power to which her hold or Canada, South Africa, and Australia has already been reduced. The total value of imports of Cotton manufactures including twist and yarn into all India was in 1920, Rs. 36, 84,01, 481 whereas in 1921 it was Rs. 16, 72, 048. কুশদহ-সম্পাদক।

করতে হয় তবে দেশের দুঃখমোচনের আশা কত দূরে? আর যেটা সোজা কথা, ঘরের জিনিষ পেটে না খেয়ে হাত ছাড়া করো না, পরণটা বাহির থেকে না-কিনে ঘরে তৈরি করে পরো, নেশার জিনিষে পয়সা এবং শরীর নষ্ট করো না—এইটে বোঝবার জন্য ইস্কুল-কলেজের দামী শিক্ষার প্রয়োজনই বা কি? সহজ কথায় কথা ভাষায় নেহাত দরকারী কথা কে-না বুঝ্‌বে? গান্ধীজী সেইপথ ধরেচেন। এও পথ বটে।

রাজর্ষি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'দেশের জিনিষ ব্যবহার করো—উৎপন্ন করো' এসব কথা আগেও বলেচেন। এখন ত্যাগের দিনে যে গ্রহণের কথা বলচেন, সে কি গ্রহণ? শিক্ষা। শিক্ষা। বটে আরো কিছু। তিনি বলচেন,—এই ত্যাগের বাণী এটা ভারতের পক্ষে সাময়িক প্রয়োজন মাত্র। কিন্তু ভারতের এবং জগতের আদর্শ তা নয়। জগতের আদর্শ 'গ্রহণ'।

আজ য়ুরোপ যে-বিদ্যায় বড় হয়েচে যে-আদর্শ দিয়ে ভারতের দরজায় ধাক্কা মারচে ভারতের তা আদর্শ নয়। কিন্তু ভারতের আদর্শ তার উপরে দাঁড় করাতে হলে, সে বিদ্যেটাও বুঝে নিতে হবে—তা তুমি যে-প্রণালীতেই সুবিধা পাও।

যে নিরন্ন দরিদ্র তার ত্যাগ শোভনীয় নয়, ভোগীর ত্যাগ প্রয়োজন। ভোগের বিদ্যা আয়ত্ত করে ত্যাগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে হবে, এযে আরো কঠিন সাধন, এর মন্ত্র ভারতের ঘরে আছে। সে-ঘরে জগতের সকল প্রার্থীকেই আসতে দিতে হবে, ত্যাগ করলে চলবে না। ইংরাজীবিদ্যা একবারে উঠিয়ে দিয়ে টোলের বিদ্যা ধরালেও চলবে না ইংরাজীর আলোকে ঘরের জিনিষগুলো খুঁজে গুছিয়ে নিতে হবে। ঐ দু-তিনজন ইংরাজী-শিক্ষিতের বংশাবলীকে এখন সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়ে গেলে ভালই হয়, ঘরের জিনিষ পাওয়ার সুবিধা হবে। বিলেতের দিকে যুবকদের যেমন চোখ পড়েচে, তেমনি ঘরের দিকে দেশী ভাবের ভাবুক হয়ে শিক্ষার পথ পরিষ্কার করতে হবে রাখতেও হবে। (দাস)

শিক্ষার মিলন

এই বিরাট বিশ্বযন্ত্রের বাহিরটা কল। এই কলের যিনি চালক তিনি যে-নিয়মে কল চালাইতেছেন, তাহা যথাযথ শাশ্বত।

"যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।"

তাঁহার শাশ্বত বিধান চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আকাশ সকলে মানিতেছে। পশ্চিম এই বিশ্ববিধানের যথাতথ্য অবগত হইয়াছে। এই কল-কবজার বিদ্যা শুক্রাচার্য্যের নিকট শিখিবার জন্য কচকে দানব-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পশ্চিম যে আজ আধুনিক পৃথিবীর উপর জয়লাভ করিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, তাহার কারণ এই যে, বিশ্ববিধানের এই বাহিরের বিদ্যায় পশ্চিম প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই সত্য আমাদিগকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, পশ্চিম বিদ্যার জোরে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

একটি উপমাদ্বারা এই বিষয়টি ব্যাখ্যাত হইতে পারে। এক ধনী পিতার দুইপুত্র ছিল। একপুত্র বড় নিরীহ, বড় পিতৃভক্ত, সে পিতার পায়ের দিকে তাকাইয়া থাকে, পিতাকে ভক্তি করিয়াই সে তাহার জীবন সার্থক করে।

দ্বিতীয় পুত্র তেমন নয়, তাহার দৃষ্টি সবদিকে, সে দেখিত তার পিতা কি করিয়া মোটর চালনা করে, মোটরের কল কারখানা কিরূপ, কেমন করিয়া উহা নাড়িয়া টিপিয়া চালাইতে হয়। একদিন সে পিতার মোটরে উঠিয়া উহা চালাইতে লাগিল। এইরূপে সে পিতার মোটর দখল করিল। মোটর চালাইবার বিদ্যা শিখিয়া সে উহা হস্তগত করিয়াছিল। প্রথম পুত্র দেখিল তাহার অন্য ভাই পিতার মোটর আত্মসাৎ করিয়াছে। সে উহা দেখিল, কিন্তু পিতার পায়ের দিকেই চাহিয়া রহিল।

পশ্চিম এমনি করিয়াই বস্তু-জগতের তাবৎ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ধনে-সম্পদে বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্বের বিরাট ভোজে পশ্চিম মোটর হাঁকাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু পদচারী পূর্ব্বদেশ এমন মন্থরগমনে তথায় উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহার তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পশ্চিম সমস্ত নিঃশেষে উদরসাৎ করিয়াছে। পশ্চিম যে আজ জগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে তাহা আকস্মিক ব্যাপার নয়, উহার মূলে তাহার বিদ্যা রহিয়াছে। ভারতবর্ষকে এই বিদ্যা পশ্চিমের কাছে শিখিতেই হইবে। এই বিদ্যা বর্জ্জন করিলে চলিবে না।

ভারতবর্ষ একসময়ে স্বতন্ত্র ছিল। এখন আর কোনো

দেশ স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বাস করিতে পারিবে না। জল স্থল আকাশ সমস্ত দিক দিয়া এখন পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে যোগ স্থাপিত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা বাধা বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা আর এখন বাধা নয়। এখন ভারতবর্ষকে আর পশ্চিমকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না।

অন্ধশক্তি ও কুসংস্কার

ভারতবর্ষ যুক্তিকে বা আত্মশক্তিকে বিশ্বাস না করিয়া যাদুকে বিশ্বাস করিয়াছে। এই দেশের লোক প্রতিদিনের জীবনের তাবৎ ঘটনার মূলে দৈবশক্তি প্রত্যক্ষ করে। বৃহস্পতির বারবেলা, রাশি, নক্ষত্র এবং কতরকমের মন্ত্র ও ভূতের ওঝা যে আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। এই অন্ধ কুসংস্কারই আমাদিগকে কর্ত্তাভজা করিয়াছে।

একপাড়ায় একবার আগুন লাগে। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"সব গ্রাম পুড়িয়া গেল, তোরা কিছুই রক্ষা করিতে পারিলি না।" তাহারা বলিল "আমাদের অদৃষ্ট মন্দ।" আমি বলিলাম "তোদের অদৃষ্ট মন্দ নয়, তোদের পাড়ায় যে কুয়া নাই, জল না হইলে কি দিয়া আগুন নিভাইবি। তোরা তোদের পাড়ায় একটা কুয়া খোঁড়।" তাহারা বলিল "কর্ত্তার ইচ্ছা হইলেই হইতে পারে।"

অন্ধ সংস্কারের ফলে আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে। যুক্তি আমরা মানিতে চাই না। "হিন্দুর কুয়া হইতে মুসলমানে যদি জল তুলিয়া লয় তাহা হইলেই ঐ কুয়া অপবিত্র হইল।" মুসলমান যে-পাত্রদ্বারা, যে-দড়ি দ্বারা জল তুলে উহা পরিষ্কার, তবে কেন জল কলুষিত হইবে?

আমাদের মনের এই ভাব সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের প্রতিকূল।

স্বরাজ

বিশ্বের যিনি স্রষ্টা তিনি আপনি সৃষ্টির আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমাদিগকে এই বিশ্বের কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে স্বরাজ প্রদান করিয়াছেন, এই স্বরাজ প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মচেষ্টায় ভোগ করিতে পারেন; কিন্তু যাহার নিজের বুদ্ধির উপর নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস নাই, তিনি কেমন করিয়া স্বরাজ ভোগ করিবেন? "স্ব"র উপর যদি আমাদের শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে বাহির হইতে সকলেই আমাদের "রাজা" হইয়া বসে। পরমেশ্বরের যাথাতথ্য বিধানের উপর, শাশ্বতী বিধির উপর আমাদের অটল নিষ্ঠা নাই। বিশ্বের এই শাশ্বত বিধি পশ্চিমের নিকট আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। পশ্চিমকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না। এই বিদ্যায় পশ্চিম হইবেন আমাদের শিক্ষক।

যে-সকল দুর্ব্বুদ্ধি ছাত্র পরীক্ষকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার উপর অযথা রোষ প্রকাশ করে তাহারা জানে না যে পরীক্ষায় পাশ হইলেই পরীক্ষকের উৎপাত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। পশ্চিমের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া লইতে পারিলেই আমরা পশ্চিমের আধিপত্য হইতে মুক্তি পাইতে পারিব। অন্য উপায়ে নয়।

পশ্চিমের ধনলুব্ধতা

আমি জানি যে এক্ষণে আমাকে এই প্রশ্ন করা হইবে যে আপনি পশ্চিমে যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে কি সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছেন? উত্তরে আমাকে বলিতে হইবে,—না।

পশ্চিম ধনসঞ্চয় করিয়াছে। সেই ঐশ্বর্য্যের দেবতা কুবের। তার মধ্যে লক্ষ্মীর শ্রী নাই। লক্ষ্মীর অন্তরে রহিয়াছে কল্যাণ, আর কুবেরের সঞ্চয়-মধ্যে বিরাজ করে ধনলিপ্সা। পশ্চিমের ধনলোভ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেছে।

"মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং"

পশ্চিম বিশ্বের বাহিরের নিয়ম আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সেইসমস্ত নিয়মের মূলে যে এক, তাহাকে স্বীকার করেন নাই। এই এককে অস্বীকার করিলে সমস্তই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

সংপ্রতি য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছে সেই মহাযুদ্ধে স্বার্থে স্বার্থে প্রবল সংঘর্ষ দর্শন করিয়া চিন্তাশীলদের মনে এই ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে যে পশ্চিম এক মহাসত্য ভুলিয়াছে। আন্তরিক কোনো গুরুতর কারণ ব্যতীত এমন মহা অনর্থ ঘটিতে পারে না। পশ্চিম বিস্মৃত হইয়াছে আমাদের সেই উপনিষদের মহাবাণী—

> "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।"

এই সত্য না পাইয়া পশ্চিম অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছে না। আমেরিকায় অভ্রভেদী ২২।২৩ তলা বাড়ীর জঙ্গল-মধ্যে দাঁড়াইয়া আমার মনে হইত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও ইহারা আনন্দ পাইতেছে না। ঐ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লক্ষ্মীর শ্রী নাই। পশ্চিমের অন্তরাত্মার নিরানন্দ মোচন জন্য তাহাকে পূর্ব্বের দ্বারস্থ হইতে হইবে।

এখন প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির সমস্যাই বিশ্ব-সমস্যা। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম "সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধৃত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহার প্রতিকারের জন্য একটা চেষ্টা আজকাল দেশের লোকের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেকে বলেন বাংলার পল্লীর যে বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ তাহা অনায়াসেই দূরীভূত হইয়া যায় যদি সকল লোকে সহর ছাড়িয়া নিজ নিজ গ্রামে বাস করে। এই কথাটার মধ্যে সবটা না হইলেও কতকটা সত্য যে নিহিত আছে তাহা নিঃসন্দেহ। কেহ কেহ পল্লীসংস্কারকের গ্রামে গিয়া বাস ব্যতীত অন্য উপায় সম্বন্ধে যে সকল চেষ্টা দেখা যায় তাহাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের শ্লেষোক্তিও করিয়া থাকেন। কথাটা যেন দাঁড়াইতেছে যে ইচ্ছা করিলেই অতি সহজে কালই অন্নক্লিষ্ট, ব্যাধি-প্রপীড়িত, ও দারিদ্র্যের কঠোর-নিষ্পেষণে-চূর্ণ বঙ্গপল্লী সমূহ অর্থ-স্বাস্থ্য-সম্পন্না হাস্যমুখী শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার কবিবর্ণিত পল্লীতে পরিণত হইতে পারে অথচ দেশের লোক তাহা করিতেছে না। যত সহজ বলিয়া মনে হইতেছে বাঙ্গালার পাড়াগাঁ-সমূহ দুর্দ্দশার যে চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে তাহার সংস্কার বোধহয় তত সহজ নহে।

কথাটাকে তলাইয়া বুঝা উচিত। যদি সহজসাধ্য ও ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইত তাহা হইলে মানুষ কি আপনার স্বভাববিরুদ্ধভাবে কেবল প্রতিকূল অবস্থার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে করিতে, পল্লীগ্রামের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনাবিল আনন্দের প্রলোভন ছাড়িয়া সহরের জীর্ণ-ভগ্ন অট্টালিকার ঘরের এক কোণে স্ত্রীপুত্র লইয়া কোনোরকমে কাল কাটাইতে রাজী হইত?

জগতের ঘটনা সমূহ কেবল মানুষের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না। এই যে দেশের লোকে পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেছে ইহা কি বাধ্যতামূলক নহে? দেশের লোকে ঘর ছাড়িয়াছে বিভিন্ন কারণে; তার মধ্যে প্রধান, চাকরি ব্যপদেশে বিদেশবাস অর্থাৎ দারিদ্র্যের তাড়নায় অর্থ উপার্জ্জন চেষ্টায় গৃহত্যাগ। দ্বিতীয়, ব্যাধির হাত হইতে নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের জীবনরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসের চেষ্টা।

গ্রামের অধিবাসীগণ সহর ছাড়িয়া সকলে নিজ নিজ গ্রামে বাস করিলে হয় ত পল্লীগ্রামের অভাব অভিযোগ অনেক কমিয়া যাইবে। কিন্তু কথাটা আদৌ "প্র্যাকৃটীক্যাল" নহে। বিবেচনা করুন যে-গ্রামে দশ বৎসরে শতকরা ২০জন করিয়া লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে, সেখানে কোন ভরসায় তাহারা যাইবে যাহারা অন্যত্র যত কষ্টেই দিনপাত করুক, ছেলে পিলেগুলার সুস্থ মুখ দেখিয়াও তাহাদের অভাব-গ্রস্ত দৈনন্দিন জীবনে কত না আনন্দ পায়? অবশ্য যদি যুদ্ধের সময় যেমন আক্রমণকারীপক্ষের প্রথম অভিযানের সৈন্যদলকে বিপুল শত্রুবাহিনীর বিপক্ষে পাঠাইয়া তাহাদের সকলেরই মৃত্যু হইতে দ্বিতীয় অভিযানের জয়ের পথ প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয় ঠিক সেইরূপ স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়া গিয়া যাহারা এখন দেশে বাস করিতে যাইবেন তাঁহারা দেশের কল্যাণে নিজের জীবন বলি দিয়া উত্তর-পুরুষগণের সুবিধার জন্য এতটা স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকেন ত সে স্বতন্ত্র কথা। প্যানামায় খুব ম্যালেরিয়া ছিল মানুষের চেষ্টাতেই সেই ম্যালেরিয়া দুরীভূত হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রথম যাহারা প্যানামা ক্যানাল কাটিবার ভার লইয়াছিল তাহাদের এক-জনও ফিরিয়া আসে নাই। সেনাদলে ভর্ত্তি না হইলে কিম্বা অনন্যোপায় হইয়া বাধ্য না হইলে বোধহয় মানুষ নিজের সম্বন্ধে এত উদাসীন ভাব ধারণ করিতে পারে না। কথাটা খুবই কাঁচা। কিন্তু এই কথাগুলি ত মাত্র কয়েকজনের কথা। দেশের মেরুদণ্ড-স্বরূপ যাহারা সেই গ্রামবাসী কৃষকবৃন্দ যে দেশ ছাড়ে নাই তাহারা তাহাদের বিবিধ ব্যাধি-প্রপীড়িত দেহে জীবনটাকে একান্ত দুর্ব্বিষহভাবে চালাইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া করিয়া কাল কাটাইতেছে। উদ্ধারের

উপায় করিতে পারিতেছে কি ? কেন পারিতেছে না ? অভাব কোথায় ?

* * * *

রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কলিকাতা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ এ্যাণ্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটি নামে একটি যৌথ সমিতি স্থাপন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ম্যালেরিয়া নিরাকরণের চেষ্টা করিতেছেন। ভাল অনুষ্ঠান যাঁহারা করেন তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। সুতরাং রায় বাহাদুরের এই প্রচেষ্টা খুবই উৎসাহ-যোগ্য। তিনি তাঁহার নিজ গ্রাম শুখচর-পাণিহাটীতে এই সোসাইটীর শাখা স্থাপন করিয়াছেন এবং ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য তাঁহাদের অবলম্বিত কেরোসিন তৈল ব্যবহারাদি ও জঙ্গল সাফ এবং বিনা-ভিজিটে ডাক্তার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাণিহাটি গঙ্গাতীরবর্ত্তী গণ্ডগ্রাম। বাংলার নিভৃত-পল্লীগ্রামের সহিত এই শ্রেণীর গণ্ডগ্রামের তুলনা ঠিক হয় না। পাণিহাটিতে শিক্ষিত ও ধনী লোকের সংখ্যা অধিকাংশ পাড়াগাঁ অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং রায় বাহাদুর তাঁহার প্রদর্শিত উপায় অবলম্বনে এরূপ গণ্ডগ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণে যেরূপ কৃতকার্য্য হইবেন অন্যত্র অপেক্ষা তাহা অনেক উৎসাহপ্রদ। পাণিহাটিতে ডাঃ রায় বাহাদুর কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সঠিক জানি না তবে, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ যে একেবারেই কমিয়া গিয়াছে তাহা ত শুনিতে পাওয়া যায় না।

কুশদহ-সমিতির ভাগ্যক্রমে রায় বাহাদুরের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্টহইয়াছে। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহারই চেষ্টায় ডাঃ বেণ্টলী প্রভৃতি গোবরডাঙ্গায় যাইয়া সভায় বক্তৃতা করেন এবং সেখানকার লোকদের মধ্যে তাঁহার এই সোসাইটি স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। এই উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ-সাহায্যও করেন। কুশদহ-সমিতির সহিত এরূপ উদ্দেশের যোগ থাকা একান্ত কর্ত্তব্য ও স্বাভাবিক। এইজন্য সমিতির চেষ্টায় গোবরডাঙ্গায় একটি শাখা স্থাপিত হয়। শাখার জীবন একবৎসরের বেশী হইয়া গিয়াছে। কাজ কিছুই হয় নাই। ইহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত, পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত বঙ্গপল্লী-হিতকর অনুষ্ঠানগুলি এত বেশী আদব-কায়দার পক্ষপাতী যে তাহার সহিত কদম বজায় রাখিয়া চলিবার সামর্থ্য এদেশের প্লীহা-যকৃতজীর্ণ লোকদের অনেকক্ষণ ধরিয়া থাকে না। সাময়িক উত্তেজনা বা ব্যক্তিগত মতলব সিদ্ধি বা আত্মপ্রসাদ ইত্যাদি কারণে হয়ত খানিক কাজ অগ্রসর হয় কিন্তু পরিণামে তাহার স্থায়ীত্ব এত ভঙ্গুর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, যেমন হঠাৎ ও উৎসাহের মধ্যে তাহাদের সৃষ্টি তেমনি ক্ষীণ ও নিষ্প্রভভাবে তাহাদের অবসান হয়। এইজন্য এইরকম পাশ্চাত্য-আদর্শ-গঠিত অনুষ্ঠানমাত্রেই এদেশে অতি অল্পদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। যেখানে উহারা টিঁকিয়া থাকে সে কেবল অর্থ-ভাণ্ডারের পরিপূর্ণতায়। চাঁদার খাতায় যেরকম আদায় হয়; এইসকল "দেশহিতকর-বৈদেশিক-অনুষ্ঠান"গুলি সেই-রকমভাবে জীবনযাপন করে।

এ্যাণ্টিম্যালেরিয়া-সোসাইটির কাজ খুবই চলিতেছে শুনিতেছি। টাকাও উঠিতেছে। ডাঃ রায় বাহাদুরের এ-বিষয়ে বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে। তিনিও নিজে চেষ্টা করিয়া সোসাইটির ফণ্ডে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাদের গ্রাণ্ট মঞ্জুর হইয়াছে এবং বাংলার পাবলিক হেলথ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই অনুষ্ঠানটির সহিত বিশেষ সহানুভূতি দেখাইতেছেন।

রুগ্ন, দীন হীন বঙ্গবাসীর নিদারুণ অভিশাপ এই ম্যালেরিয়া-ব্যাধি তাড়াইতে যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা সফলকাম হউন। ভগবান তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

কিন্তু যে-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে আপনার সুপ্ত বৃত্তিসকল জাগিয়া উঠিবে তাহা কই? "ভারতবর্ষের উদ্ধার ভারতবর্ষের পথেই হইবে"—এ-ত বর্ত্তমান সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর কথা। সুতরাং সকলদিকেই আমরা নিজেদের আদর্শবৃত্তি ও স্বভাবের অনুকূল পথ অবলম্বন করিলে তবে ত তাহাদ্বারা সফলতার দ্বারে পৌছিতে পারিব। কেবল অনুকরণ-স্পৃহা চরিতার্থ করিলে কি ফল হইবে?

ঘরের কথা

[illegible] ভদ্রগ্রামে—ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও মারপিট-সংক্রান্ত [illegible]র সংবাদ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। সম্প্রতি খাঁটুরা-হয়দাদপুর [illegible] ঐ-প্রকার মারপিট-ঘটিত একটি ফৌজদারী মোকর্দ্দমা বারাশত কোর্টে চলিতেছে। কুশদহ-সমিতির পক্ষ হইতে তাহার মিটমাটের চেষ্টা [illegible] হইয়াছে। ইহা সমিতির কর্ত্তব্য কার্য্য বটে।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বেড়গুম-নিবাসী [illegible] আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবার [illegible]চার্চ্চ কলেজ হইতে বিশেষত্বের সহিত বি-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ [illegible] "কলিকাতা ফার্ণিচার ওয়ার্কস লিমিটেড" কোম্পানীর কার্য্যে [illegible] করিতে ইচ্ছুক হইয়া কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। কুশদহের শিক্ষিত [illegible] চাকরির পথ ছাড়িয়া ব্যবসায় কার্য্যের দিকে যাওয়াই প্রার্থনীয়।

কুশদহের খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত ডাক্তারগণ একে একে অনে[illegible] পরলোকে গেলেন। সুখের বিষয় ইতিমধ্যে কয়েকটি কৃতী যুবক [illegible] হইয়া বাহির হইয়াছেন। যথা—(১) খাঁটুরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি ৬ বৎসর হইল বাহির হইয়াছেন)। (২) বেড়গুম-নিবাসী ৩৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটপ্রবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ [illegible]োপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ, (ইনি ৩ বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়াছেন)। (৩) ঐ গ্রাম-নিবাসী খুরদারোড-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার [illegible]োপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান সুবোধচন্দ্র, (৪) খাঁটুরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible]চরণ ঘোষের পুত্র শ্রীমান চারুচন্দ্র ঘোষ। (৫) ইছাপুর-নিবাসী [illegible] ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র। তাঁহাদের কেহ কেহ নাকি নিজ নিজ গ্রামে থাকিয়া চিকিৎসাকার্য্য করিবেন—এমন কি, [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা খুবই সুখের কথা কিন্তু আমরা বলি [illegible] পুরাতন বাটীতে বাস না করিয়া গ্রামের বাহিরে মাঠের ধারে—[illegible] সন্নিহিত স্থানে এক-একটি নূতন উদ্যান-কুটীর প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ডিস্পেন্সারী করুন। নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে না পারিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি?

সাময়িক সংবাদ

বর্ষার কুহু, কেকা, কদম্ব কেতকী ও পরিপূর্ণ নদী-নালার সঙ্গে সঙ্গে বোঁচ, আস্‌সেওড়া ও বাবলা গাছ বেশ পুঞ্জীভূত হইয়া কুশদহ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কেবল বিরহী যক্ষের হা হুতাশের পরিবর্ত্তে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে অধিকাংশ লোকের বাড়ীই দিন-রাত্রি বিকারের প্রলাপ শোনা যাইতেছে।

চৌবেড়িয়ার কাছাকাছি আত্রকাননে নাকি দুইটা বাঘ বড় উৎপাত করিতেছে। একজন দেশহিতৈষী, দক্ষ-শিকারীদের জানাইয়াছেন যে, তাহাদের পক্ষে বাঘ মারিবার এই একটা সুবর্ণ সুযোগ। মহামান্য প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারতে আসিলে তাঁহার শিকারের জন্য অরণ্যের বন্দোবস্ত হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বোধ হয় চৌবেড়িয়ার সংবাদ পৌঁছায় নাই। নচেৎ বোধহয় হুকুম জারি হইত যে বাঘ কেহ মারিতে পারিবে না। উত্তপ্লীহাযুক্ত-নরদেহ ও শোণিতে তাহারা পুষ্ট হউক। যুবরাজ আসিয়া শিকার করিবেন।

কুশদহ—স্থায়ী ধনভাণ্ডার

সমিতির নির্দ্ধারণ-অনুসারে পত্রিকার জন্য স্থায়ী-ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। দেশবাসী সকলের ঐকান্তিক সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। সমিতি কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দাতাগণের অর্থসাহায্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন।

দাতার নাম	দানের পরিমাণ
১। শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পা[illegible]টুরা) ...	১১১৲
২। " নীলাচল মুখোপাধ্যায় (বেড়গুম) ...	২৫৲
৩। " খগেন্দ্রনাথ পাল (বাগবাজার) ...	১০৲
৪। " হরিপ্রিয় কোঁচ (আহিরীটোলা) ...	১০৲

Printed at the Bengal Printing Works, 66 Manicktala Street, Calcutta by, N. N. Mukerjee and published by him from 87, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

নব পর্য্যায়, ১ম বর্ষ ভাদ্র, ১৩২৮ পঞ্চম সংখ্যা

কুশদহ

মাসিক পত্রিকা

কুশদহ-সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত

—o—

কার্য্যালয়—৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৵০] [প্রতি সংখ্যা ৵০

"কুশদহ"র নিয়মাবলী

১। "কুশদহ"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ২।৵০। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য তিন আনা। নমুনারও ঐ মূল্য লাগে। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে বৈশাখ হইতে কাগজ লইতে হইবে। মূল্য "সম্পাদক, কুশদহ" এই নামে প্রেরিতব্য।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের শেষ তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তিসংবাদ ডাকঘরে ও পত্রিকা-কার্য্যাধ্যক্ষকে জানানো আবশ্যক।

৩। রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে কোনো পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৪। অমনোনীত রচনা ফেরত চাহিলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় লেখা 'কুশদহে' প্রকাশিত হয় না।

৫। পুরাতন গ্রাহকগণ যে-কোনো পত্র লিখিবার সময় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৬। নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে গ্রাহক-নম্বর সহ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৌছানো আবশ্যক।

"কুশদহ"র বিজ্ঞাপনের মূল্য

১। মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা—

পূর্ণ পৃষ্ঠা ১২৲। $\frac{১}{২}$ পৃষ্ঠা ৭৲। $\frac{১}{৪}$ পৃষ্ঠা ৪৲টাকা।

২। মলাটের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা—

পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲; $\frac{১}{২}$ পৃষ্ঠা ৬৲; $\frac{১}{৪}$ পৃষ্ঠা ৩।০টাকা।

৩। বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা—

এক পৃষ্ঠা ৬৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩।০, সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা।

৪। বিজ্ঞাপনের ফর্ম্মার ১ম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা—

১ পৃষ্ঠা ৭৲, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৲, সিকি পৃষ্ঠা ২।।০ টাকা।

৫। উক্ত বিজ্ঞাপনের হার সমস্তই মাসিক।

৬। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৭। এক বৎসরের চুক্তিতে অগ্রিম টাকা জমা দিলে শতকরা ৫৲ টাকা কম লওয়া হয়।

৮। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

"কুশদহ"-কার্য্যাধ্যক্ষ

৮৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

ভাদ্র—১৩২৮

কুশদহ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

নবপর্য্যায়, ১ম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩২৮ | ৫ম সংখ্যা

ভিক্ষা

(Burns)

একবার তুমি এস বাতায়নে,
আঁখিযুগ তার অশ্রুপূর্ণ
মরিতেও যার পরাণ নাহিক কাঁদে।
এতটা নিঠুর হয়োনা হয়োনা,
হৃদয় তাহার কোরোনা চূর্ণ
ভালবাসে তোমা এই শুধু অপরাধে।
প্রতিদান তুমি দাও বা না দাও
অভাগার ভালবাসার জন্য,
এটুকু করুণা করিতে কি আর ক্ষতি ?
তুমি পবিত্রা দেবীর মতন
দূষিত বলিয়া কোরোনা গণ্য
তোমা হ'তে জাগে যেই মনোভাব, সতি।

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর।

দুটি ফুল

(শৈশবে মাতৃহারা দুইটি পল্লীবাসিনী বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত)

১

জগতের জীর্ণ আবরণ
শীত-বাতে গিয়েছিল ঝরে',
প্রকৃতির পদতলে তার
আবর্জ্জনারাশি ছিল পড়ে'।
অসময়ে ঘোর ঝঞ্ঝাবায়ু
করেছিল হেথা ছুটোছুটি,
তবু এ-কাননে দুটি ফুল
নিরন্তর রহিত গো ফুটি'।
তাহাদের অনাবৃত শিরে
বরষার বহু বারিধার
বহিত গো নিদাঘে শরতে
অশাসিত ঝঞ্ঝা অনিবার।

২

তার পর এল একদিন,
একদিন—বড়ই দুর্দ্দিন ;
মেঘরাশি ছাইল আকাশ,
দিবসের আলো হ'ল ক্ষীণ।
প্রভঞ্জন ছুটিল সরোষে
দশদিকে করিয়া ফুৎকার !
এল যেন পৃথিবীর তরে
প্রলয়ের পূর্ব্ব সমাচার !
ঝটিকার হ'ল অবসান,
আশঙ্কা সে হ'ল দূরীভূত।
যথাকার যাহা রহিল তা',
ফুল দুটি শুধু বৃন্তচ্যুত !

৩

বসন্তের সযত্ন-রচিত
সুশ্যামল পল্লব-শাখায়
একটুকু পেয়েছিল স্থান,
বৃন্তচ্যুত ফুল দুটি হায় !
স্নান করি' নিশার শিশিরে,
দলগুলি রহিত সরস,
সুধাংশুর স্নিগ্ধ কররাশি
তাহাদের করিত পরশ !
এখনো রয়েছে দুটি ফুল
ফুটি' সেই বিজন নিভৃতে,—
পথশ্রান্ত পথিকে নীরবে
বুকভরা স্নেহপ্রীতি দিতে।

শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মা।

পরলোক

"বল দেখি ভাই কি হয় মলে।" এই কথা অল্লাধিক সকলের মনেই সময় সময় উদয় হয়। মরণের পর কি অবস্থা হয় তা দেখে এসে কেহ সাক্ষ্য দি, সে উপায় নেই। তবে যে দু'একটা প্রবাদবাক্য শোনা যায়, সেগুলিও সকলের বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিম্বা সূক্ষ্মদর্শী সাধক—যোগীগণ যে ভাবের কথা বলেন, সেটাও 'জ্ঞানাভাস'; তা বাদে সবটাই বিশ্বাসের কথা, অথবা শাস্ত্রের কথা। সত্যই এ-বিষয়ে বিশ্বাসের পথ ছাড়া যে নিশ্চিত বিষয় কেহ কিছু পেয়েছেন তা বলা চলে না। যা-হোক্ এ-সম্বন্ধে কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেরই একটা-না-একটা ধারণা থাকা চাই। বর্ত্তমান সময়ের একজন মহাত্মা বলেছিলেন, "পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাসটা ব্যাঞ্জনে নুন দেওয়ার মতো অর্থাৎ না হলেও চলে না, বেশী হ'লেও মুস্কিল।" পরলোক সম্বন্ধে একটু স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন মতের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে শাস্ত্রানুরাগী সাধকগণ যদি এতে সায় না দেন ক্ষতি নেই, স্বাধীন চিন্তাশীলগণ যদি তাঁদের চিন্তাপথে কিছুমাত্রও সাহায্য পান সেইটেই যথেষ্ঠ।

প্রথম কথা—সাধকের মনে ঈশ্বর-বিশ্বাস * ঠিক হয়ে গেলে, তার সঙ্গে এ-জ্ঞান আসা খুব স্বাভাবিক যে, ভগবান্ আমাকে ইহলোকের পাপ তাপ অজ্ঞানতার পথ থেকে যখন উদ্ধার করে সৎপথে নিয়ে চলেচেন,—আমি তো আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা জানতুম না, তখন পরলোকেও আমার যা সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, তিনি তাই করবেন। কোথায় কি-ভাবে—কোন্ অবস্থায় রাখবেন তা এখন জান্তে না পারলেও সে-বিষয়ে আমার ভাববার কোনো কারণ নেই, তিনি শিবম্—মঙ্গলময়। আমার বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহ-জীবন।

দ্বিতীয় কথা—বিশ্বাসের ভূমি হ'তে সাধক যখন আত্ম-জ্ঞানের সোপানে ওঠেন, তখন দেখেন, "আমি আত্মা।" অর্থাৎ আমি দেহ নই। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। পরমাত্মা পরমেশ্বর পূর্ণ অনন্ত জ্ঞানময়। আমি ক্ষুদ্র হই যা হই স্বরূপে এক। আমার স্বরূপও জ্ঞান। জ্ঞান অব্যয় অবিনাশী। মরে দেহ, আত্মা মরে না। সুতরাং ভগবানের সঙ্গে আমি নিত্যকাল থাকবো। কিন্তু আমিত্ববিহীন—অথচ বোধশূন্য হয়ে নয়। জ্ঞান কখনো বোধশূন্য হ'তে পারে না। তা হ'লে সম্ভোগ থাকে না, দু'য়ের যোগেই আনন্দসম্ভোগ।

এই জ্ঞানের ধারণা, আত্মদৃষ্টির সাধন—অর্থাৎ ধ্যান সাধনা করতে করতে জন্মায়। তার আগে দেহাত্মবোধ থাকা পর্য্যন্ত জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি না হওয়ায়, জ্ঞানের সূক্ষ্ম কোনো ধারণা পরিষ্কার হয় না। মুখে "আমি কিছুই নই" বল্লে কোনো ফল নেই—তাতে দেহাত্মবোধ যায় না, যতক্ষণ না আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শনের পর মানবের যে-অবস্থা হয়—সে যেমন আগুণ কাপড়ে চাপা থাকে না তেমনি একটা অবস্থা হয়—তাকেই বলে "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি ছিদ্যতে সর্ব্বসংশয়া" সকল সংশয়-রহিত মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয়। সাধক তখন মৃত্যুভয়ের অতীত অবস্থা উপলব্ধি করে আত্মতৃপ্ত শান্ত—আনন্দময় স্বরূপে পরিণত হন।

এই অবস্থায় বোঝা যায় পরলোক কোনো স্থানে আবদ্ধ নয়। সেখানে চন্দ্রসূর্য্যযুক্ত জগৎ বা দেশকালে বদ্ধ যে এই শরীর, তা তো আর থাকে না। কেবল জ্ঞানের ব্যাপার। (জ্ঞানের স্বরূপ কি তা এ-প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়, স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তার আলোচনা হ'তে পারে) জ্ঞানের সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি না থাকলে, জ্ঞানের কোনো অস্তিত্ব বোঝায় না, ইচ্ছাশক্তি থাকলে কর্ম্মও থাকা আবশ্যক। নিষ্ক্রিয় ইচ্ছাকে ইচ্ছাশক্তি বলা চলে না। দেহ না থাকলে কর্ম্ম হবে কিরূপে? এ বড় মুস্কিলের কথা; কিন্তু আত্মজ্ঞানীর কাছে এ-সন্দেহ আসে না। যতক্ষণ ঐ দেহাত্মবোধ থাকবে, ততক্ষণ দেহশূন্য কর্ম্মের স্বভাব—এমন-কি অস্তিত্বের ধারণায়ও সন্দেহ হয়। (এইজন্য পুনঃ পুনঃ দেহধারণ বিশ্বাসটা খুব ব্যাপক) অথবা কাল্পনিক বিশ্বাস ছাড়া বেশী কিছু লাভ হয় না।

জ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তি মূলে অভিন্ন একই শক্তি। এক পৃষ্ঠায় স্থিতিশীল শক্তি, অপর পৃষ্ঠায় গতিশীল শক্তি। দেহাবস্থায় জ্ঞানই যখন কর্ম্মের কর্ত্তা, তখন জ্ঞান থাকতে কর্ম্ম থাকবে না কেন? সে-কর্ম্মের (বিদেহী অবস্থায়) গতি বা স্বভাব কি-প্রকার তার ব্যাখ্যা থেকেই অনেক

* বিশ্বাসো ধর্ম্ম মূলংহি।

কল্পনার সৃষ্টি হয়। যা-হোক্ সে-বিষয়েও পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা চলিতে পারে। আজ এই পর্য্যন্ত।

—চির-দাস।

পল্লীপালন

যে-অশান্তির প্লাবনে দেশ ডুবিয়া গিয়াছে, যাহার পীড়নে দেশের লোকের শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে, তাহার হেতু কি জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে অনেকরকম জবাব করেন। ঐসব জবাবের মধ্যে কতক বা ভ্রান্ত, আবার কতক বা সত্য হইলেও নিতান্ত আংশিক। যাহা সত্য অথচ সম্পূর্ণ, তাহা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান মনু তাঁহার সংহিতায় বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

যদ্ রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্॥

মনু—৮ অধ্যায়—২২ শ্লোক।

অর্থাৎ যে-রাষ্ট্র শূদ্রবহুল, নাস্তিকাক্রান্ত ও দ্বিজশূন্য তাহা দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধিপীড়িত হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এখন এই মহাজন-বাক্যটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

রাষ্ট্র—রাষ্ট্র বলিতে বুঝায়, কোনো এক বিশেষ শাসন বিধি দ্বারা অনুশাসিত প্রজাসমষ্টি। শূদ্র—শূদ্র বলিতে বুঝায় সেবাজীবী। শূদ্রের আর একটি নাম "বৃষল," ইহাতে শূদ্রের আর একটি কর্ম্ম পাওয়া যায়, সেটি কৃষি। সুতরাং শূদ্র শব্দের লক্ষ্য বস্তু হইল—সেবাজীবী (চাকুরীজীবী) ও কৃষিজীবী। নাস্তিক—নাস্তিক শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, ব্যক্তি অর্থে এবং গ্রন্থ অর্থে।

(ক) ব্যক্তি অর্থে নাস্তিক দ্বিবিধ। যিনি পরলোক ও ঈশ্বর মানেন না, তিনি নাস্তিক। আবার যিনি ঐ দুটিকে মুখে মানিলেও কাজের বেলায় মানার পরিচয় দেন না, তিনিও নাস্তিক।

(খ) গ্রন্থ অর্থে,—যে-সকল গ্রন্থ শুধুই যুক্তিপ্রধান বলিয়া ঈশ্বরপ্রাধান্যের কোনো কথাই কয় না; যে-সকল গ্রন্থ পাঠকের গোচরে বা অগোচরে ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, বস্তুসকল স্বভাবতই উৎপন্ন হইয়াছে, ঈশ্বর কাহারো কর্ত্তা নহেন, ভগবৎনির্ভরতা দুর্ব্বলতা মাত্র, সেইসকল গ্রন্থকে নাস্তিক গ্রন্থ বলে।

দ্বিজ—দ্বিজ বলিতে বুঝায় বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণশ্রেণী। ইহাদের মধ্যে বৈশ্যের কর্ত্তব্য হইতেছে—বীজসকলের বপনস্থানবিশিষ্ট হওয়া, ক্ষেত্রের গুণদোষজ্ঞ হওয়া, ক্ষেত্রমান ও তুলামানজ্ঞ হওয়া, পশুসংরক্ষণ জন্য পশুস্বাস্থ্য, পশু-চিকিৎসা ও পশুবর্দ্ধনপ্রথাবিৎ হওয়া, বিভিন্ন দেশ ও ভাষাজ্ঞ জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়া, সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্যের অর্থবলাবল ও কুসীদকর্ম্মে দক্ষ হওয়া, দেশের শিল্প ও ধনোন্নতিকল্পে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া, এবং এইসমস্ত শিক্ষায় পারদর্শী হইবার জন্য ব্রাহ্মণ আচার্য্যের নিকট বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করা।

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য হইতেছে—দস্যুতস্কর শত্রু হইতে রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা, চরকর্ম্ম রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি দেশবিদ্যা যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতিতে কুশল হওয়া এবং এতদর্থে ব্রাহ্মণ আচার্য্যের নিকট বৈদিকজ্ঞানলাভ করা।

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইতেছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তাহাদের নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মানুযায়ী সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দান করা, দেশ ও কাল অনুসারে সকলের জীবিকার উপায় নির্দ্দেশ করা এবং জীবিকাসঙ্কট উপস্থিত হইলে তাহা দূর করিবার উপায় আবিষ্কৃত করিয়া সাধারণ লোকসকলকে তাহার উপদেশ দেওয়া। আর সামাজিক শিক্ষক বলিয়া নিজের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, প্রকৃতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিষ্ঠা, সদাচার পরিরক্ষণ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের উপাসনায় আদর্শ ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া ত্যাগ, ভগবৎভক্তি ও ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করাও ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য মহাব্রত।

ভগবান মনুর সংজ্ঞা-অনুসারে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটির শব্দগুলির অর্থ করা হইল। এখন যদি নিজেদের গায়ে হাত দিয়া কথা বলিতে হয় তবে অবশ্যই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যেহেতু আমাদের দেশ চাকরীজীবী, চাকরীলোলুপ ও কৃষিজীবীতে প্রায় পরিপূর্ণ; সেইজন্যই আমাদের রাষ্ট্র শূদ্রবহুল হইয়া গিয়াছে। জড়বাদ-প্রচারী শিক্ষকের অধ্যাপনায় ও শিক্ষাপদ্ধতির গুণে এবং প্রায়শ নাস্তিক্যভাবোদ্বোধক গ্রন্থরাশির অধ্যয়নের ফলে আমাদের রাষ্ট্র নিতান্তই নাস্তিক্যভাবদুষ্ট, অতএব মানসিক বলশূন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আর পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন বৈশ্য-

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের অভাবে আমাদের রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষেই বিজশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা যখন এইরূপ তখন এই রাষ্ট্র নিত্য দুর্ভিক্ষাক্রান্ত এবং নব নব ব্যাধিপীড়িত হইয়া নিঃশেষে ধ্বংস হইবে না কেন? আর ধ্বংসের বাকিই বা আছে কতটুকু? অভাব অনাটন, রোগ শোক, দৈন্য হাহাকার, অনৈক্য বিদ্বেষ, ক্রূরতা কপটতা, দুর্ভিক্ষ মহামারী তো দিন দিন হু হু করিয়াই বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ আমরা বেশ উদ্বেগশূন্য, নিশ্চিন্ত!

আমাদের মরণপথ যে নিত্যই প্রশস্ত হইতেছে তাহা কি আমরা দেখিতেছি? গত বৎসর যাহাদিগকে বিজয়ার আলিঙ্গন করিয়াছিলাম এ বৎসর তাহাদের মধ্যে কতজনকে পাইলাম না। তাহারা চলিয়া গিয়াছে। কেন গেল? তাহাদের অকালযাত্রা কি খুব স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়? তাহাদের বাটীতে যাহারা শুধু নিষ্ফল বিলাপের জন্য পড়িয়া রহিল, তাহাদের গতি কি হইল, কেহ কি তাহার খবর রাখিয়াছি? এসব কি আদৌ ভাবিবার কথা নয়? ভাবিয়া পরস্পরের হাত ধরি, মরণের দিকে পিছন করিয়া একবার জীবনের দিকে মুখ ফিরাই, নিজেকে বাঁচাই, অপরকেও বাঁচিতে সাহায্য করি; শুভ হইবে। মরণের কোলে সাধ করিয়া বিছানা না পাতিয়া আমরা সকলে মিলিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করি। জীবনের সাধ কাহারো এরি মধ্যে ফুরায় নাই সুতরাং এখন আমাদের কর্ত্তব্য অনুসন্ধান ও অনুষ্ঠান।

অনুসন্ধান ঠিকমত না হইলে, এলোমেলো অনুষ্ঠানে কোনো কল্যাণই সাধিত হয় না। রোগনির্ণয় না করিয়া যা' তা' আন্দাজী ঔষধে রোগ সারিবার সম্ভাবনা খুব কম; হয়ত তাহাতে রোগ বাড়িয়াই যায়। হিত করিতে বিপরীত হইয়া পড়ে। এই বিপরীতের শঙ্কা কমাইবার জন্য প্রথমে অনুসন্ধান আবশ্যক। কিন্তু এই অনুসন্ধানটি আবার যথোপযুক্তভাবে কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে আমাদের কার্য্যক্ষেত্রেরও একটা সীমা ঠিক করিয়া লওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য মনে করা হউক আমাদের গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী আর পাঁচখানা গ্রাম লইয়া আমরা একযোগে প্রাণপণে কাজ করিব। "পরস্পরের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সহায় হইব, কেহ কাহারো অনিষ্ট করিব না, কেহ কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিব না" এই প্রতিজ্ঞা লইয়া কাজ করি। কেন?—বাঁচিবার জন্য।

অনুসন্ধান—আমাদের কাজের প্রথম অবস্থাই হইতেছে অনুসন্ধান। তাই নিম্নলিখিত প্রণালী-অনুসারে কাজ করিলে আমরা সহজে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিব।

১। গ্রামে কয়ঘর লোক? প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর লোকসংখ্যা কত? ইহার মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা কত? তাহারা লিখিতে ও পড়িতে জানে কি না?

২। তাহাদের সংসার চলে কেমন করিয়া, তাহাদের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কিরূপ?

৩। গ্রামে পুষ্করিণী কয়টা ও তাহাদের জলের অবস্থা কেমন? কয়টা পুষ্করিণীর সত্বর পঙ্কোদ্ধার প্রয়োজন ও তাহাদের দৈর্ঘ্য বিস্তার গভীরতার পরিমাণ কি? তাহাদের মালিকের নাম কি?

৪। গ্রামে কয়বিঘা জমিতে ধান, ডাল, আলু প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়? যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাতে সমগ্র গ্রামখানির লোকসংখ্যার অনুপাতে কতদিন চলিতে পারে?

৫। গ্রামখানি বর্ষার পর প্রকৃষ্টভাবে শুকাইবার অবসর পায় কি না অর্থাৎ জঙ্গল, খাল, বিল, ডোবার অবস্থা প্রভৃতি কেমন? উহাদের মালিক কাহারা?

৬। গ্রামে কোন্ কোন্ ব্যাধি কোন্ কোন্ সময়ে প্রকাশ পায়? চিকিৎসার উপায় কিরূপ?

৭। গ্রামে পাঠশালা, বাজার, হাট, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি আছে কি না? যদি থাকে তাহাদের অবস্থা ও ব্যবস্থা কেমন?

৮। পূজা-পরবে গ্রামে মেলা বা বারোয়ারী উৎসব প্রভৃতি হয় কি না? তাতে ধুমধাম হয় কেমন?

৯। গ্রাম হইতে কোন্ কোন্ দ্রব্য ব্যবসায় বাবদে বাহির হইয়া যায়? তাহাদের পরিমাণ ও মূল্যের হার কিরূপ?

১০। পাটের চাষ কি পরিমাণে হয়?

১১। গোচারণের মাঠ আছে কি না? গ্রামে গোরুর সংখ্যা কত?

১২। গ্রামের লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য, মানসিক প্রবৃত্তি—যথা, ধর্ম্মানুরাগ, মোকর্দ্দমানুরাগ, দশের জন্য কর্ম্মানুরাগ, সরলতা প্রভৃতি—কেমন?

১৩। গ্রামের রাস্তা-ঘাট কেমন ও কতগুলি? উহারা কোন্ বোর্ডের এলাকাধীন।

এমনি করিয়া প্রত্যেক গ্রামের এক এক খানি কোষ্ঠী-পত্র তৈয়ার করিয়া তবে প্রতিকারের কাজে নামিতে হইবে। ইহার জন্য যেরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

১। গ্রামের সকলকে ডাকিয়া অথবা প্রত্যেকের বাড়ী গিয়া আমাদের কাজের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি বুঝাইয়া দিতে হইবে ও তাহাদিগকে আমাদের মতাবলম্বী করিতে হইবে।

২। প্রত্যেকে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া একটা "সমবায়-তহবীল" স্থাপন করিতে হইবে। এই তহবীলের পরিচালন-ভার গ্রামের ভাল ভাল লোকের হাতেই থাকিবে এবং টাকা পোষ্ট আফিস সেভিংস-ব্যাঙ্কে রাখিতে হইবে।

৩। এই "সমবায় তহবীল" হইতে প্রথম কাজ হইবে জলকষ্ট দূর করার চেষ্টা। এইজন্যে যেসকল পুষ্করিণী পল্লীর খুব নিকটে বলিয়া সকলে ব্যবহার করে, পঞ্চায়েৎ করিয়া সেইসকল পুষ্করিণী জমা লইয়া পঙ্কোদ্ধার পূর্ব্বক মাছের ব্যবসা করিতে হইবে। ইহাতে তহবিল মারা পড়িবে না, পুষ্করিণী ভাল হইবে, মাছ সুলভ হইবে, বিশুদ্ধ জলের জন্য ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিবে।

৪। ইহার মধ্যে (পঞ্চায়েৎ করিয়া) এক এক পল্লীর জন্য এক একটি পুকুর শুধু পানীয় জলের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। তাহাতে যেন কেহ কাপড় না কাচে, বাসন না মাজে, স্নান না করে, গোরুর গা না ধোয়ায়।

৫। ধানের চাষ বাড়াইয়া (বিশেষত আউশ) ধর্ম্মগোলার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ এড়ানো যাইবে।

৬। গ্রামের সমস্ত কৃষকের চেষ্টার ফলে যে-ধান পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ করিতে হইবে। কোনো কৃষক গ্রামের বাহিরে কাহাকেও ধান বেচে কি না লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি ধান বিক্রয় করা তা'দের প্রয়োজন হয়, তবে সমবায় তহবীল হইতে ঐ ধান কিনিয়া "ধর্ম্মগোলায়" মজুত করিতে হইবে। ধান যেন বাহিরে না যায়।

৭। ডাল, কড়াই, আলু, গুড়, সর্ষপ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম চালাইতে হইবে।

৮। প্রতি দুইটি বা তিনটি গ্রামের সকল গৃহস্থের নিকট হইতে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা লইয়া এক একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে হইবে। যাহারা চাঁদার অর্থ নগদ দিতে পারিবে না, তাহাদের নিকট হইতে উহা মরশুম অনুসারে ফসলে আদায় করিয়া "ধর্ম্মগোলা"-জাত করিয়া বিনিময়ের পয়সা চিকিৎসা-ফণ্ডে দিলে চলিবে।

৯। Life Insurance এর বদলে অল্প চাঁদায় Death Benefit Fund এর প্রতিষ্ঠা করিয়া দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই চাঁদার টাকা এই মিলিত গ্রামকয়খানির ব্যবহার্য্য কাপড়ের ব্যবসায়ে খাটাইয়া বাড়াইয়া লইতে হইবে।

১০। সমবায়-তহবীলের টাকায় বা গ্রামবাসিদের দু'চার জনে মিলিত হইয়া ছোট ছোট ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে।

১১। এই ব্যবসায়-সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যাহার যেটি জাতিগত ব্যবসায় তাহাতে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য আমাদের সকলকেই যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে হইবে। একের জাতিগত ব্যবসায় অন্যে কাড়িয়া লইলে জীবিকাসঙ্কট উপস্থিত হয়। এর ফলেই দেশে ও সমাজে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়।

১২। দশটা-চারটা পাঠশালা না করিয়া একবেলা পাঠশালা করিতে হইবে। তাহাতে বালকেরা মধ্যাহ্নে আহার করিতে পারিবে। সুতরাং অসময়ে আহারের ফলে অম্ল, অজীর্ণ দুর্ব্বলতা প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিবার অবসর পাইবে।

১৩। ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড ও লোকাল্ বোর্ড সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে।

১৪। আয়বৃদ্ধির চেষ্টা যেমন দরকার, অনাবশ্যক ব্যয় কমাইবার চেষ্টাও তেমনি দরকার। এজন্য কতকগুলি মোটামুটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। যথা—

(ক) বেশী দাম দিয়া জুতা পরিব না, চামড়ার ব্যাগ বাক্স প্রভৃতি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না এইসকল দ্রব্য ব্যবহারের ফলে দেশে গোহত্যার স্রোত

বাড়ে। ক্যাম্বিশের ব্যাগ ও টিনের বাক্স থাকিলেই চলিতে পারে।

(খ) খদ্দরের তৈয়ারী সাদা-সিধা মেরজাই বা তাহার উপর একটা কোটের অধিক জামা গায়ে দিব না। এইরূপ ব্যবহারকে সমাজের "ফ্যাসানে" দাঁড় করাইতে হইবে।

(গ) এসেন্স মোটেই ব্যবহার করিব না। ডাক্তারীর অপরিহার্য্য জিনিষ ব্যতীত অপর কোনো বিদেশী কাচের জিনিষ কেনার প্রয়োজন নাই।

(ঘ) কাচের চুড়ির বদলে মেয়েদের হাতে শাঁখা পরার ব্যবস্থা করিব। ইহাতে জাতি-ভাই দুমুঠা ভাত পায়।

(ঙ) বুনিবার পশম, সুতা, কাঠির বদলে টেকো ও চরখার চলন করিতে হইবে। আটপহুরিয়া কাপড় ঘরের সুতায় হওয়া চাই।

(চ) ছেলেপিলেকে দামী কাপড় পরাইয়া অনর্থক বাবু করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ বিলাসপ্রিয়তা ও নানা মানসিক দুঃখের পথ পরিষ্কার করা ঠিক নহে।

(ছ) মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা থাকিলে সালিসী করিয়া মিটাইতে হইবে—আদালতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দলাদলি ভুলিতে হইবে।

(জ) চা খাইব না। চা বাগানে যা হয় তাহা তো খবরের কাগজে পড়িয়াছি ইত্যাদি।

এমনি করিয়া গ্রামের সকলেই যদি "রেষারেষি" ভুলিয়া নিজের নিজের ও সমষ্টিগত উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া সমস্ত গ্রামখানিকে একটি পরিবারের মত করিয়া তুলিতে পারি তবেই ভগবানের আশীর্ব্বাদে আবার দেশের শ্রী ফুটিয়া উঠিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়—বেড়গুম।

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা দেশের যে-কোনো হিতকর কাজের জন্য অগ্রসর হই, আমাদের চেষ্টা ক্ষণস্থায়ী হয় কেন? কারণ আমাদের সকল চেষ্টাই বাহিরের জিনিষ মাত্র, অন্তঃপুরে তাহা প্রবেশ করে না। নারীর অন্তরের দেবতা সেইজন্য এদেশে নিদ্রিত, মূর্খ থাকিয়াও তাহাদের মনে কষ্ট নাই। আলো, বাতাস, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম্ম, মুক্তি সর্ব্ববিষয় হইতেই তাহারা বঞ্চিতা। ঘরের মেয়েরা আমাদের ত্যাগের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আমরা কেবল গর্ব্ব করিয়াই সুখী হই যে, নারী ঋক্‌মন্ত্রের রচয়িত্রী, নারী দর্শনেরও বিচার করিতেন,—এদেশের স্ত্রীশিক্ষার মত গৌরবের ও মহিমান্বিত এমন আর কোনো দেশে নাই। মৈত্রেয়ী, গার্গী, অরুন্ধতী, বিশ্ববারা, অপালা, লোপামুদ্রা, অদিতি, যমী প্রভৃতি শত শত আর্য্য-নারীগণ পৃথিবীর ইতিহাসে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের রাজকন্যা সুমেধা, চর্ম্মকার-কন্যা শুভা ও বারাঙ্গনা অম্বপালী ব্রতধারিণী ভিক্ষুণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। সংসারের দৈনিক কার্য্যের মধ্যে, পতিপুত্রের সেবা ও লালন-পালনের মধ্যেও সেকালের মহিলাগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের এই কুশদহের ২৩৮ খানা গ্রামের মধ্যে খাঁটুরা ও গোবরডাঙ্গায় দুইটিমাত্র বালিকাবিদ্যালয় আছে, সেখানে ছাত্রীসংখ্যা নিতান্ত কম। গ্রামে কেহ কেহ বলেন যে মেয়েদের শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই। জগতের অন্যান্য দেশের নারীগণ যখন বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বেরই রসাস্বাদ করিতেছেন, কবির তুলিকা ও জ্ঞানীর চক্ষু লইয়া লীলাময়ী প্রকৃতিদেবীর রহস্য জানিতে পারিতেছেন, দ্যুলোক-ভূলোকস্থ কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, গ্রহনক্ষত্র, মহান্ সমুদ্রগর্ভস্থ প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি এবং মানুষের অন্তর্জ্জগতের দুরূহ তথ্য তাহাদের বুদ্ধিকে শক্তিসম্পন্ন করিতেছে, তখন আমাদের দেশের স্ত্রীজাতি কেবল মাত্র সামান্য বিদ্যালব্ধ প্রীতিরসপূর্ণ পত্র লিখিতে পারিলেই কি আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি?

মানবসমাজ কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে, তাঁহারা তাহা অবগত নহেন। অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিন, আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির বিবরণ, কোথায় কোন্ নগর, নদী, বন, উপবন, পাহাড়, নির্ঝরিণী আছে, কত লোকের বাস, পূর্ব্বে আমাদের আচার-পদ্ধতি ধর্ম্ম কর্ম্ম কেমন ছিল, আমারা কোথা হইতে

আসিয়াছি, এদেশে কতদিন বাস করিতেছি, তাহাও তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানা আবশ্যক সে-জ্ঞানও তাঁহাদের নাই। সংসারে আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য যে সামান্য গণিত জানা আবশ্যক তাহাও জানা নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে শিক্ষা ভিত্তিহীন; কোন্ মত কি-কারণে বিশ্বাস করেন, তাহা জানেন না। মঙ্গলামঙ্গল-বিষয়ে স্বামীকে সৎপরামর্শ দান বা বিধবা হইলে পরের গলগ্রহ না হইয়া স্বামীর সম্পত্তি-রক্ষার জন্য যে-জ্ঞান আবশ্যক তাঁহাদের তাহাও নাই। বস্তুত এমন কোনো বিষয়ই নাই যে তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন। সব বিষয়ে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যাহারা নারীকে অল্পবুদ্ধি মনে করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কবে করিয়াছেন? শিক্ষা দিবার পর ও যদি নারী তাহা অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারেন, তখন তাঁহাদিগকে অল্পবুদ্ধি বলা যাইতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

জননী সুশিক্ষিতা হইলে শৈশবকাল হইতে বালকবালিকার সুশিক্ষার সুবিধা হয় এবং কালক্রমে বালক গৃহকর্ত্তা হইলে বাল্যকালের সুশিক্ষা ও সুব্যবহারের ফল দেখাইতে পারে এবং গৃহকর্ত্তা ও গৃহিণী শিক্ষিত হইলে পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য যে-ব্যবস্থা করেন, তাহা ভালই হয়। যাহারা বলেন যে, বালিকাগণ ইস্কুলে পড়িতে গেলে অবরোধ-প্রথা শিথিল হইবে এবং স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে আবদ্ধ না থাকিলে তাঁহাদের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, তাঁহাদের আশঙ্কা ভিত্তিহীন। ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে আরবা ও পারস্য উপন্যাস রচিত হইত না। মানুষের মন—স্ত্রী বা পুরুষের, কখনো চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না। মানুষ যদি সৎবিষয়ে চিন্তা না করে, তাহার মন অসৎপথে যাইবেই। সৎ ও অসৎ বিষয়ক চিন্তার মধ্য পথ নাই। মানুষ হয় উঠিবে না হয় পড়িবে। সেইজন্য আমাদের নারীগণকে সুশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। নতুবা তাঁহারা শিক্ষাহীনতায় নিমজ্জিতা থাকিলে, সময় কাটাইবার জন্য তাঁহারা পরনিন্দা, গৃহকলহ প্রভৃতি মন্দ বিষয়ে রত থাকিবেনই। লেখাপড়ায় মনযোগ দান যে অসৎচিন্তা নিবারণের প্রধান উপায়, ইহা সকলেই জানেন। রমণীগণকে আহার হইতে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুপথে নিপতিত করা যদি পাপ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে জ্ঞানের রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত করা অধিকতর পাপ। সুকুমার-মতি বালিকাকে কষ্টপ্রদান করিতে যাহার হৃদয় ব্যথিত ও কুণ্ঠিত হয়, তিনি কোন্ প্রাণে শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা রাখিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় মন, আশাভরসা, শিক্ষাদীক্ষা নষ্ট করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা চিন্তা করাও যায় না। নিরক্ষরা বা নিতান্ত অল্পশিক্ষিতা বালিকার সহিত বিবাহ যে কত অসুখকর, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। স্ত্রী অশিক্ষিতা বলিয়া কত বিবাহিত জীবন যে বিষময় হইয়াছে এবং কত যুবক যে চরিত্র কলুষিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অর্থাভাবে চরিত্র বিসর্জ্জনের শত শত উদাহরণ সকলেই জানেন। অনেক বিধবা পরের গলগ্রহ না হইয়া যদি বালিকা ও অন্তঃপুরস্থ নারীগণকে শিক্ষাদান করিয়া এবং সূচীশিল্প চরকা প্রভৃতির সাহায্যে নিজেদের ভরণ-পোষণের উপযোগী অর্থোপার্জ্জন করেন, তাহাতে শিক্ষা-বিস্তারেরও সাহায্য হয় এবং তাঁহাদের দুরবস্থারও লাঘব হয়।

স্ত্রী শিক্ষিতা হইলে স্বামীর মহৎ কার্য্যে অনেক সাহায্য করেন। যে-পুরুষের মাতা, কন্যা এবং স্ত্রী শিক্ষিতা, তাহারা বিশেষ ভাগ্যবান। স্ত্রীলোকেরা একত্র হইয়া নানাপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মালোচনা করিয়া নিজেদের মানসিক উন্নতিলাভ করিতে পারেন এবং দেশের উন্নতির উপায় নির্ণয় করিতে সক্ষম হন।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, লেখাপড়া না করিলে কি ক্ষতি হয়? স্ত্রীজাতির অবস্থা-সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাঁহারা কি মানুষ নহেন? তাঁহারা যেমন আহার নিদ্রা এবং সামান্য কাজকর্ম্ম করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতে ভালবাসেন, পুরুষেরাও সেইরকম স্ত্রীলোকগণকে বুদ্ধিহীনা বলিয়া ঘৃণা করে এবং কথায় কথায় উপহাস করিয়া বলে যে "ও মেয়েমানুষের কথা, উহা ছাড়িয়া দাও।" ছোট ছোট বালকেরা দুইএকখানা পুস্তক পড়িয়া তাঁহাদের ভুল ধরে, কথা শুনিয়া হাস্য করে, ইহাতে তাঁহাদের কতদূর লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। তাঁহার

চক্ষু থাকিতে অন্ধ, মুখ থাকিতে বোবা! কোনো স্থান হইতে যদি একখানা আবশ্যকীয় পত্র বা তারের সংবাদ আসে, লেখাপড়া না জানায় কত ক্ষতি হয়। আবশ্যকীয় সংবাদ লিখিতে তাঁহারাও পারেন না। দূরদেশে আত্মীয়-গণের নিকট মনোভাব প্রকাশের উপায় নাই, সমস্ত বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। দেখা যায় যে আমাদের দেশে স্ত্রীপুরুষে প্রায়ই মনের মিল নাই। শিক্ষার অভাবই তাহার প্রধান হেতু। শিক্ষিত স্বামী মূর্খা স্ত্রীর সহিত ক্ষণকাল জ্ঞান, শাস্ত্র, সমাজ বা দেশের অবস্থা-সম্বন্ধে কথা কহিতে পারেন না, তাঁহারা কেমন করিয়া সুখী হইবেন? ভাল ভাল পুস্তকে কত জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিজ্ঞানের কথা লিখিত আছে, তাহা পড়িলে অনেকসময় পুত্রকন্যা বা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে মানুষ শোকে সান্ত্বনা লাভ করে। শিক্ষার অভাবে স্ত্রীলোকদেগের মধ্যে এত কলহ ও অশান্তি দেখা যায়। এইজন্য পুরুষেরা অনেক সময় গৃহে থাকিতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা সামান্য বিষয় লইয়া অহঙ্কার করে, পরস্পর হিংসা করে। স্ত্রীলোকের দোষে কত ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয়, কত সংসার নষ্ট হয়। তাহাদের স্নেহ ও ভালবাসার আস্পদ-গণের অশিক্ষা বা কুশিক্ষা-নিবন্ধন কত অনিষ্টসাধন হয়। অজ্ঞানতার জন্য মাতৃদোষে কতশত শিশু সূতিকাগৃহে বা অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাংলা দেশের সরকারী স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিবরণীতে অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার মাতার শিক্ষাহীনতার কারণ বলিয়া প্রতিবৎসর উল্লিখিত হইতেছে। তথাপি আমাদের চেতনা হয় না। কত হিন্দুমেয়ে পুস্তক লিখিয়া বা মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সংসার প্রতিপালন এবং দুঃখের সংসার সুখময় করিতেছেন। ইহার জন্য লজ্জা করিলে নিজেরই ক্ষতি হইবে। যদি আপনাকে ভাল রাখিয়া চলা যায়, কোনো ভয় নাই। হয়ত কিছুদিন সামান্য উপহাস বা কথা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু কালে সকলে শিক্ষিতা নারীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া ধন্য ধন্য করিবে। ভগবান সকল শুভ কার্য্যের সহায়।

কিন্তু শিক্ষার অর্থ আমরা ইহা বুঝি না যে, মেয়েরা নাটক পড়িয়া সময় কাটাইবে। শিক্ষা তাহাকে বলিব, যাহাতে স্ত্রীজাতি আবার জ্ঞানদায়িনী, শক্তিদায়িনী মা হইয়া জীবনকে নূতন ছন্দে বাঁধিবে। নারী আবার মাতৃত্বের গৌরব বুঝিবে। নারীর শৃঙ্খল মুক্ত হউক। নবযুগের নবমন্ত্রে সকলরকম মুক্তির মধ্যে দেশে আবার সীতার মত সতী, রাজপুত-নারীর মত বীরাঙ্গনা, মৈত্রেয়ী গার্গীর মত বিদুষী আবার আবির্ভূত হউন। *

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত—খাঁটুরা।

মার্কিণ দেশে

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার

আমরা নরহত্যাকারীকে যথেষ্ট ঘৃণা করি এবং চরম দণ্ডে দণ্ডিত করি। কিন্তু আমাদের দেশ ভারতবর্ষে আমরা কেন অবাধে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে প্রতি বৎসর ১,১৩০,০০০ লোক হত্যা করিতে এবং ১০০,০০০,০০০ অপেক্ষাও বেশী লোক আক্রমণ করিতে দিই? আমরা কেন ইহার কোনো প্রতিকার করি না? অবশ্য আমাদের অর্থাভাব, আমাদের দারিদ্র্যই ইহার প্রধান কারণ। মার্কিণ দেশে কিরূপে স্বল্পব্যয়ে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইতেছে তাহা আমাদের জ্ঞাত হওয়া উচিত। সেখানে Red Cross Society, State Board of Health ও United States Public Health Service পরস্পরের সহিত একযোগে মিলিত হইয়া প্রাণপণ উদ্যমে দক্ষিণ জর্জ্জিয়া হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সেখানে প্রতি লোকপিছু ম্যালেরিয়া প্রতিকারের ব্যয় কত অল্পে হইতেছে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। সেখানে আর্কান্সাস্ ও মিসিসিপি প্রদেশে সম্প্রতি যে-উপায়ে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইতেছে আমাদের দেশে সেইউপায় অবলম্বন করিলে ১০০০ অধিবাসী-যুক্ত ছোট ছোট সহরে অতি অল্প ব্যয়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে সহরের অধিবাসীর সংখ্যা যত বেশী হইবে, প্রতি লোকপিছু ব্যয় তত অল্প হইবে। শেষোক্ত দুই প্রদেশে নিম্নোক্ত উপায় সমূহ ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য অবলম্বন করা হইয়াছিল।

(১) মশক বংশের বিনাশ সাধন।

(২) নির্দ্দিষ্ট স্থানের অধিবাসীদিগের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক লোক্কে কুইনাইন নিয়মিত সেবন করান।

(৩) নির্দ্দিষ্ট স্থানের অধিবাসীদিগের বাসস্থানগুলি ধাতু নির্ম্মিত জাল দিয়া বেষ্টন করা।

---

* খাঁটুরা বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক সভায় পঠিত।

আর্কান্সাসের অন্তঃপাতী ক্রসেট্‌নগরে ২১২৯ জন লোকের বাস এবং এইস্থানে শতকরা ৬০ ভাগ রোগী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এইস্থানের খাল বিল ও ডোবার মধ্যে অনেকগুলি বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং বাকিগুলি হইতে সহজে জল নিকাশ হইবার উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নদীর কিনারার জঙ্গল সাফ করা হইয়াছিল এবং উভয় পাড় এইরূপে ঢালু করা হইয়াছিল যে, নদী প্রস্থে ঈষৎ কমিয়া গেলেও উহার স্রোতের বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যে-সকল জলাশয় বুজানো অসম্ভব হইয়াছিল সেগুলি পরিষ্কার করাইয়া তাহাতে ছোট ছোট মশা-খেকো মাছ ছাড়া হইয়াছিল এবং প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক জলাশয়ে একপর্দ্দা কেরোসিন তৈল ছড়ানো হইত। ভগ্ন কলসী হাঁড়ি বালতি প্রভৃতিতে জল জমিলে পাছে সেইগুলিতে মশা ডিম পাড়ে এই আশঙ্কায় এইপ্রকার জিনিষ জড় হইবামাত্র সরাইয়া ফেলা হইত। এইসকল উপায় এ-বিষয়ে শিক্ষিত লোকের তদারকে এবং সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে করা হইয়াছিল। ইহার ফলে এক বৎসরের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মশকবংশ বিনষ্ট হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া রোগীকে দেখিবার জন্য এইস্থানের চিকিৎসকদিগের ডাক কিরূপ বৎসরের পর বৎসর কমিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিলেই এইসকল উপায় অবলম্বনের ফল কিয়ৎপরিমাণে প্রতীয়মান হইবে। ১৯১৫ সালে ম্যালেরিয়া রোগী দেখিবার জন্য ক্রসেটের চিকিৎসকগণের ২৫০০ ডাক হইয়াছিল, ১৯১৬ সালে অর্থাৎ এইসকল উপায় অবলম্বনের একবৎসর পরে এইসকল চিকিৎসকের ম্যালেরিয়া রোগী দেখিবার ডাক কমিয়া ৭৪১ হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে ইহা ২০০ হইয়াছিল এবং ১৯১৮ সালে মাত্র ৭৩ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তিনবৎসরে ম্যালেরিয়া রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসকের ডাক শতকরা ৯৭ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। প্রথম বৎসর এইসকল উপায় অবলম্বনের ব্যয় প্রতিলোক-পিছু ৩৷৷০ টাকা, ২য় বৎসর ২৷৷০ টাকা এবং তৃতীয় বৎসর ১৷৷০ টাকা হইয়াছিল। যে-পরিমাণ চিকিৎসকের ব্যয় বাঁচিয়াছিল, তাহার তুলনায় এই ব্যয় যৎসামান্য সন্দেহ নাই। ক্রসেটের নিকটবর্ত্তী আরো পাঁচটি ছোট সহরে এইসকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলও সেইরূপ সন্তোষজনক হইয়াছিল। আর্কান্সাসের অন্তঃপাতী চিয়াকট্‌ হ্রদের তীরে গরীব কাফ্রিগণ কুটীরে বাস করে। সেইস্থানে ম্যালেরিয়া ও মশার খুব প্রাদুর্ভাব। এইসকল কুটীর সম্পূর্ণরূপে ধাতু-নির্ম্মিত জাল দিয়া বেষ্টন করা হইয়াছিল এবং কুটীরের অধিবাসীদিগকে সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হইতে বিশেষরূপে নিষেধ করা হইয়াছিল। প্রত্যেক বাটী জাল দিয়া ঘিরিতে গড়ে ৪০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং এইসকল জাল গড়ে দুই বৎসরে নষ্ট হয় না ধরিলে বাৎসরিক ২০৲ টাকা (প্রত্যেক বাটীর জন্য) এবং প্রতিলোক-পিছু ৩৷৷০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ইহার ফলে ম্যালেরিয়া অনেক কমিয়াছিল।

অপর একস্থলে একটি স্রোতহীন বিলের নিকটস্থ আবাদে অত্যন্ত মশা ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। তথায় প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোককে সপ্তাহে উপরি-উপরি দুইদিন সকালে ৫ গ্রেণ ও বৈকালে ৫ গ্রেণ করিয়া দশ গ্রেণ কুইনাইন্ সেবন করানো হইত। পনেরো বৎসর বয়সের নীচের বালকবালিকাদিগকে প্রতি তিনবৎসর বয়সের জন্য একগ্রেণ হিসাবে কুইনাইন্ উপরিলিখিত নিয়ম অনুসারে সেবন করানো হইত। এই উপায়ে এক-বৎসরে শতকরা ৬০ ভাগ ম্যালেরিয়া কমিয়াছিল। ইহার জন্য প্রতিলোক-পিছু ১৷৷০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। জার্ম্মাণ ডাক্তার ককের (Koch) মতানুযায়ী শরীরস্থ ম্যালেরিয়া-বীজাণু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিবার জন্য প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোক প্রতিদিন ১০ গ্রেণ এবং বয়সানুসারে বালকবালিকাগণ কম পরিমাণে কুইনাইন্ সেবন করিয়া মিসিসিপির অন্তঃপাতী সান্‌ফ্লাওয়ারে ১০০ বর্গমাইল পরিমাণ ভূমির ৯০০০ অধিবাসী অতি সুন্দর ফল পাইয়াছিল। এইভূমি ডোবা-খাল-বিল-পূর্ণ ছিল। এইস্থানের অধিকাংশ অধিবাসী জাতিতে কাফ্রি। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৪০ জনের ১ বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া হইয়াছিল। এবং বাকী অধিবাসীর মধ্যে পরীক্ষা করিয়া শতকরা ২২ জনের রক্তে ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু পাওয়া গিয়াছিল। ডাক্তার ককের উল্লিখিত উপায় অবলম্বনের পর এইস্থানের ম্যালেরিয়া শতকরা আশি ভাগ কমিয়া গিয়াছিল।

ম্যালেরিয়া দূর করা আমাদের নিজেদের হাতে। আমরা ইচ্ছা করিলেই আমাদের বাসস্থান হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইয়া ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। উল্লিখিত ঘটনাসকল তাহার জলন্ত প্রমাণ। *

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি।

স্বর্গীয় পতিতপাবন সিংহ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্য দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী বাংলার বালকবৃদ্ধযুবা সকলের নিকট সুপরিচিত। পরমহংসদেবের সাধনার স্থান বলিয়া অনেকে অনেক সময় তীর্থদর্শন হিসাবে সেখানে গিয়া থাকেন। স্থানটিও পরম রমণীয়। অতি ঘোর সংসারীও ঐস্থানে গেলে সকলজ্বালা ভুলিয়া যায়।

এই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী কলিকাতা জানবাজারের মাড়বংশের রাণী রাসমণির মহীয়সী কীর্ত্তি। বিশেষত বিগ্রহসেবা, অতিথি ও সাধুসন্ন্যাসীর পরিচর্য্যার জন্য তিনি যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পরই তাঁহার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু কাহার সদুপদেশে এই বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন।

কুশদহবাসিগণ হয়ত শুনিয়া সুখী হইবেন যে, গৈপুরের সিংহবংশের একজন সাধুপুরুষের সদুপদেশে এ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। তাঁহারই নাম ৺পতিতপাবন সিংহ। এই সিংহবংশের অনেক কৃতী সন্তান বিদেশে বিপুল বিত্ত উপার্জ্জন করিয়া যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। পঞ্জাব রাওলপিণ্ডিতে রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র সিংহের নাম প্রসিদ্ধ। কটকের অন্যতম উকিল শ্রীমান সতীশচন্দ্র সিংহ নিজের অমায়িকতায় সকলের নিকট আদৃত। তাঁহার ভ্রাতা নরেশচন্দ্র পুরীতে ওকালতী করিতেন।

মাড়বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রীতিরামের একটিমাত্র পুত্র রাজচন্দ্র বিপুল ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি দুইটিমাত্র কন্যা ও বিধবা পত্নী রাসমণিকে বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া অল্পবয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। শুনিতে পাওয়া যায় সন্দিগর্ম্মিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কাজেই উইল করিয়া যাইবার সময় পান নাই। যাহাহউক উপযুক্ত দেওয়ান পতিতপাবনের সাহায্যে রাসমণি বেশ যোগ্যতার সহিত কাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য অর্থকষ্টে পড়িতে হইয়াছিল।

রাজচন্দ্র অতি উদারহৃদয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কেহ টাকা ধার চাহিলে সামান্যভাবে লেখাপড়া করিয়া কখনো বা আদৌ লেখাপড়া না করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতেন। কোনো কারণে মৃত্যুর কয়েকদিন বা কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে দুইলক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দেওয়ানের নামে লিখিয়া দিয়া ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলেন। একথা আর কেহই অবগত ছিল না। দেওয়ান ইচ্ছা করিলে ঐ-টাকা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সেরূপ প্রকৃতি নয়। তিনি সেই টাকা রাসমণিকে দিলেন। রাসমণি তো একেবারে অবাক। তদবধি তিনি দেওয়ানকে "বাবা" বলিতেন। দেওয়ানও তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। দেওয়ানের উপদেশ ভিন্ন তিনি কোনো কাজ করিতেন না। দেওয়ান বেতনের টাকা ভিন্ন একটি পয়সাও গ্রহণ করেন না জানিয়া তাঁহার বাটীতে পূজা-পার্ব্বণের খরচ রাসমণি ষ্টেট হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি দেওয়ানের বাসাখরচও দিতেন। এ-বাসাখরচ সামান্য ছিল না। দেওয়ানের আত্মীয় জ্ঞাতি গুরুপুরোহিতের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ প্রায়ই তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। যাঁহার যতদিন ইচ্ছা বাসায় থাকিতেন—সিংহমহাশয় কখনো কাহাকেও অন্নদানে কাতর হইতেন না। যাইবার সময় সকলকেই সাধ্যানুসারে বিদায় ও প্রণামী দিতেন।

কোনোসময়ে কলিকাতার একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত জমি লইয়া রাসমণির বিবাদ উপস্থিত হয়। কলিকাতার অনেক বড় লোক তাহাতে মধ্যস্থতা করিয়া বিবাদ আপোষে মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। জয়ের আশা নাই বুঝিয়া বিবাদী ব্যক্তি পতিতপাবনকে কৌশলে অর্থলাভ দেখাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, পতিতপাবনের নিস্পৃহতা কিরূপ। যিনি প্রস্তাব করিতে গিয়াছিলেন তিনি ব্রাহ্মণ—সুতরাং তাঁহাকে

---

* Journal of American Medical Association for November 8th, 1919 দেখুন।

মিষ্ট ভর্ৎসনা ভিন্ন আর-কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার সেই কথায় ব্রাহ্মণ এতদূর অনুতপ্ত হইয়াছিলেন যে, আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এইকথা রাসমণির কর্ণে পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। পুরস্কারস্বরূপ তিনি দেওয়ানের বাড়ী পাকা ইমারত করিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এবং নিজের লোক দিয়া উহা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। সেইসময়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কলিকাতা সহরে আর কেহই ছিলেন না। ইংরাজমহলে তাঁহার যেরূপ মান-সম্ভ্রম ছিল এপর্য্যন্ত আর কোনো বাঙালীর ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই। তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগান-বাটীতে বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ইংরাজই অতিথি হইতেন। তিনি প্রথমে নিমক-মহলের দেওয়ানী চাকরী করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। পরে স্বাধীন-ভাবে ব্যবসা চালাইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ, কার্য্যপটু, বিষয়বুদ্ধি ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন অতি অল্প-লোকই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ব্যাঙ্কপরিচালনার ক্ষমতা বাঙালীর আছে কিনা তাহা তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বাধীনভাবে কারবার চালাইয়া ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় অনেক সিভিলিয়ান তাঁহার প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশবাসীকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প করিয়া তিনি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই।

যখন তিনি কার-ঠাকুর কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সর্ব্বময় কর্ত্তা, সেইসময় তিনি রাজচন্দ্র মাড়ের নিকট হইতে তিনলক্ষ টাকা লইয়াছিলেন। ঐ টাকার কোনো নিদর্শন ছিল না। একমাত্র পতিতপাবনই এইবিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু রাজচন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পরে ঐ টাকা প্রিন্স দ্বারকানাথের নিকট চাহিতেও কাহারো সাহসে কুলাইল না। কাজেই সিংহ মহাশয় একটি কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রভুপত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি দ্বারকানাথকে জানাইলেন যে,—"রাণী রাসমণি বিষয়সম্পত্তি হাতে লওয়া পর্য্যন্ত কোনো বিশয়ের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। অতএব আপনি দয়া প্রকাশে জানবাজারের বাটীতে পদার্পণ করিয়া যদি তাঁহার বিষয়-পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইল তিনি একান্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিবেন।" ইহা শুনিয়া প্রিন্স দ্বারকানাথ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং জানবাজারের বাটীতে যাইবার দিন স্থির করিয়া দিলেন। দেওয়ানজীর ইঙ্গিতমত রাসমণি পর্দ্দার আড়াল হইতে দেওয়ানজীর উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। রাসমণির আদেশমত দেওয়ানজী কাগজপত্র বুঝাইয়া দিবার একটা সময় লইলেন। ষ্টেটের কাগজের হিসাব প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহাতে স্থির হইল যে, ষ্টেটের যে-টাকা যখন আমদানী হইবে তখনই তাহা ব্যাঙ্কে জমা হইবে এবং খরচের আবশ্যক হইলে ব্যাঙ্ক হইতে আনিয়া খরচ করিতে হইবে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ যে-দিন ষ্টেট বুঝিয়া লইবেন স্থির ছিল, সেদিন যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তাঁহার কথা-মত কাগজপত্র সব প্রস্তুত হইয়াছে। দেওয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালন করিবার অর্থাৎ কাগজপত্র বুঝাইবার জন্য হাজির হইয়াছেন। লৌহ-সিন্দুকের চাবিও আসিয়াছে। কিন্তু রাসমণি অনাহারে অতি বিষণ্ণ-বদনে রহিয়াছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বারকানাথ জানিতে পারিলেন যে নানাকারণে রাসমণির প্রায় তিনলক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে। ষ্টেটের পরিচালন-ভার দ্বারকানাথের হস্তে যাইতেছে শুনিয়া সে-সব পাওনাদারেরা আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দেনা পরিশোধের উপায় করিতে না পারায় স্বয়ং রাসমণিও অনশনে আছেন। শুনিয়াই দ্বারকানাথ পাওনাদারদিগের প্রাপ্য পরদিন মিটাইয়া দিবেন বলিলেন। পূর্ব্বশিক্ষা-অনুসারে সে-সকল পাওনাদারেরা পরদিবস টাকাপ্রাপ্তির আশায় ভুলিল না। ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিল। রাসমণিরও আহার হয় না। কাজেই দ্বারকানাথ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিয়া রাসমণিকে দিলেন। সেদিন আর বিষয় বুঝিয়া লওয়ার অবসর হইল না। পরদিন যথাসময়ে দ্বারকানাথ আসিয়া যথারীতি রাসমণিকে সংবাদ দিলেন। কিন্তু অন্যান্য দিন রাসমণি যেমন ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিতেন আজ তাহা হইল না। তাঁহার শিরঃপীড়া বোধ হওয়ায় তিনি দেখা করিতে না পারিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন।

এই সিংহ দেওয়ানের উপদেশেই দক্ষিণেশ্বরে কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প হয়। শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ গৈপুর।

প্রতিধ্বনি

জার্ম্মানীতে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকগণের আদর

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, যখন এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চ্চা ও অধ্যয়নার্থ অবস্থিতি করিতাম, তখন আমার মনে নিরন্তর এই চিন্তা উদিত হইত যে, ইউরোপে এই কোপারনিকস্, গালিলিও, কেপ্‌লার্, নিউটন্ প্রভৃতির সময় হইতে বিজ্ঞানে নবযুগের অবতারণা হইয়াছে, আর ভারত কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে! আবার ঠিক্ সেইসময় বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকায় দেখিতাম, জাপান-বাসীরা মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মোটামুটি ধরিতে গেলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন, আর আমাদের দেশে ইহার সূচনা সেই রামমোহন রায়, ডেভিড্-হেয়ার-প্রমুখ মহাত্মাগণের সময় হইতে। কত আগে এখানে আরম্ভ, কিন্তু প্রতিযোগিতায় ভারত আজ কত পশ্চাতে! আমি প্রায়ই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতাম, এবং এই বলিয়া নীরবে অনেক সময় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি,—হায়, এমন দিন আমাদের কবে আসিবে, যখন বাঙ্গালীরা—ভারতবাসীরা—কেবল পরান্নভোজী হইয়া থাকিবে না, তাহারাও নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবে। আমি পঁয়ত্রিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম যে, আমার ডাক আসিতেছে পরীক্ষাগার হইতে; ঈশ্বরের আহ্বান, মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ২৫ বৎসর যাবৎ কাল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু ও আমি ঈশ্বরের কৃপায় এই নূতন অধ্যায়ের উদ্ঘাটন করিতে কতদূর সক্ষম হইয়াছিলাম তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিবার এখনও সময় আসে নাই—১৯১০ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত এই ৪।৫ বৎসর আর এক নূতন যুগের প্রারম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৯০১ সালে প্রথম বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মৌলিক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদত্ত হয়। পর পর শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমান পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি আমার সহিত মিলিত হইয়া ছাত্ররূপে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন ও লণ্ডন কেমিকেল সোসাইটির মুখপত্র পত্রিকাতে তাঁহাদের প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু পূর্ব্বকথিত ১৯১০ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। এইসময় শ্রীমান্ রসিকলাল দত্ত ও শ্রীমান্-নীলরতন ধর মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়া বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীমান্ নীলরতন যখন এম্-এস্-সির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তিনি হিন্দু হষ্টেলে বাস করিতেন। সেই সময় তাঁহার পক্ষপুটে 'জ্ঞান'দ্বয় (শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ও শ্রীমান্ মেঘনাদ সাহা অবস্থিতি করিতেন। নীলরতন যদিও মাত্র দুই বৎসরের অগ্রণী, কিন্তু ইঁহারা তিনজন নীলরতনকে জ্যেষ্ঠের মত দেখিতেন। আমিও ইঁহাদের গুণে এতদূর মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে সর্ব্বদাই হষ্টেলে যাইয়া ইঁহাদের সহিত মেলামেশা করিতাম। প্রত্যহ ময়দানে কিছু সময় ইঁহাদের সহিত কাটাইতাম। ইঁহারা যে আমার শিষ্য তাহা ভুলিয়া যাইতাম; ইঁহাদের সঙ্গ পরম সুখদায়ক হইয়াছিল। ইঁহারা ছিলেন আমার সচিব, কলাবিধৌ প্রিয়শিষ্যাঃ। বলিতে গেলে নীলরতনই ভারতবর্ষে ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রীর পথ-প্রদর্শক। ইঁহার প্রতিভায় ও উদ্দীপনায় "জ্ঞান"দ্বয় অনুপ্রাণিত হন। আই-এস্-সি উত্তীর্ণ হইবার পর শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঠিক করিতে পারেন নাই, ইংরেজি পড়িয়া এম্-এ দিবেন বা বিজ্ঞান পড়িতে থাকিবেন। কিন্তু যখন বি-এস্-সি দিয়া দেখিলেন নীলরতন গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়া এম্-এস্-সির সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার পথ ঠিক্ করিয়া লইলেন। তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন, কোন্‌পথে তাঁহাকে যাইতে হইবে। এম্-এস্-সির পরীক্ষার জন্য তিনি যে স্বাধীন গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ দাখিল করিলেন, তাহাতে যে তিনি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন তাহা নয়, তাহা আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটীর পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হইল এবং বিজ্ঞানজগতে তিনি অচিরেই প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। শ্রীমান্ নীলরতন

এইসময়ে সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাতে গেলেন ও পর পর লণ্ডন ও প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার প্রবৃত্ত হইলেন এবং উভয় স্থানেই বিশিষ্ট রকম প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

১৯১৬ সালে স্যার্ তারকনাথ পালিত ও স্যার্ রাসবিহারী ঘোষের দেশহিতৈষণা ও বদান্যতায় বিজ্ঞানকলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধলেখককে রসায়ন-বিভাগের ভার লইতে আহ্বান করেন। সেই সঙ্গে 'জ্ঞান'দ্বয় ও মেঘনাদ সহকারী অধ্যাপকের পদে বৃত হইয়া এই কলেজে যোগদান করিলেন।

'কেন' ও 'কি প্রকারে,' এই প্রশ্ন সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া স্বতঃই সমাধানের জন্য মানবহৃদয়ে জাগরূক হইয়া আসিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে একস্থানে দেখা যায়, উদ্দালক আরুণি একটু লবণ জলে গুলিয়া তাহার বিশেষত্ব থাকে কি না, জলের প্রত্যেক পরমাণুতে লবণের পরমাণুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় কি না, এই প্রশ্ন তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তিনহাজার বৎসর ধরিয়া এই লবণের পরমাণুসংহতি জলে কিভাবে অবস্থান করে, তাহার কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আর্হেনিয়স্, অসটোয়াল্ড্ প্রমুখ মনীষীগণ এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। জলে লবণের পরমাণুসংহতি যখন গুলিয়া যায় তখন ইহার উপাদান সোডিয়ম্ ও ক্লোরিনের পরমাণু যথাক্রমে সংযোগ-তড়িৎযুক্ত ও বিয়োগ-তড়িৎযুক্তভাবে অবস্থিতি করে। গত ৪০ বৎসর যাবৎ এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তিস্বরূপ লইয়া একটি পরীক্ষামূলক শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক জগতে সমস্ত ঘটনাবলী কতকগুলি নিয়মের অধীন। এই যে গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারাও অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী, এবং এই নিয়ম হইতে কখনও 'রেখামাত্রম্' ব্যতিক্রম হয় না। এই কারণে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারেন, কোন্ সময় গ্রহণ হইবে বা কখন কোন্ বিশিষ্ট ধূমকেতুর আবির্ভাব হইবে। জলে দ্রবনীয় বিশ্লিষ্টমান যাবতীয় পদার্থের প্রতি আর্হেনিয়াস ও অসটোয়াল্ডের তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় না, শুধু কয়েকটিমাত্র পদার্থের সম্বন্ধে এই নিয়ম সম্পূর্ণ খাটে। এই বিষয়ে গত ত্রিশবৎসর যাবৎ অনেক বিজ্ঞ রাসায়নিকের বহু গবেষণা সত্ত্বেও কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কেহ পারেন নাই। শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চারিবৎসর হইল, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া একটি তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন। এই জটিলতত্ত্ব যুগপৎ গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটিতে প্রচারিত হইবামাত্র তিনি যশস্বী হন। অতঃপর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পর পর কয়েকটি গবেষণা দ্বারা রসায়নশাস্ত্রের একটি অজ্ঞেয় তমসাবৃত অধ্যায় আলোকিত করেন।

"ঘোষের নিয়ম" ("Ghosh's Law") বৈজ্ঞানিক জগতে কিরূপ আদর লাভ করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে। গত এপ্রেল মাসে ডাঃ মেঘনাদ সাহা লণ্ডনে ছয়মাস অবস্থিতি করিয়া বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গমন করেন। সেখানে বিজ্ঞানমন্দিরে যাইবামাত্র অধ্যাপক নার্ন্‌সট্ তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ডক্টর গক্‌কে চেনেন?" মেঘনাদ একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, "আমি তো এ-নাম কখন শুনেছি বলে মনে হয় না।" নার্ন্‌সট বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি! ডক্টর গক্ আপনার স্বদেশী; আমরা সম্প্রতি ফিজিক্যাল সোসাইটীর একটি বৈঠক আহ্বান করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিকের আসরে গকের নিয়ম আলোচনা করিয়াছি।" মেঘনাদ তখন সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "মাপ করুন, আমি এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই; আপনি জার্ম্মান ভাষায় যাহা গক্ বলিয়া উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা তাহাকে 'ঘোষ' বলি; ডক্টর ঘোষ বরাবর আমার সহাধ্যায়ী ও সুহৃৎ।" নার্ন্‌সট্ তখন আবার গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ঘোষ যুগান্তর-সংঘটনকারী গবেষণার সূচনা করিয়াছেন।" এখানে এই জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকের পরিচায়ক দুই-একটি কথা বলা দরকার হইতে পারে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের গণিতমূলক ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি আজকালকার শ্রেষ্ঠতম গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি এ-সম্বন্ধে যে-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্রই ঐ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া গৃহীত হইতেছে। সম্প্রতি এই পুস্তকের নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে। তাহাতে "ঘোষের নিয়ম" বিস্তৃত-

ভাবে আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমরা সকলে (অস্টোয়াল্ড্, আরহেনিয়স্, নার্ন্‌স্ট্, প্রভৃতি) এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু সফল হই নাই ; এতদিন পরে ডক্টর ঘোষ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা বড়ই সমীচীন এবং এই জটিল তত্ত্বের সুন্দর মীমাংসা হইয়াছে।" এখানে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বকথিত বৈঠকে নার্ন্‌স্ট্, আইন্‌স্টাইন্, প্লাঙ্ক, লাউয়ে—প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন, এবং প্রত্যেকেই মহারথী। "ঘোষের নিয়ম" ইঁহারা সকলেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিনয়ের আধার। বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্।

শ্রীমান্ জ্ঞান যখন বার্লিনে যান, তখন নার্ন্‌স্ট্ তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, আপনি যদি এখানে আর কিছুদিন অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমরা "অতিরিক্ত" অধ্যাপক বলিয়া গ্রহণ করি। (জার্ম্মানীতে অধ্যাপক হইতে হইলে নানাবিধ সাধ্য-সাধনা ও বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন। প্রথমে private docent হইয়া তাঁহাকে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হয়। যদি তাহাতে ছাত্র আকৃষ্ট হয় ও বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অতিরিক্ত অধ্যাপক ও ইহার পর পুরা অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।) কিন্তু এইসময় শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

এখন শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। ইনি ফিজিক্যাল্ কেমিষ্ট্রীর অন্তর্ভূত কলইড্ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এবং সম্প্রতি ডক্টর অব সায়েন্‌স্ এর জন্য গবেষণা-মূলক যে-সমস্ত প্রবন্ধ দাখিল করিয়াছেন তাহা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হইয়াছে।

শিরিষ, শ্বেতসার, গঁদ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদিগকে যদি জলে দ্রবীভূত করা যায় এবং দ্রবীভূত এই-সব দ্রব্য পার্চ্‌মেণ্ট কাগজে কিম্বা ভেড়ার পাকস্থলীর পাৎলা চামড়ার পোঁটলা বাঁধিয়া জলের মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ভিতরের দ্রব্য জলের মধ্যে কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু লবণ বা চিনি জলে গুলিয়া যদি এইভাবে প্রলম্বিত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, সেগুলি আস্তে আস্তে বাহিরে জলের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে ,পরন্তু জলও পোঁটলার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঐ-সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন যদি লবণ ও গঁদ একসঙ্গে জলে গুলিয়া ঐরূপভাবে রাখা যায় তো লবণ গঁদ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। ভাতের ফেনকে গলিত শ্বেতসার বলিলেই চলে। এই-সমস্ত দ্রব্যকে শিরিষজাতীয় (colloids) বলা হয়। আমাদের আহার্য্য পদার্থের অধিকাংশ এই শ্রেণীভুক্ত। পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য কি-প্রকারে পরিপাক হয়, তাহা শরীরতত্ত্বঘটিত রসায়নীবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। এইকারণে কলইড্‌দের গুণ, স্বরূপ ও প্রকৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতেছে। গত ২৫ বৎসর যাবৎ ইহা রসায়নশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি নূতন শাখা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে এবং বড় বড় রাসায়নিক ইহার আলোচনাকে জীবনের ব্রত বলিয়া লইয়াছেন। শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ-বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং এম্-এস্-সি পরীক্ষার জন্য ইহাই বিষয়ীভূত করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। পরীক্ষায় শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র প্রথম স্থান ও শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইঁহারা উভয়েই একসঙ্গে বিলাত গমন করেন এবং আরব্ধ কার্য্য সম্বন্ধে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী কলেজে আরও নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনে কলইডস্ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি বৈঠক বসে। ইউরোপের যত রাসায়নিক এ-বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে স্বয়ং উপস্থিত হন বা প্রবন্ধ পাঠান। শ্রীমান "ছোট" জ্ঞানও এইসভায় তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহূত হন। আমি এই সভায় দর্শকভাবে উপস্থিত ছিলাম। জ্ঞানও তাঁহার প্রবন্ধে একটি নূতন 'নিয়ম' (law) উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ দ্বারা শ্রীমান্ কি-প্রকার খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের অন্যতম মুখপত্র নেচ্যার (Nature) পত্রিকা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

"Of all the papers read before the meeting that by Mr. J. N. Mukherjee was the most important in that it worked out a new theory."

এই প্রবন্ধটি এইশাস্ত্রে বিশারদ জার্ম্মান পণ্ডিত অস্টোয়াল্ড তাঁহার মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন।

শ্রীমান্ মেঘনাদের বিষয় কিছু লিখিতে আমার বাধ-বাধ ঠেকে। যদিও ইনি বি-এস্‌-সি অধ্যয়নকালে জ্ঞানদ্বয়ের সহপাঠী ছিলেন, কিন্তু গণিতশাস্ত্র ইঁহার প্রতিভা-বিকাশের ক্ষেত্র। গণিতশাস্ত্রমূলক পদার্থবিদ্যায় মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এস্‌-সি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইনি গত বৎসর লণ্ডনে যান। সেখানে কিছুকাল গবেষণা করিয়া সম্প্রতি জার্ম্মেনীতে গিয়াছেন। ইনি হাল নাগাদ প্রায় বিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া সম্প্রতি লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটীতে এষ্ট্রোফিজিক্‌স্ সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ পড়েন, তাহা মুদ্রিত হইয়া আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে গ্রহনক্ষত্রদিগের উপাদান-ঘটিত অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আইনস্‌টাইনের আপেক্ষিকতা (Relativity) তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া ইনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার প্রতিভার পরিচয় একনিশ্বাসে দেওয়া যায় না। Physica নামক পত্রিকায় অধ্যাপক গ্রট এইবিষয়ে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, এখানে তাহার কয়েকটি ছত্রমাত্র উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।—

"I wish to point to the fact that his is the honour of being the first to introduce the theory of selective radiation pressure as a possible explanation for the phenomena in the outer layer of the sun."

অর্থাৎ এই গূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন বিষয়ে অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া জয়মাল্যের তিনিই অধিকারী হইয়াছেন।

ম্যুনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Sommerfeld পদার্থ-বিদ্যার আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি মেঘনাদের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, মেঘনাদকে তাঁহার গবেষণা-বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ছাত্রাবস্থা হইতেই মেঘনাদ জার্ম্মান্ ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গণিত ও জ্যোতিষমূলক পদার্থবিদ্যায় শ্রীমান্ মেঘনাদের সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ আছেন কি না আমি জানি না। তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমান্ নীলরতন "জ্ঞানদ্বয়"* ও মেঘনাদ প্রভৃতি যে-সমস্ত মৌলিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহা, সমস্তই প্রেসিডেন্সী কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত। এতদিন একটা অন্ধ সংস্কার ছিল যে, বাংলার মাটী, বাংলার হাওয়ায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা জন্মায় না। কিন্তু ইঁহারা কয়জন আমাদের দেশের যুবকবর্গের নিকট একটা আদর্শ উপস্থাপিত করিতেছেন। মেঘনাদ ও জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌-সি উপাধি উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা যতগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভগ্নাংশ মাত্র দাখিল করিলেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌-সি উপাধি পাইতেন; কিন্তু ইঁহারা মনে করেন যে, তাহাতে নিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধির অবমাননা করা হয়। ইহার কারণ আরও বুঝাইতেছি। এবার আমি দেখিয়া আসিলাম, লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, ম্যাঞ্চেষ্টার, লীড্‌স্ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিদেশীয় ছাত্র (বিশেষত জাপানী ছাত্র) নিজ নিজ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই আপন আপন দেশে তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই কাজ করিয়াছেন; তবে বিদেশে আসিয়াছেন সেই সেই বিষয়ে যাঁহারা মহামহোপাধ্যায় তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের নিকট হইতে উদ্দীপনা সংগ্রহের জন্য। এই অভিপ্রায়ে কেহ ২।৩ বৎসর একস্থানে থাকেন না, কোথাও তিন মাস কোথাও ছয়মাস মাত্র। ইঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য উপাধি (Doctorate) লইবার জন্য এখানে কাজ করিতেছেন? তাহা হইলে ইঁহারা বিরক্ত হইয়া উত্তর দেন, "ও কি কথা বলেন মশায়, আমাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি কোন্ অংশে হীনতর?"

বাংলা দেশে প্রতিভাশালী যুবকের অভাব নাই; কিন্তু

* আর একজন জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্‌-এস্‌-সি, সম্প্রতি যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে বুঝা যায় যে তিনিও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া 'জ্ঞান' দ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবীদার হইয়াছেন।

আক্ষেপের বিষয় ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উচ্চ উপাধি বা ছাপ পাইলেই বিদ্যার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। একটি চাকুরী লইয়া পালাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হন; পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে যে আমাদেরও কিছু দিবার আছে তাহা ভুলিয়া যান। ভুলিয়া যান যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী উদ্ঘাটন করিয়াও শেষজীবনে বলিয়াছিলেন, "আমি বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ডের সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" আমরা বত্রিশকোটী ভারতবাসী। ইহার মধ্যে ত্রিশজনও মৌলিক গবেষণায় বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু জাপান কত ক্ষুদ্র দেশ, লোকসংখ্যা ৬ কোটীর অধিক হইবে কিনা সন্দেহ; কিন্তু বহু বহু জাপানী পণ্ডিত উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়নীবিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতিতে মৌলিকত্ব দেখাইয়া জগৎকে মোহিত করিতেছেন। কাজেই জাপান বিজ্ঞান-জগতে উচ্চ ও আদৃত স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের দেশে যে-কয়জন-মাত্র এই ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা তাঁহাদিগকে গণনা করা যায়।

"সর্ব্বত্র জয়মন্বিষ্যেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।" হয়ত আমার জীবনে আমার এই ইচ্ছার সফলতার দিন আসিয়াছে। আমার এই প্রিয় শিষ্যগণের গর্ভধারিণীগণ ধন্যা। বঙ্গজননীগণ যাহাতে এইপ্রকার রত্নপ্রসবিনী হন, ইহাই আমি জগদীশ্বরের নিকট কামনা করি।

(প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩২৮) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

অভাব

ধনী ব্যক্তি ছাড়া অধুনা প্রায় সকলব্যক্তিই আর্থিক অভাবগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম; দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী। আর এই দরিদ্রের প্রধান অভাব দৈনন্দিন আহারের। এখন কেন যে এত অন্নের অভাব হইতেছে, আর পূর্ব্বেই বা কেন এরূপ ছিল না, তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশ হইতে শিল্পের তিরোধান। পূর্ব্বে গরীব লোকেরা নানাপ্রকার শিল্প-কার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখন কিন্তু তাহা হয় না, যদিও বা সেইসকল শিল্পপ্রচলনের চেষ্টা হইতে পারে, তথাপি সুলভ মূল্যের বৈদেশিক শিল্পের দরুন দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ অপরিহার্য্য। কিন্তু যদি দেশের শিক্ষিত, ধনী ও বিলাসী ভদ্র ব্যক্তিগণ সকলেই দেশীয় শিল্পের উপর অত্যধিক আস্থাস্থাপন করেন এবং ভাবেন যে, দেশীয় শিল্পের ব্যবহারে দেশের বুভুক্ষু ভ্রাতৃগণের মুখে অন্নদানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাহইলে নিশ্চয়ই দরিদ্রের অভাব দূরীভূত হইবে ও দেশ অচিরে সমৃদ্ধিশালী হইবে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে নানাবিধ শিল্পের প্রচলন ছিল ও তদ্দ্বারা অনেকে জীবিকানির্ব্বাহ করিত। ডাঃ বুকানের ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পাটনা, সাহাবাদ প্রভৃতি জেলা পরিদর্শনে যে রিপোর্ট বাহির হয়, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পাটনা জেলায় ৩,৩০,৪২৬জন স্ত্রীলোক কেবল সূত্র-কর্ত্তন ব্যবসায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিত। দিবসের মধ্যে কয়েকঘটিকা মাত্র কার্য্য করিয়া তাহারা সম্বৎসরের ১০,৮১,০০৫ টাকা লাভ করিত। তন্তুবায়েরা বস্ত্রবয়ন করিয়া বার্ষিক (ব্যয় বাদে) ৭।।০ লক্ষ টাকা রোজগার করিত। (ফতুয়া, গয়া, নয়াবাদ প্রভৃতি স্থান তসরের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।) সাহাবাদে ১,৫৯,৫০০ জন রমণী বৎসরে ১২।।০ লক্ষ টাকার সূতা কাটিত। ঐ জেলায় ৭৯৫০টি তাঁতে বৎসরে ১৬,০০,০০০ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন কাগজ, গন্ধ দ্রব্য, তৈল ও লবণ প্রভৃতির ব্যবসাও অতীব সমৃদ্ধ ছিল। ভাগলপুরে তসর বুনিবার ৩২৭৫টি তাঁত ও কাপড় বুনিবার ৭,২৭৯টি তাঁত ছিল। গোরক্ষপুরে ১,৭৫,৬০০ স্ত্রীলোক চরকা কাটিয়া দিনপাত করিত; তথায় ৬,১১৪টি তাঁত চলিত এবং ২০০ হইতে ৪০০ পর্য্যন্ত নৌকা প্রতিবৎসর নির্ম্মিত হইত। তদ্ভিন্ন লবণ ও শর্করা প্রস্তুত করিবার কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে বিধবা ও কৃষক-রমণীগণ (ব্যয় বাদে) বার্ষিক ৯,১৫,০০০ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। পাঁচশত ঘর রেশম-ব্যবসায়ী বৎসরে ১,২০,০০০ টাকা লাভ করিত। তন্তুবায়েরা বার্ষিক ১৬,৭৪,০০০ টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান রমণীদিগের মধ্যে সূচীশিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। সূতায় ও কাপড়ে নানারকমের রং করিয়া বহু সহস্র ব্যক্তির জীবিকানির্ব্বাহ হইত। পূর্ণিয়া জেলার রমণীগণ প্রতিবৎসর গড়ে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকার কার্পাস কিনিয়া যে-সূতা প্রস্তুত করিতেন, তাহা বাজারে

১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। তন্তুবায়দিগের ৩৫০০ তাঁতে ৫০,৬০০ টাকা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিত। এতদ্ভিন্ন ১০,০০০ তাঁতে মোটা কাপড় বুনিয়া তাহারা ৩,২৪,০০০ টাকা লাভ করিত। সতরঞ্চি, ফিতা প্রভৃতির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, সেকালের টাকার মূল্য (ব্যয় শক্তি) এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তখন ভারত যে অতীব শিল্প-প্রধান দেশ ছিল, নিম্নের তালিকাও তাহার যথেষ্ট প্রমাণস্থল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে আমেরিকায় ১৩,৬৩৩ গাঁইট কাপড় গিয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ও তৎপূর্ব্বে প্রতি বৎসরে দেন্মার্কে ১,৪৫০ গাঁইট ও ইংলণ্ডে ১৮:৮ খৃষ্টাব্দে ১৪,৮১৭ গাঁইট কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল। বিস্তৃত তালিকা অনাবশ্যক বোধে অধুনা-লুপ্ত শিল্পরপ্তানীর কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল। আশা করি, সকলেই পুরাতন শিল্পপ্রচলনের জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন ও দেশের দরিদ্র ভ্রাতাগণের অন্নাভাব দূর করিবেন। (নীহার)

আমাদের কর্ম্ম নাই কেন

আমাদের দেশ আনন্দহারা হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিল্পকলা সব হারিয়েছে। আনন্দই জীবন, আনন্দই জীবনের প্রকাশ; আনন্দ না হ'লে মানুষ ফোটে না, মানুষের অন্তরের সৃষ্টির দুয়ার খোলে না। মানুষ আনন্দময় হ'লে তার অন্তর ভরে ভগবানের গতির তাল বেজে ওঠে, পরে তাই বাইরে রাজপাট ধর্ম্ম সভ্যতা হয়ে ফুটে পড়ে।

জাতি স্বস্থ হয় আনন্দে; মাথার ওপরে জ্ঞান তখন অনন্ত বিথারে খুলে যায়, শক্তি তখন আনন্দ-শুদ্ধ আধারে আপন তরঙ্গে বহিতে থাকে; তখনই দীন মানুষ বিরাট হয়, তখনই ত সে কতরকম অসাধ্যও জীবনে সেধে দেখায়। আমরা পরের পাটকলে কুলীর জাতি, পরের আফিসে কেরাণীর জাতি, পরের মাটিতে ভাড়াটে চাষীর জাতি, পরের রাজনীতির আড়তে দালাল জাতি এই আনন্দ একেবারে হারিয়েছি। তাই আজ কর্ম্ম বলে' আমাদের কিছুই নেই—India is no more creative ভারতে ব্রহ্মা আপন রূপ সম্বরণ করেছেন। (বিজলী)

সত্যের আহ্বান

মনুষ্যেতর জীব প্রকৃতিদত্ত অভ্যাসের দাস, তাহারা পরাসক্ত। তাহারা অভ্যাসের স্রোতে ভাসিয়া যায়। এই অভ্যাসের বলে ইতর প্রাণীরা যাহা করে তাহা যথাযথ, তাহা নিখুঁত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সেই কর্ম্ম প্রণালী সেকালেও যেমন ছিল এখনো তেমনি। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মধুমক্ষিকা যেমনভাবে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিত, আজিও সে তেমনিভাবে উহা নির্ম্মাণ করে। তাহাদের নির্ম্মাণ-কৌশল অতি প্রশংসনীয় হইলেও উহার মধ্যে কোনো পরিবর্ত্তন বা কোনো উন্নতি দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেন নাই। মানুষকে তিনি সর্ব্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র নিঃসহায় করিয়া সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অন্তঃকরণ প্রদান করিয়াছেন। এই অন্তঃকরণের প্রেরণায় মানুষ অসাধ্যসাধনের প্রয়াসী। উহার প্রেরণায় মানুষ বলে, যাহা পাওয়া যায় না আমাকে তাহা পাইতে হইবে, যাহা অজ্ঞাত রহিয়াছে আমাকে তাহা জানিতে হইবে, যাহা অসম্ভব আমাকে তাহা সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

যাহারা পরাসক্ত তাহাদের মত স্বকীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া মানুষ যদি বলিত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন, আমরাও তাহাই করিব; আমরা লৌহ স্পর্শ করিব না। তাহা হইলে মানুষ স্বীয় আভ্যন্তরিক বিধিদত্ত স্বাধীনতার গর্ব্ব করিত। ঐ স্বাধীনতার প্রেরণায়ই মানুষ অনন্তের সন্ধানে বাহির হইয়াছে! উহাই মানুষের তাবৎ উন্নতির মূল। মানুষের স্বাধীনতা তাহার ভিতরে রহিয়াছে ইহা পরের নিকট হইতে পাওয়া যায় না।

আবেদন-নিবেদন

৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমি স্বদেশী-সমাজে এই কথাই আমার দেশবাসীর চিত্তে মুদ্রিত করিতে চাহিয়াছি যে, স্বাধীনতা আবেদন-নিবেদন দ্বারা পাওয়া যায় না। বাহির হইতে আমাদের উপর যাহা চাপানো হইবে তদ্দ্বারা আমাদের শক্তিবিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইবে। দেশের সকল শক্তি যদি বিকাশপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতে পারিব না। যে-পলিটিক্যাল এঞ্জিনটার জোরে দৃশ্যত দেশ চলিতেছে উহাই বস্তুত দেশ নয়, উহার

পশ্চাতে বিরাটকায় গাড়িগুলি পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া শ্রেণীরূপে বিরাজ করিতেছে। কতজনের কত পরিশ্রম কত মালমসলায় সেগুলি নির্ম্মিত ও সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এঞ্জিন উহাকে টানিতে পারিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যখন ভারতে এক মহাসভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল তখন সেই সভ্যতা শিল্পসাহিত্যবিজ্ঞান সকলদিকেই নব প্রাণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। ভিতরের প্রেরণায় যখন জাগরণ হয় তখন উহার লক্ষণ এইরূপ সকলদিকেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ

যখন বঙ্গদেশ ব্যবচ্ছিন্ন হয় তখন বাঙালীরা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করিয়াছিল। তখনো আমাকে স্বদেশবাসীর নিকট বলিতে হইয়াছিল "এহ বাহ্য"। ইহাও বাহ্য চেষ্টা। এই যে অভ্যুত্থান-চেষ্টা ইহা ভিতর হইতে উৎসারিত হয় নাই, বাহির হইতে লোকের উপর চাপানো হইয়াছে।

বিলাতী বর্জ্জনের মূলকথা বিদেশীর প্রতি ঘৃণা, ইহা বাহিরের ব্যাপার। ইংরেজ এইদেশ শাসন করেন ইহা আমাদের নিকট একটা চিরসত্য ব্যাপার নয়, বাহ্য ব্যাপার মাত্র। সত্য আমাদের স্বদেশপ্রীতি, উহা ভিতরের বস্তু। আমাদের দেশ যে আমাদের নিকট সত্য বস্তু ইহাই আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুভব করিতে হইবে। আমাদের এই দেশকে সকলদিক হইতে নূতন করিয়া সৃষ্টি করাই আমাদের কাজ।

১৯০৫ অব্দে আমি স্বদেশীয়দিগকে এই কথাই বলিয়াছিলাম যে, আমাদের দেশকে আমাদিগকেই আত্মশক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া দেশকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কেবল বিদেশীকে পরাস্ত করিয়া তাহার হাত হইতে শক্তি কাড়িয়া লইলেই আমাদের চলিবে না। আমরা যে জড়ত্ব, যে ঔদাসীন্যের দাস হইয়াছি সেই সমস্তকেও পরাভূত করিতে হইবে, নতুবা শক্তির উন্মেষ হইবে না।

যে-আহ্বানে দেশের এই আভ্যন্তরীণ শক্তির উন্মেষ হয় সেই আহ্বানেরই প্রয়োজন। বাহির হইতে কোনো আদেশ চাপাইলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

বঙ্গবিভাগ আন্দোলন ব্যর্থ হইল কেন

বঙ্গবিভাগের সময়ে এই দেশে যে-আন্দোলন হইয়াছিল তদ্দ্বারা সকলদিকে সকলের শক্তি জাগরিত করিবার উত্তেজনার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সেই আগুনে দহন করিয়াছে, কিন্তু কিছু সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বুদ্ধি স্থির করিয়া ধৈর্য্যসহকারে যে-অপরিচ্ছন্ন দ্রব্য আগুনে পোড়াইয়া গলাইয়া নূতন সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা ছিল, সেই সৃজনী বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতা আমাদের ছিল না। এই জন্যই বঙ্গব্যবচ্ছেদ-আন্দোলন অংশত ব্যর্থ হইয়াছে।

ঐ-আন্দোলনে আমাদের যে-অনিষ্ট হইয়াছিল উহার সম্বন্ধে এক জাপানী বন্ধু আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ;—

"এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, আপনার স্বদেশীয়েরা দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া ধীরভাবে কার্য্য করিতে পারে না ? আপনারা শক্তির অপচয় করেন কিন্তু উহাতে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।"

আত্মত্যাগী যুবকদল

বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময়ে একদল যুবক তাঁহাদের অমূল্য-জীবন দেশোদ্ধারের নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রেমের আগুন জ্বালাইয়া ইঁহারা সেই আগুনে অকুণ্ঠিতচিত্তে জীবন দান করিয়া যে-দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা কেবল সেই দেশবাসীর নহে, উহা বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। এই আন্দোলনের যাঁহারা চালক ছিলেন, তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছেন যে, উত্তেজনার আগুন যতই মহৎ যতই পবিত্র হউক না কেন, উহা কিছু সৃষ্টি করে না।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে একবক্তা আমাকে বলিয়াছিলেন—আমার একহাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে আর একহাত তাহার পায়ে। এখন হয়ত একদলের দুই-হাত ইংরেজের টুঁটি ধরিয়াছে, আর একদলের দুইহাতই ইংরেজের পায়ে নামিয়াছে। ইংরেজ আমাদের নিকট বাহ্য ব্যাপার, সেইদিকে মনঃসংযোগ না করিয়া আমাদের আত্মশক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী

১৯০৫ অব্দের আন্দোলনের সহিত তুলনায় বর্ত্তমান আন্দোলন অতি বৃহৎ। এই আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়াছে। এতদিন ভারতীয় রাজনৈতিক আলোচনা ইংরাজী-জানা অল্পসংখ্যক

লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলন লইয়া মহাত্মা গান্ধী অনশনক্লিষ্ট কুটীরবাসী পল্লী-নরনারীর দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তাহাদের মত পোষাক ধারণ করেন, তাহাদের ভাষায় তাহাদের সহিত সুখ-দুঃখের কথা বলেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের একজন। তিনি এতদিনের বক্তাদের মত স্পেন্সার, মিল-বার্কের রচনা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা করেন না, তিনি সোজা কথায় লোকের কাছে তাহাদের দুঃখ-দৈন্য-অভাবের কথা বলেন। এমন ব্যক্তির মহাত্মা নাম সার্থক হইয়াছে। এই মহাত্মার ন্যায় আর কে ভারতের এই অসংখ্য নর-নারীকে আপনার রক্তমাংসরূপে অনুভব করিয়াছেন?

যথার্থ প্রেম ও সত্যের ছোঁয়া পাইলেই প্রচ্ছন্ন শক্তি জাগরিত হইয়া উঠে। যথার্থ প্রেম লইয়া যেমন মহাত্মা গান্ধী পল্লীবাসীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি সকলে দ্বার খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে আত্মজন বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। সকলের মন হইতে সর্ব্বপ্রকার সংশয় চলিয়া গেল। সত্যের ছোঁয়া পাইলেই সত্য জাগরিত হয়। সত্যের এই অসামান্য শক্তি সকলের প্রত্যক্ষ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া মহাত্মাকে গৌরব দান করিতেই হইবে। আধুনিক কালের আর কোনো রাজনীতিক নেতার আহ্বানে ভারতের অসংখ্য নরনারী এমনভাবে সাড়া প্রদান করে নাই। এই যে নরনারীর হৃদয়ে যথার্থ স্বাধীনতার জন্মলাভ, ইহা অন্তরের ব্যাপার, ইহার মধ্যে বৈদেশিক শাসকদের কোনো প্রশ্নই উঠে নাই। যে-প্রেম এই স্বাধীনতার জন্মদাতা তাহা সত্যবস্তু।

এই প্রেমের শক্তিতে ভারতে নব জাগরণের যে সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, সেই সঙ্গীত-তরঙ্গ সাগরের পরপারে গিয়া আমার কর্ণে পৌছিয়াছিল। ভারতে মহাজাগরণের যজ্ঞোৎসব আরম্ভ হইয়াছে ভাবিয়া আমার মন বড়ই আনন্দিত হইয়াছিল। প্রভু বুদ্ধের মৈত্রীর আস্বাদনে ভারতবর্ষ যখন জাগিয়া উঠিয়াছিল সেই জাগরণ শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্যে সর্ব্বদিকেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তখনকার সেই মৈত্রীময়ী স্বাধীনতার বাণী সমুদ্র ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি বিদেশে থাকিয়া এমনই এক মহাজাগরণের প্রত্যাশা করিতেছিলাম।

কিন্তু কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমার মন নিরাশায় অভিভূত হইয়া পড়ে। দেশবাসীর মনে আনন্দ নাই, সকলের মনের উপর বাহির হইতে কি-যেন-এক বোঝা চাপানো হইয়াছে। যেমন অনুশাসন জারী করিয়া চিরদিন এই দেশের লোকের মন অভিভূত করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহাও তেমনি যুক্তিহীন অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি। আমি বন্ধুদিগকে বলিলাম, এমন বিধির আমি প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিব, তাহারা ভীত হইয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া জানাইল, চুপ চুপ, কোনো কথা মুখে আনিয়ো না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান আন্দোলনের সার্থকতায় যাঁহাদের আদৌ বিশ্বাস নাই, তাঁহারাও প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করিবার সাহস করেন না। লোকের মনের ভাব এই যে, কোনো তর্ক না করিয়া বিনা-বিচারে বর্ত্তমান বিধি মন্ত্রের মত মানিতে হইবে।

লোভ সত্য নয়, লোভ দুর্ব্বলতা। কোনো নির্দ্দিষ্ট মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে স্বরাজ লাভের লোভ দেখাইয়া ঐ-তারিখের মধ্যে সকলকে সমস্ত বিলাতী বস্ত্র দগ্ধ বা বর্জ্জন করিবার আদেশ প্রচার করিলে মানুষ উহা মানিতে চাহিবে কেন? বিলাতী কাপড় পোড়াইলে আমাদের উলঙ্গতা বাড়িবে কি কমিবে, উহা অর্থনৈতিক হিসাবে উচিত কি অনুচিত তাহাই বিচার্য্য। সেইরূপ কোনো বিচার না করিয়া যখন লোকের উপর আদেশ চাপানো হয় তখন উহা লোকের মনের উপর অসহ্য বোঝা হইয়া উঠে। চরকা-কাটা মোটা সুতার কাপড়ে সমস্তদেশের প্রয়োজন পূরণ হইতে পারে কিনা তাহা সমস্ত দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচার্য্য। তাহা না করিয়া লোকসাধারণকে বিলাতী বস্ত্র দহনের নিমিত্ত উত্তেজিত করিলে অর্থনৈতিক সমস্যার পূরণ হইতে পারে না।

ভারতের জাগরণ

ভারতবর্ষের এই আধুনিক জাগরণকে এক বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। মহাসমরের ফলে সমস্ত পৃথিবীতে যে জাগরণের সৃষ্টি হইতেছে ইহা তাহারই অংশ মাত্র। মহাসমর নিখিল মানবের এক নবযুগ সূচনা করিয়া দিতেছে। ইহা স্বীকার্য্য যে, মহাসমরের পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে যোগবন্ধন নিবিড় হইতেছিল, কিন্তু সেই ঐক্য-সম্বন্ধে লোকসাধারণের বোধ তেমন উজ্জ্বল

ছিল না। মহাসমরের উজ্জ্বল শিখায় তাহা এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে।

নিখিল মানবের ঐক্য

নিখিল মানবের এই ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য নানা দেশের মনীষীদের মধ্যে চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তাঁহারা এই মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে আপনাদের শক্তিনিয়োগ করিয়াছেন।

এই ঐক্যসাধনের পক্ষে বহু বাধা আছে। জাতিগত দেশগত ছোট বড় স্বার্থ এই মহামিলনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। কিন্তু ঐসকল স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া এই নবযুগের মহামিলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জাতিসঙ্ঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্মিলনী গঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ঐক্যবাণী

নিখিল মানবের এই ঐক্যে ভারতবর্ষকে যোগ দিতে হইবে। ভারতবর্ষে এক্ষণে লোকসাধারণের মধ্যে যে-শুভ বুদ্ধির জাগরণ দৃষ্ট হইতেছে উহা এই মিলনের সহায় হউক।

ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

সমস্ত পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করিয়া যে-দেবতা বিরাজ করিতেছেন তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ পত্রান্তরে লিখিয়াছেন—"আমাকে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে কতুকাল বাস কিরিতে হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমি কয়েকটি বোতলের অর্দ্ধেকটা কার্ব্বলিক এ্যাসিড বাষ্পে পুরিয়া বোতলের মুখের ছিপি খুলিয়া ছেলেরা নাগাল না পায় এমনভাবে শয়ন-ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহার তীব্র গন্ধে মশকাদি আমার ঘরে ঢুকিতে পারে নাই। ফলে আমার পরিবারস্থ কাহারও ম্যালেরিয়াও হয় নাই।" এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল। নীহার।

* কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে লেখক কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম "সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধৃত।

বর্ষা-মঙ্গল

(গান)

ওগো আমার শ্রাবণ-মেঘের খেয়াতরীর মাঝি!
অশ্রুভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়
বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।
ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে,
মনে ভাবি, তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারি গানে
সেই আঁখি তার মনে আনে
আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালো রূপ যে
আমার চোখের পরে নাচে।
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখ
তালবনের ঐ গাছে গাছে,
বাদল হাওয়ায় পাগল হল
সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায়
মাঠ হতে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ
আমার গানের পাখার পাছে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দ ও সৃষ্টিই কাজের প্রাণ

যে-কাজে আনন্দ নেই সে-কাজ কাজই নয়। কাজের কাজী যা' করে অন্তরভরে অমৃতের আস্বাদ পায়, তাই করেই তার জীবন সার্থক হয়। তোমার হাতের বীণায় ভাবের জোয়ার বইয়ে যে তন্ময়তা আসে, আমার রণসাজে

সেজে রক্তের মাঝে অসিক্রীড়ায়ই কেবল তা' দিতে পারে। তলোয়ারের নাচে আমার প্রাণ দুলে ওঠে, তোপের কান-ফাটা শব্দে ও আগুনের ঝলকে আমার সর্ব্বশরীর আনন্দে কেঁপে ওঠে। কিন্তু সবকাজেরই ভেতরকার কথা শুধু আনন্দ নয়, সৃষ্টি। যখন দেখি আমার মাকু আর হাতের তলায় রেশমের রাশি চকমকে ঢেউয়ে স্তূপ হয়ে আছে, আমার দিগন্তপ্রসারিত মাঠে কচি কচি ধানের শ্যামল বান ডেকেছে, আমার তলোয়ারের নাচে দেশলক্ষ্মীর আসন গড়ে উঠছে, যখন বুঝি আমার কাজের ফলে দেশে ধনরত্নের অবধি থাকবে না, আমার কাজে সহস্র অন্ধকার প্রাণের কোণে জ্ঞানের বাতি জ্বলবে তখনই আমার আনন্দ ও তখনি আমার এইসব কাজ আমার জীবনে দেবপূজার কাজ করে; আর আত্মশুদ্ধি আনে। (বিজলী)

—:০:—

প্রবাসে কুশদহবাসী

বেড়্গুম-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে খুরদা রোড বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে জংশনে লোকোমটীভ আপিষে কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহার বয়স ৬২ বৎসর। পিতা স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অক্ষয়বাবু প্রথমে গোবরডাঙ্গা ইস্কুলে কিছুদিন পড়েন, তৎপরে দিনাজপুর ইস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া সিটীকলেজে একবৎসর পড়িয়া ২১ বৎসর বয়সে শিক্ষা শেষ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে বর্দ্ধমান পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপিষে ২০৲ টাকা বেতনে ক্লার্কের কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি স্থানে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে উন্নীত হইয়া প্রায় ৪৫ বৎসর বয়সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার অল্পদিন পরেই বর্ত্তমান কার্য্য গ্রহণ করিয়া ১৭ বৎসর এখানেই কার্য্য করিতেছেন। এ-কার্য্যের বেতন উপস্থিত ৭৬৲।

১৯ বৎসর বয়সে বেড়ীগ্রামের স্বর্গীয় ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় (সব্ জজ) মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার তিনপুত্র ও তিনকন্যা। ১ম পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র বি-এস্-সি পাশ করিয়া রাজসাহী কলেজে কার্য্য করিতেছেন। ২য় পুত্র শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম্-বি পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান মহেশ-চন্দ্রের বয়স ২১ বৎসর, রাজসাহী কলেজ হইতে আই-এস্-সি পাশ করিয়াছে। ১ম ও ২য় পুত্র বিবাহিত এবং কন্যা তিনটিও বিবাহিতা। ৩য় পুত্র মহেশচন্দ্র অবিবাহিত।

মনুষ্যমাত্রেরই জীবনে ভগবানের কৃপার নিদর্শন আছে। তবে যিনি তাহাতে বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ, তিনি উপকৃত হন। আমরা অক্ষয় বাবুর বিবরণ সংগ্রহকালে তাঁহার জীবনের যে-সকল বিচিত্র ঘটনার পরিচয় পাইয়াছি, তাহার বিস্তৃত বিবরণের স্থান এই প্রবন্ধে না হইলেও ইহা বলিতে পারি যে, ইনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি। তিনি সামান্য অবস্থায় নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে চরিত্র এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা রক্ষা করিয়া আজ সেই ভগবৎ প্রসাদে যে-অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছেন, তাহাতেই তিনি আপনাকে সুখী মনে করেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী আত্মতৃপ্ত মনুষ্যই জীবনের যথার্থ স্বার্থকতা লাভে অধিকারী হন।

গৈপুর-নিবাসী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ বি-এল্ মহাশয় এক্ষণে কটকে ওকালতি করিতেছেন। ইঁহার বয়স ৫০ বৎসর। পিতার নাম স্বর্গীয় কেদারনাথ সিংহ। সতীশ বাবু গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া খাঁটুরা বঙ্গ-বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন, তাহাতে মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তি পান। তৎপর গোবরডাঙ্গা ইস্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াও ১৫৲ টাকা বৃত্তি পান। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই— যখন তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহাতে পড়াশুনা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। মাতা ও কনিষ্ঠ সহোদরকে মাতুলালয় যদুরহাটী গ্রামে রাখিয়া কলিকাতায় ভবানীপুরে আসিয়া কোনো সদাশয় ব্যক্তির সাহায্যে সিটীকলেজে ফ্রি হইয়া একান্ত-মনে এফ্-এ পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং ঈশ্বর-কৃপায় যথাসময়ে পাশ হন। তৎপরে রিপণ কলেজ হইতে বি-এ ও বি-এল্ পাশ করিয়া শিক্ষা শেষ করেন। দীর্ঘ সময় ভবানী-পুর হইতে প্রতিদিন কলিকাতায় কলেজে যাতায়াত করা, ইহা একান্ত অধ্যবসায়ের পরিচয় সন্দেহ নাই। বি-এল পাশ করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কটকে আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন এবং এপর্য্যন্ত সেইকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সতীশবাবু ২১ বৎসর বয়সে ২৪ পরগণার সোনাই

গ্রামের স্বর্গীয় মহেন্দ্রমোহন বসুর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার ২টি পুত্র। ১ম শ্রীমান্ শুধাংশুশেখর কটক হইতে বি-এস্-সি পাশ করিয়া কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ৫ম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছেন। ২য় শ্রীমান্ শীতাংশুশেখর কটক আই-এস্-সি পড়িয়া এক্ষণে তথায় টেকনিক্যাল ইস্কুলে পড়িতেছেন। উভয়েই অবিবাহিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সতীশ বাবুর স্ত্রীবিয়োগ হয়। তাঁহার দেড় বৎসর পরে পুনর্ব্বার হাওড়া-ব্যাট্‌রা-নিবাসী ডাক্তার স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মিত্রের ৪র্থ কন্যাকে বিবাহ করেন। এপক্ষে ১টী পুত্র ও ২টি কন্যা। প্রথমা কন্যা ১১ বৎসরের অবিবাহিতা। দ্বিতীয়া স্ত্রীও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সতীশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ জ্যেষ্ঠের সহিত একত্রে থাকিয়া কটকে ওকালতি করিতেছেন। নরেশ বাবুর বয়স ৪০ বৎসর। ইনি গোবরডাঙ্গা ইস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, জেনারল্ এ্যাসেম্ব্লি হইতে এফ-এ দিয়া কটকে প্লীডারশীপ্ পাশ করেন। প্রথমে ইনি কয়েকবৎসর পুরী জেলাকোর্টে ওকালতি করেন, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার বিয়োগের পর হইতে কটকে আসিয়া ওকালতি করিতেছেন। ইনি ২৪ বৎসর বয়সে আচ্য বেনিয়া-নিবাসী স্বর্গীয় হরিপদ বসুর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার একটি পুত্র ১১ বৎসরের, তিনটি কন্যা বালিকা।

এ-প্রসঙ্গে সতীশ বাবুর উজ্জ্বল চরিত্র-সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে না পারিলেও তাঁহার আন্তরিক স্বদেশানুরাগের যে-টুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ আলাপে আশ মিটে না। তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের যে-বীজ নিহিত আছে, তাহাতে আশা করা যায় তিনি একদিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া মাতৃসেবায় জীবনের সাধ মিটাইবেন। ইঁহাদের সৌভ্রাতৃত্বও বর্ত্তমান সময়ে আদর্শস্থানীয়। এই পরিবারে শান্তি এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছে তাহা আমরা অনুভব করিয়া তৃপ্তি পাইয়াছি।

(দাস-সংগৃহীত)

গ্রন্থ-সমালোচনা

নিবৃত্তির পথে—দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার সময়ে সময়ে কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঐ-প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের উৎপত্তি করিয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে লেখক প্রধানত ষড়্‌দর্শন, বৌদ্ধাদি দর্শন ও পৌরাণিক সাধনা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অংশবিশেষের ব্যাখ্যা বা বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে স্বাধীনভাবে তিনি নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আলোচনাগুলি অতি সংক্ষিপ্ত; এইজন্যই মনে হয় বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেহ সহজে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। তবে ইহাতে এমন-কিছু নূতন কথা আছে যাহা অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে। গ্রন্থকারের ভাষা ভাব প্রচুর ও প্রাঞ্জল এবং তাঁহার বিষয়-বিশ্লেষণ-শক্তি আছে। স্থানে স্থানে দু-একটি মন্তব্য ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। যাহাহউক মোটের উপর পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়ন-বাহুল্যের বিশেষরূপ পরিচয় দিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে পাঠকের মনে যে জ্ঞানানুসন্ধিৎসার উদয় হইবে ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এম-এ—অধ্যাপক।

অভয়া

নয়নে তোমার ঝলিছে অনল আননে মুখর দীপ্তি;
বক্ষে দুলিছে অক্ষ-মালিকা, হৃদয়ে হরষ-তৃপ্তি!
মঙ্গল করে দিতেছ অভয়, বাহুতে স্ফুরিছে শক্তি;
চরণে তোমার দলিয়া অশিব হৃদয়ে এনেছ ভক্তি!
রুদ্রাণী তবু বিতরি' করুণা পাপীরে দিতেছ মুক্তি;
বিশ্ব-জননী বিশ্ব-পালিনী কী তব প্রেমের যুক্তি!
দেহ গো দীক্ষা জননি, আজি তোমারি অভয় মন্ত্রে,
বাজিয়া উঠিবে স্পন্দন নব লক্ষ হৃদয়-যন্ত্রে!

শ্রী——শর্ম্মা।



কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার তৃতীয় অধিবেশন

সময়—২৪শে শ্রাবণ মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৫ ঘটিকা

স্থান—১১৷১ ঘোষের লেন, কলিকাতা

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), পতিরাম বসু, যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, নীলাচল মুখোপাধ্যায়, নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), জ্যোতির্ভূষণ মুখোপাধ্যায় (সহঃ সম্পাদক)।

১। গত অধিবেশনে প্রথম প্রস্তাবে সম্পাদক-কর্তৃক প্রদর্শনীর যে-হিসাব দাখিল করার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হওয়ায় আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

২। শ্রীযুক্ত পতিরাম বাবু প্রস্তাব করেন, যেহেতু সমিতির কোনো সভ্য সমিতির বাকী চাঁদা আদায়ের ভার গ্রহণ করিতেছেন না, এবং যেহেতু শ্রীসতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় এই ভার লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, সেইহেতু তাঁহাকে এই বকেয়া চাঁদা আদায়ের ভার দেওয়া হউক। এই কার্য্যের জন্য তিনি যে-ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহার যাতায়াত-ব্যয় দিতে স্বীকৃত হউন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ভূষণ মুখোপাধ্যায় (সহ সম্পাদক) এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অধিকাংশের মতে প্রস্তাব গৃহীত হইল না। নীলাচল বাবু প্রস্তাব করেন যে, শ্রীমান্ জ্যোতির্ভূষণ (সহসম্পাদক) প্রভৃতি কয়েকটি উৎসাহী সভ্যের উপর বকেয়া চাঁদা আদায়ের ভার অর্পিত হউক। তাঁহাদের আবশ্যক মত যাতায়াত-খরচা সমিতি দিতে স্বীকৃত হউন।

নিশিবাবু (সম্পাদক) এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সংশোধন প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, প্রস্তাবক মহাশয়কেও (নীলাচল বাবু) এইকার্য্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হউক। নীলাচল বাবু স্বীকৃত হইলেন। অধিকাংশের মতে ইহা গৃহীত হইল।

সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর কার্য্য শেষ হইল।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান ঐ। সময় ঐ (২৪শে শ্রাবণ) সন্ধ্যা ৭-৩০ মি

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সহায়নারায়ণ পাল, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কুমুদবিহারী রায়, নীলাচল মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) এবং জ্যোতির্ভূষণ মুখোপাধ্যায় (সহঃ সম্পাদক)।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আলোচ্য বিষয়, সংশোধন প্রস্তাবাকারে শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয় বলেন যে, কুশদহ-সমিতি এবং কুশদহ পত্রিকার যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একজন অনন্যকর্ম্মা ত্যাগী কর্ম্মীর অভাবে অন্তত একজন এমন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক যে তিনি সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের আদেশমত কার্য্য-সকল সম্পন্ন করিতে পারেন। দ্বিতীয়—সকলকার্য্যের জন্য অর্থের ব্যবস্থাও করা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করেন যে, কুশদহ পত্রিকার জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।

শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীনিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল্।

কুশদহ-সমিতির সম্পাদক

ঘরের কথা

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং খাঁটুরা-হয়দাদপুর শাখার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায় সমিতি-সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দক্ষিণ-চাতরায় শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দক্ষিণ-চাতরায় ২।৩ বৎসর হইল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড একটি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামবাসীগণের উদ্যোগ এবং শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্রের অক্লান্ত চেষ্টার ফল এই চিকিৎসালয়। এই ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে সূর্য্যকান্ত বাবু ১০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই চিকিৎসালয়ের জন্যই দক্ষিণ চাতরা এবং উত্তর চাতরায় বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। অনুসন্ধানে যেরূপ জানা যায় তাহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কিছুই হইতে পারে না। কোনো পক্ষের দোষ-গুণ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা উভয় পক্ষকেই সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা শীঘ্রই দেশের হিতের জন্য পরস্পরের বিবাদের কথা বিস্মৃত হউন, এবং সকলে মিলিত হইয়া সম্মিলিত চাতরার শ্রীবৃদ্ধি করুন।

কুশদহের প্রসিদ্ধ রামভদ্র শিরোমণির শেষ উল্লেখযোগ্য বংশধর ৺শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন প্রায় ১৫ বৎসর হইল, গত হইয়াছেন। ৺শশিভূষণের পুত্র ৺ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্যও গত ৪ বৎসর হইল মাত্র ৭বৎসর বয়স্ক এক নাবালক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—৺শশিভূষণ স্মৃতিরত্নের যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি মায়-ভদ্রাসন-বাটী পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্র ৺ইন্দুভূষণ বন্ধক রাখিয়া গ্রামের লোকের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। ইন্দুভূষণের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও নাবালক পুত্র এবং বিধবা মাতা সেই ঋণভারগ্রস্ত হইয়া বর্ত্তমানে এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছেন যে, তাহা রামভদ্র শিরোমণির বংশ এবং কুশদহবাসীর পক্ষে আদৌ গৌরবের কথা নহে। কলমের বাগান এবং অন্যান্য জমাজমী ইতিপূর্ব্বেই বিক্রীত হইয়া আংশিক দেনা শোধ হইয়াছিল। সম্প্রতি ভদ্রাসন-বাটীখানি পর্য্যন্ত নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ক্রেতা ঐ গ্রামেরই অধিবাসী। রামভদ্র শিরোমণির নাম স্মরণ করতঃ দেশবাসীর সহানুভূতি তাঁহারই এই হতভাগ্য বংশধরের দুর্দ্দশার দিকে আকৃষ্ট হইবে না কি?

খাঁটুরা-নিবাসী ব্যবসায়ীগণ চিনি ও ঘৃতের ব্যবসায়ে বিখ্যাত ধনী। অবশ্য সময়-সময় কেহ ব্যবসাক্ষেত্রে উঠিতেছেন কেহ বা কখনো পড়িতেছেন। ব্যবসায়ে যেন উহা একটি অনতিক্রমনীয় নিয়ম। সম্প্রতি খাঁটুরার শ্রীযুক্ত কুশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভ্রাতৃগণ চিনির ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, শুনিয়া আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। উঁহারা শীঘ্র সরলভাবে ঋণমুক্তির ব্যবস্থা করিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ঐ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই আমরা দেখিতে চাই। কেন না, "যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে।"

দেশের পানীয় জলের অবস্থা সর্ব্বত্রই শোচনীয়। এই অবস্থায় এইসময় পাটপচানো একটি সাঙ্ঘাতিক উপদ্রব। ইহার জন্য আইন-কানুন সবই ঠিক আছে কিন্তু ইহা একেবারে বন্ধ হইতে প্রায় কোনো বৎসরই দেখা যায় না। আমরা শুনিলাম যমুনা নদীতেও চারঘাট এবং মাটিকোমরার নিম্নে পাট পচানো হইয়াছে। চারঘাটের কয়েকটি ভদ্রলোক এবং মাটিকোমরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (কুশদহ-সমিতির সম্পাদক) যাহাতে যমুনায় পাট পচানো না হয় তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতেছেন।

কুশদহ—স্থায়ী ধনভাণ্ডার

(প্রাপ্তিস্বীকার)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল (খাঁটুরা) } " খগেন্দ্রনাথ পাল ১ম বারে }	২০৲
" বিরজাপ্রসাদ রক্ষিত (৫ মোহনলাল ষ্ট্রীট)	১০৲
" অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য (উকীল) ১ম বারে	৫৲
" নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (সমিতি-সম্পাদক) ১ম বারে	৫৲
পূর্ব্ব-প্রকাশিত	১৫৬৲
একুন	১৯৬৲

(ক্রমশ)

Printed at the Bengal Printing Works, 66 Manicktola Street, Calcutta, by N. N. Mukerjee and published by him from 87, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

কুশদহ-সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত

—o—

কার্য্যালয়—৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৶০]   [প্রতি সংখ্যা ৵০

"কুশদহ"র নিয়মাবলী

১। "কুশদহ"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ২।৵০। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য তিন আনা। নমুনারও ঐ মূল্য লাগে। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে বৈশাখ হইতে কাগজ লইতে হইবে। মূল্য "সম্পাদক, কুশদহ" এই নামে প্রেরিতব্য।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের শেষ তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তিসংবাদ ডাকঘরে ও পত্রিকা-কার্য্যাধ্যক্ষকে জানানো আবশ্যক।

৩। রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে কোনো পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৪। অমনোনীত রচনা ফেরত চাহিলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অথবা কুশদহ-সমিতির নিয়মবিরুদ্ধ কোনো লেখা 'কুশদহে' প্রকাশিত হয় না।

৫। পুরাতন গ্রাহকগণ যে-কোনো পত্র লিখিবার সময় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৬। নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে গ্রাহক-নম্বর সহ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৌছানো আবশ্যক।

"কুশদহ"র বিজ্ঞাপনের মূল্য

১। মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা—
পূর্ণ পৃষ্ঠা ১২৲। অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৭৲। সিকি পৃষ্ঠা ৪৲টাকা।

২। মলাটের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা—
পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲; সিকি পৃষ্ঠা ৩।৹টাকা।

৩। বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা—
এক পৃষ্ঠা ৬৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩।৹, সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা।

৪। বিজ্ঞাপনের ফর্ম্মার ১ম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা—
১ পৃষ্ঠা ৭৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৲, সিকি পৃষ্ঠা ২।৹ টাকা।

৫। উক্ত বিজ্ঞাপনের হার সমস্তই মাসিক।

৬। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৭। এক বৎসরের চুক্তিতে অগ্রিম টাকা জমা দিলে শতকরা ৫৲ টাকা কম লওয়া হয়।

৮। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

"কুশদহ"-কার্য্যাধ্যক্ষ
৮৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

আশ্বিন—১৩২৮



মন্দির-দ্বারে

কুশদহ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

নবপর্য্যায়, ১ম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩২৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মিলন

(গল্প)

সারাদিন ঘুরে ঘুরে যখন একমুষ্টিও ভিক্ষা জুট্‌ল না, তখন দৌলতকে নিয়ে কি করে' কোথায় সে রাতটুকু কাটাবে, তাই ভেবেই আকুল হয়ে উঠলো। দিনের বেলা এ-গাঁও হ'তে সে-গাঁও যাবার সময় কঙ্করময় মাঠের ঝোপে ঝোপে যে-কুল পেকেছিল, কেবল তাই দুটো মুখে দিয়েছিল। তৃষ্ণার সময় পথের কোনো "তলাও" হ'তে আঁচলা-ভরে যখন-তখন জল খেয়েছিল। সে বড় আশা করে ভিক্ষা কর্‌তে সহরে এল—দু-একমুঠো বেশী করে' 'জনরী' সঞ্চয় করতে পারবে বলে। কিন্তু তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

সে কখনো সহর দেখে নাই। এত লোক, এত দোকান, এত পাকা বাড়ী সে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই। এখানে এসে প্রথমে কিন্তু সহর দেখাই তার কাজ নয়। প্রথমে তার ছেলেটিকে কিছু খাবার দিতে হবে। আহা, তার সাধের দৌলত আজ চার-পাঁচদিন প্রায় অনাহারে আছে! তারপর নিজেরও কিছু খাওয়া চাই, না হ'লে মরে যাবে যে! সে মলে তো চল্‌বে না, দৌলতের দশা কি হবে তা' হলে! কিন্তু ভিক্ষা চাইবে কার কাছে? লোকের বাড়ী তো' সে খুঁজে পায় না! সদর রাস্তার দু'পাশে সমস্তই তো দোকান! দোকানে তো স্ত্রীলোকের ভিক্ষে করা চলে না, আর দোকানে কি ভিক্ষা পাওয়া যায়?

এত আশা করে সহরে আসা কি তার বৃথা হ'ল! একে ক্ষুধার তাড়না, তার আবার দৌলত যখন আধ-আধ-স্বরে "মাইয়া" বলে কেঁদে ওঠে, তখন তার প্রাণ যেন কল্ কল্ করে ফেটে যায়। সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত, তাকে কেউ তো ফিরেও দেখে না।

ঘুরতে ঘুরতে সে বাজারে এসে পড়ল। বড় বড় কয়েৎবেল, ভাল ভাল সিদ্ধ "সিঙাড়া", চ্যাঙারি-ভরা "বয়ের", সরস ইক্ষুদণ্ড—কত জিনিস কত লোকে কিনে নিচ্ছে। কিন্তু তার তো একটি "ঢেলা"ও নেই, যার বিনিময়ে অন্তত একমুঠো "মুর্‌রা" নিয়ে দৌলতের মুখে দ্যায়! একজায়গায় দেখ্‌লে একটি লোক একমুঠো পয়সা নিয়ে গুণে দেখছে। দৌলতের মার লোলুপ দৃষ্টি তার মুঠোর ওপর পড়্‌লো। সে আপনাকে সম্বরণ করতে না পেরে খুব ভয়ে ভয়ে একটি পয়সা চাইলে। তার দুঃখের কাহিনী বলতে-না-বলতে লোকটি ঘৃণার সহিত বল্লে, "হট্ যানা, হট্ যানা।" তবুও সে সমস্ত শক্তির উপর ভর করে আবার যেমনি বললে, "বাবুজি!" অমনি সেই লোকটি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল,—"ভালা দিক্‌দারী আগেই! ময়নে কয় তো দিহান্, হিঁয়া কুছ্ না মিলি!" প্রত্যাখ্যাতা হয়ে অন্তর্দ্দাহে, লজ্জায়, ভয়ে এতটুকু হয়ে সে সেখান হ'তে বাজারের অপর পার্শ্বে গিয়ে দেখলে, একস্থানে স্তূপাকারে "জন্‌রী" ঢালা রয়েছে। সেখানে পাইকারেরা গঁহু, জন্‌রী, তিসি ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। পরিচিত পাইকারেরা জিনিস নিয়ে যায়, অবশেষে সুবিধামত হিসেব মিটিয়ে দ্যায়। দৌলতের মা দেখলে অনেকেই প্রচুর পরিমাণে "জন্‌রি" নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কেউ তো দাম দিচ্ছে না। এখানে বোধ হয় চাইলে সে অন্তত একমুঠোও পেতে পারে। এই ভেবে "মহারাজ" বলে আঁচল পেতে বসলো। খরিদ্দার মনে করে জন্‌রি-ওয়ালা বললে, "কেৎনি? চাই সের? লেও।" বলে তার আঁচলে আড়াই সের জন্‌রি ওজন করে ঢেলে দিল। দৌলতের মার প্রাণ আনন্দে গুর্ গুর্ করতে লাগল। কিন্তু মূল্য চাওয়াতে তার উদাস দৃষ্টি দেখে মূল্য দেওয়ার

অক্ষমতা জনরিওয়ালা যখন কতকটা অনুমান করলে, তখন তাকে গালি দিতে দিতে তার আঁচল হ'তে জনরিগুলি ঢেলে নিয়ে বললে, "তোম মেহেরারু হও, ইস্ লিয়ে বাঁচ গয়া। নেহি ত এয়সা মার টিকাতা কি তুমহারা জান ঠাণ্ডাহা হো জাতা!" তুই স্ত্রীলোক বলে বড় বেঁচে গেলি; না হ'লে ঘা-কতক এয়স্যা কোড়া লাগাতাম, যাতে তোর জান ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত। ইতিমধ্যে দৌলত,—নিতান্ত অবোধ দৌলত আত্মপর জ্ঞানহীন দৌলত, ক্ষুধা-কাতর দৌলত তার চিন্তাকুল জননীর অজ্ঞাতে একমুঠো জনরি মুখে দিল। জনরিওয়ালা অবিলম্বে "এবে লৌণ্ডে" বলে' সজোরে দৌলতের গালে চপেটাঘাত করলে। এতে দৌলত যেরূপ কাতরভাবে "মাইয়া" বলে কেঁদে উঠল, তাতে দৌলতের মা যদি পাথরের প্রতিমূর্ত্তিও হত, তা হলেও তার অন্তস্তল বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু সেই সহরের বাজারের কোনো লোকেরই এতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হল না। ছেলেটিকে কোলে নিয়ে ত্রস্তপদে সে বাজারের বাইরে এল। সহরে ভিক্ষে করতে তার আর ভরসা হল না। আবার সে নিজের গ্রামে ফিরে যাবে। যেমন করেই হোক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেও সেখানে প্রতিবেশীর নিকট হতে তবু তো দৌলতকে একটু দুধও খাওয়াতে পারবে।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। দুটো-কিছু পেটে দেবার বিষয়ে যতই সে হতাশ হতে লাগল, দুর্ভাবনায় ভয়ে শরীর-মন ততই যেন ভেঙে পড়তে লাগলো। এখন এই প্রকাণ্ড সহরে রাতটুকু কোথায় কাটাবে, এমন স্থান তো সে দেখতে পায় না। হেঁটে হেঁটে ক্রমে সহরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হল। আরো কিছুদূর গিয়ে দেখলো সেখানে জনসমাগম অপেক্ষাকৃত বিরল। তখন অন্ধকারও হয়েছে, কিন্তু রাস্তার উপর তো তার আস্তানা লওয়া যেতে পারে না! কে জানে পরিশ্রান্ত দেহ—ঘুমন্ত অবস্থায় যদি একখানা এক্কা কি একটা ঘোড়া তাদের উপর এসে পড়ে! রাত্রের অন্ধকারে সে নিকটের একটি "বাগাইচার" মধ্যে আশ্রয় নিল। দূরে "বাগুয়ানের" কুটীরের আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে যেতে তার ভরসা হল না। তা' ছাড়া যা-হোক কিছু-একটা আশ্রয় পেয়ে আবার নতুনের সন্ধান করতে ক্ষমতায়ও কুলাল না। মাটির উপর দৌলতকে শুইয়ে দিয়ে তার পাশেই সে শুয়ে পড়লো। ভগবান্, আজ রাতটুকু যদি দৌলতকে বাঁচিয়ে রাখ তা' হ'লে নিশ্চয় তুমিই তাকে আহার দেবে! মায়ের প্রাণটুকু নিয়েও যদি দৌলতকে নিরাপদ করতে পার,—এটুকুও যদি সে জানতে পারে, তা হ'লেও সে এই অনন্ত মর্ম্মযাতনার হাত হ'তে একরূপ সম্পূর্ণ মুক্তি পায়!

২

বিষাণগড় হ'তে অন্তত ২০।২২ মাইল পশ্চিমে ভিখ্ণার গাঁও। সেখানে তার গর্ভবতী স্ত্রী নিধিয়াকে বৃদ্ধা মায়ের নিকট রেখে সে বিষাণগড়ে উপার্জ্জন করতে এল। কিন্তু বিষাণগড়ে যখন প্রথমে সে রোজগারের কোনো সদুপায় খুঁজে পেল না, তখন সে দু-চারজন সঙ্গী নিয়ে সহরে গুণ্ডাগিরি করে দু'পয়সা রোজগার করতে লাগলো। ক্রমে ভিখ্ণা গুণ্ডার দলের সর্দ্দার হয়ে উঠ্‌লো। এখনো তার দেশে যাবার সময় হয় নি, তবে মধ্যে দৌলতের জন্মের পর মাত্র সপ্তাহ-খানেক দেশে গিয়ে ছিল।

তারপর আজ প্রায় আড়াই বৎসর তিনবৎসর হতে চলল ভিখ্ণা দেশে যাবার সুবিধা করে উঠতে পারে নি। তবে সে সংসার-খরচ হিসাবমত মায়ের নিকট পাঠিয়ে দিত। কিন্তু তার আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখে পাড়ার লোকের হিংসা হল এবং তারা ভিখ্ণার পরিবার-বর্গের উপর শত্রুতাচরণ করতে লাগলো। ক্রমে তাদের অত্যাচার এতদূর বাড়লো যে তারা ভিখ্ণার মাকে স্পষ্টই জানালো যে, যদি সে কুলটা পুত্রবধূকে জারজ সন্তানের সহিত সংসার হতে তাড়িয়ে না দ্যায় তা হলে কেহই তার সঙ্গে কোনো সামাজিক সম্পর্ক রাখবে না। এতে ভিখ্ণার মা যখন ভিখ্ণার দেশে আসা পর্য্যন্ত এই ব্যাপার স্থগিত রাখতে বললে, তখন তারা যুক্তি দেখাল যে, ভিখ্ণা স্ত্রীর স্বভাব ভালরূপ জানে বলেই আর দেশে আসে না। অনেক কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও যখন নিধিয়া বৃথা কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল, তখন কেহই তার দিকে কৃপাদৃষ্টিপাত করলে না। তবে অনেক বাক্যবাণ সহ্য করে দিনান্তে সে দৌলতের জন্ত গ্রাম হতে একটু দুধ সংগ্রহ

করতে পারত। কিন্তু তাও যখন অসহ্য হল, তখন দৌলতের মুখ চেয়ে ২০৷২২ মাইল পথ হেঁটে সহরে ছুটি ভিক্ষালাভের আশায় না এসে থাকতে পারল না। অধিকন্তু তার আশা ছিল সে ভিখণাকে সহরে খুঁজে পাবে।

ভিখণা কিন্তু উৎসাহের সঙ্গে নিশ্চিন্তমনে বিষাণগড়ে চুরি-ডাকাতি করে দিনগুজরাণ করচে এবং এতে যে মোটারকম দু'চার পয়সা সঞ্চয় করতে না পেরেছে এমন নয়। সেদিন সে স্থানীয় ডেপুটী-সাহেবের বাংলোয় ছদ্মবেশে প্রবেশ করে অন্দরমহল হতে গহনার বাক্স চুরি করে রাত্রের অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু পাহারাওয়ালার সন্দেহ-চক্ষুতে পড়ে পলায়ন ভিন্ন উপায় দেখল না। পাহারাওয়ালাও তার অনুসরণ করলে। কিছুদূর গিয়ে ভিখণা সদর রাস্তা ছেড়ে লুকিয়ে থাকবার উদ্দেশ্যে এক "বাগাইচা"র মধ্যে প্রবেশ করলে। কিন্তু সেখানে অন্ধকারে এক স্ত্রীলোককে শায়িত দেখে ধরা পড়বার ভয়ে অদূরে সশব্দে গহনার বাক্স ফেলে অন্ধকারে আত্মগোপন করে রইল। সেই শব্দে নিধিয়ার তন্দ্রা ভেঙে যাওয়ায় সে কৌতূহলী হয়ে সেই বাক্সের নিকটে এসে অন্ধকারে তা পরীক্ষা করতে লাগলো।' এদিকে পাহারা য়ালা বাক্সের ঝনৎকার শব্দে বাগানের মধ্যে এসে নিধিয়াকে বামাল-সমেত গ্রেপ্তার করে রাস্তায় হাজির করল। অসম্ভাবিত বিপৎপাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নিধিয়ার কিন্তু দৌলতের জন্য প্রাণ আকুল হওয়াতে যখন অস্ফুটস্বরে, "আমার দৌলত,—আমার দৌলত" বলে উঠল, তখন রুক্ষস্বরে পাহারাওয়ালা বললে, এ ধনদৌলত তোর কি কার তা' কোতোয়ালীতে কাল কবুল করলেই চল্‌বে; এখন রাতটুকু ফাটকে তো কাটাও।"

হায় বিধাতা, এতদূর নিদারুণ দুঃখ নিধিয়ার কপালে লিখ্‌তে কি তোমার হাত কেঁপে ওঠেনি! এও না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু অবোধ অপোগণ্ড দৌলতের অদৃষ্টে যাঁর দ্বারা এমন বিধান বিহিত, না-জানি সে কি পাষাণ বিধাতা! আজ প্রায় চারদিন সে কিছুই খায় নি বললেই হয়। তার উপর যে মা-ছাড়া সে আর কাকেও জানে না, সেই মা বিনে সে কেমন করে শিশু হ'য়ে আপনাকে সম্বরণ করবে! উঃ—নিধিয়ার বুক যেন ফেটে যেতে লাগলো! দুর্ভাগ্যের নিস্পেষনে পিষ্ট হয়ে তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুচ্ছে না—তার চোখেও এক ফোঁটা জল নেই!

জমাদার সাহেব যখন তাকে ফাটকে পুরে লোহার কপাটে তালা লাগালো, তখন নিধিয়ার মন একেবারে দমে গেল। মানুষের প্রাণে আর কত সয়! নিরপরাধিনী হয়েও কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে হল! আবার আজ কয়েক দিন একরূপ অনাহার! মুষ্টিভিক্ষার আশায়,—আত্মরক্ষার আশায়—প্রাণ হতেও প্রিয়তর সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তির আশায় সারাদিন বৃথা ঘুরে ঘুরে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়,—পেটের ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে। উঃ! এ-চিন্তাও মায়ের প্রাণে কি অসহ্য যন্ত্রণা-দায়ক! 'ওঃ হো! বাছা রে!'—বলে,' সে দম ফেললে। কিন্তু কে তার কাতর ধ্বনি শুনবে? নীরব, নিশীথ রাত্রে ফাটকের গরাদে ধরে নিধিয়া ভাবতে লাগলো, কি কুক্ষণে গ্রাম ছেড়ে সহরে এসেছি! ভগবান, এই কি সহরের আচরণ! বুকের পাঁজর ভেঙে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে কেন এরা ফাটকে আটকালে তা তো জানি নে! আমার মত লোককে ফাটকে ধরে আন্‌বার কারণ কি? শুনেছি বে-আইনী কাজ কর্‌লে কোতোয়ালীতে ধরে নিয়ে যায়। তবে কি পরের বাগানে আমার মত অনাথা ভিখারিণীর আশ্রয় লওয়াটাই বে-আইনী হয়েছে? সহরের আইন তো আমি জানি নে; আর তা হ'লে আমার দৌলতও তো সেই দোষে দোষী—তার কেন আমার সঙ্গে ফাটকে বাস হ'ল না? উঃ! ঘুম হ'তে জেগে' সে মাইয়া বলে কাঁদবে—ওঃ!

৩

ভিখণা যখন বুঝলো যে ঘটনাচক্রে পড়ে একজনের উপর তার কৃতকার্য্যের দোষ চাপাতে পেরেছে, তখন সে ছদ্মবেশ পরে' কতকটা নিশ্চিন্তমনে গুপ্তস্থান হতে বাহির হল। কিন্তু অদূরে একটি শিশুকে গাছতলায় নিদ্রিত দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারই কর্ম্মের ফল ভোগ করতে গিয়ে যে-রমণী আজ ফাটকে গেল এ তো নিশ্চয়ই তার শিশু! ছি ছি ছি! এমন হীন উপায়ে সে তো আর কখনো আত্মরক্ষা করে নি। আহা!

তারই জন্য আজ এই শিশুটি মায়ের কোল-ছাড়া হল! ছেলেটির উপর অনুকম্পা-বশত এবং আপনার আচরণে আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়ায় ভিখ্ণা সেই ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সন্তর্পণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। বাড়ী এনে তাকে যখন ভোলাবার জন্য দু'হাতে দু'খানা "পেঁড়া" দিল, তখন তার খাবার আগ্রহ দেখে তার বুঝতে বাকী রইল না যে এরা মাতা-পুত্রে বহুদিন যাবত অভুক্ত রয়েছে। মার জন্য ছেলেটি একটু কাঁদলো বটে, কিন্তু ভিখণার অল্প চেষ্টাতেই শ্রান্ত শিশু ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হল।

ছেলেটির দিকে চেয়ে, তার প্রতি এবং তার মার প্রতি ভিখণার নিজের ব্যবহার যতই মনে পড়তে লাগলো, ততই সে অস্থির হয়ে পড়লো। পরদিন যথাসময়ে একজন সহচরের উপর শিশুটির ভার দিয়ে, শিশুর নিরপরাধিনী জননীর ভাগ্যে কি শাস্তির ব্যবস্থা হয়, তাই দেখবার জন্য ছদ্মবেশে কোতোয়ালীতে গিয়ে হাজির হল। মনে ভাবলে অসম্ভব হলেও যদি কোনো উপায়ে তার শাস্তি কতকটা লাঘব করতে পারে, তাতেও তার অনেক শান্তি।

অবগুণ্ঠনবতী নিধিয়া কাঠগড়ায় অবনতমুখে দণ্ডায়মানা। ডেপুটী-সাহেব বিচারাসনে আসীন। সকলেই বিচারফল জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব, কেন-না যার বাড়ী চুরি হয়েছে তিনিই অপরাধের বিচারকর্ত্তা। ডেপুটী-সাহেব বললেন,—তু' কিস্তরহ্‌সে মেরে ঘর্ সে বাকস্ চোরায়া, সব বাত্ আগার্ সাচ্ সাচ্ বাতাও তো তেরা দণ্ড্ কুছ্ কম্‌তি হো সাক্‌তা হ্যায়।

নিধিয়ার বিরুদ্ধে তা হ'লে চুরির অভিযোগ! নিধিয়া এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিবে! জীবনে সে কখনো চুরী করে নি! কলঙ্কিনী, পরিশ্রান্তা, একমুষ্ঠি অন্নের কাঙালিনী, প্রাণাধিক পুত্রের মুখ চেয়ে সহরে এসে, আজ সহরের আইনের চক্ষে চোর! নিধিয়ার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। লজ্জায়, ভয়ে, রুদ্ধকণ্ঠে নিধিয়া বললে, "হুজুর! হাম্ তো চোরী নেহি কিয়া!" রুদ্রস্বরে বিচারক বললেন, "বদমা'স? ঝুট্‌বাত্? তু' জান্‌তা হ্যায় কি জেল্‌মে সড়্‌কর্ মরণে হোগা?"

নিধিয়ার পায়ের তলা হতে যেন মাটী সরে যাচ্ছে। তার শ্রান্ত দেহ, ভগ্ন মন এ অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছে না। সে জেলে গেলে তার দৌলতের কি অবস্থা হবে! দৌলতের মুখ চেয়ে সে যে সমস্ত যন্ত্রণা প্রাণপণে সহ্য করে এসেছে। কিন্তু সে জেলে গেলে কে তার দৌলতের প্রতি দয়া দেখাবে! সে যে ক'দিন কিছুই খেতে পায় নি। সে কি প্রাণে বেঁচে আছে! "বেটা রে আমার, দৌলত রে!" বলে' নিধিয়া কাঠগড়ার মধ্যে অচেতন হয়ে পড়লো।

কিন্তু এ কি,—এ যে ভিখণার পরিচিত স্বর! এ যে নিধিয়ার কণ্ঠস্বর! ভিখণা কিছু বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠলো। ডেপুটী-সাহেব এ-ব্যাপারে কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে রোগিনীর পরিচর্য্যার জন্য অবিলম্বে দুইজন কাহারীণকে দিয়ে নিধিয়াকে আপনার বাংলোয় পাঠিয়ে দিলেন। আদালতের সকলেই নীরব স্তম্ভিত! ভিখণা কিন্তু আর ধৈর্য্য ধরতে পারছে না। নিধিয়া কোথা হতে কেন বিষাণগড়ে এ-অবস্থায় হাজির হয়েছে? তবে কি নিধিয়া? না—না—না!

নিধিয়ার পক্ষে কুলত্যাগ করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার! নিধিয়া কি পাপের মন্ত্রণায় ভুলতে পারে! অসম্ভব, অসম্ভব! কিন্তু কোথা হতে এ-ব্যাপার সংঘটিত হল? হায় হায়, যাদের জন্য সে চুরি করছে তারাই আজ অনাহারে মরতে বসে এই অবস্থা! তবে কি সেই শিশুটি তার সাধের দৌলত? ভিখণার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল! পরচুলের গোঁফদাড়ি একটানে উপড়িয়ে ফেলে বিচারাসনের সম্মুখে হাঁটু-গেড়ে করযোড়ে বললে, ডিপ্‌টি সা'ব! ধর্ম্মাবতার, এ মোকর্দ্দমার আসামী আমি,—ভিখণা সর্দ্দার! নিরপরাধিনীকে মুক্তি দিয়ে সুবিচার বিধান করুন হুজুর!"—বলে পূর্ব্বরাত্রের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করলে। উপস্থিত সমস্ত লোকই একেবারে যেন হতবুদ্ধি! এ রহস্যময় মোকর্দ্দমায় কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে বিচারক বললেন, "তোমার কথায় তুমি দোষী সাব্যস্ত হচ্ছ, কিন্তু তুমি জানছ কি তোমার অপরাধ কতদূর গুরুতর? আর অনুমান করতে পারছ কি তোমার ভাগ্যে কতদূর কঠোর শাস্তি আছে?"

"তাই হোক ধর্ম্মাবতার, তাই হোক! এ-ব্যাপারে আমার এমন-একটা অন্তর্দাহ হচ্ছে,—আমি তার কঠোর

শাস্তি মাথায় পেতে না নিয়ে থাকতে পারছি নে ভিখ্‌ণা সর্দ্দার গুণ্ডার দলের সর্দ্দার বটে, কিন্তু তাই বলে সে মনুষ্যত্ব হারায় নি।''

"বটে! কিন্তু এ মনুষ্যত্ব তখন কোথায় ছিল, যখন একজন পথের কাঙালিনীর উপর নিজের দোষ চাপিয়ে আপনার সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছিলে? আর তোমার ঐ মনুষ্যত্বই বুঝি তোমাকে চুরি করবার মত্‌লব্‌ বাৎলে দিয়েছিল?"

"হুজুর, এ বান্দার কথায় অপরাধ নেবেন না; হুজুর যদি জান্‌তেন কি-অভাব-অনাটনের মধ্যে পড়ে স্ত্রীপুত্রের খাওয়া-পরা যোগাড় করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও অক্ষম হ'য়ে অসদুপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলাম, তবে হুজুর এমন কথা বল্‌তেন না। কিন্তু আজ হ'তে আমার সকল কর্ম্মের অবসান হ'ল! আমার যেন বেশ মনে হচ্ছে যাদের জন্য আমি উপার্জ্জন করছি, আমার কপাল দোষে তারাই বোধ হয় না-খেতে পেয়ে মরতে বসেছে! কিন্তু কোতোয়ালীতে এসব কথার দরকার নেই। আমায় শাস্তি দিন হুজুর, আমার কুকর্ম্মের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যাক্! আমার প্রাণে এখন কি যে যাতনা হচ্ছে তা জানাবার নয়, লোকের কাছে বোঝাবারও নয়!"

—"কেউ তা' জানবার জন্য বোধ হয় ব্যস্তও নয়, তারা যা' জেনেছে তাতেই তারা সন্তুষ্ট! তারা বুঝেছে তুমি একজন ভীরু কাপুরুষের সর্দ্দার! তুমি একজন অসহায়া ভিখারিণীর ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে তাকে বিপদে ফেল্‌তে লজ্জিত নও! ধিক্ তোমাকে!"

ইতিমধ্যে কাহারীণ এসে সংবাদ দিল, ভিখারিণীর জ্ঞানসঞ্চার হয়েছে, তাকে কি আদালতে আনা হবে? ডেপুটী-সাহেব কিয়ৎকাল কি ভেবে কাহারীণের কথার কোনো জবাব না দিয়ে ভিখ্‌ণাকে বললেন, "ভিখ্‌ণা, কতদূর কঠোর শাস্তি হ'বে অনুমান করতে পারছ কি?"

"ধর্ম্মাবতার, আমি সাজা-ই চাই। সাজার ভয় করলে আমি কিছুতেই নিজেকে ধরা দিতে পারতাম না। তবে আমাকে একটি দিনের—ধর্ম্মাবতার, মাত্র আজকের দিনটির জন্য মুক্তি দিন। আমি একবার দেশে গিয়ে স্ত্রীপুত্রের ব্যবস্থা করে আসি। দোহাই ডিপুটি-সাহেব! আমাকে সাজা দিতে গিয়ে এক অসহায়া স্ত্রীলোকের, একরত্তি শিশুর শাস্তিবিধান করবেন না!"

"থাম ভিখ্‌ণা, তোমার কথা বুঝেছি। দেখ কাহারীন্, তুমি সেই ভিখারিণীকে বল গে, তাকে ভুল করে চোর বলে ধরা হয়েছিল, যথার্থ চোর ধরা দিয়েছে। ভিখারিণীকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তবে যে-চোর তাকে এত বিপদে ফেলেছিল, সেই চোরের কিরূপ শাস্তি হলে তার মনের মত হয়, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে সংবাদ দিয়ে যাও।"

কাহারীণ চলে গেলে বিচারক পুনরায় বলতে লাগলেন, "ভিখ্‌ণা, আমার বাড়ীতে তুমি চুরি করেছ, আমার কাছে তুমি দোষী, আমিই তোমার বিচারক। আমি যদি তোমার সাজার ব্যবস্থা করি, যতই কেন সাবধান হই না, অপরাধের অনুপাতে গুরুদণ্ড হবেই হবে। কাজেই তোমার যখন অনুতাপ এসেছে দেখ্‌ছি, তখন তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিয়েই আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। কিন্তু সেই ভিখারিণী তোমার ভাগ্যে কি ব্যবস্থা করে দেখি। তার বিচারে তোমার যে-দণ্ড বিহিত হবে তার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই।"

এমন সময় কাহারীণ্ এসে সংবাদ দিল, "হুজুর, ভিখারিণীর বোধ হয় একটু পাগলের ছিট আছে; সে আপনার কথার উত্তরে বললে, চোরকে দণ্ড দেবার তার ইচ্ছে নেই, তবে সে যেন কখনো মায়ের কোল হতে সন্তানকে ছিনিয়ে না ন্যায়।"

এই কথায় সকলেই কেমন-যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হল। কিন্তু ভিখ্‌ণার প্রাণে ঐ কথা ক'টি তীক্ষ্ণ বাণের মত বিঁধে রইল। বিচারক বিশেষ-কিছু না বুঝতে পেরেই বললেন, তবে তাই হ'ক, ভিখ্‌ণা, তুমি মুক্ত! যে-স্ত্রীলোকের উপর নিজের দোষ চাপাতে গিয়েছিলে, সেই পথের কাঙালিনীর দেওয়া মুক্তি ভিক্ষা লয়ে, সহায়-সম্বল-হীনার করুণায় অভিষিক্ত জীবন বহন করে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর গে! এই দণ্ডই তুমি আজীবন ভোগ কর।''

অপমানিত দুর্ভাবনাকুল, বাক্যবাণবিদ্ধ ভিখ্‌ণা বিপুল যাতনায় সকলের চোখের উপর দিয়ে উন্মাদের মত ত্রস্তপদে সদর রাস্তায় বাহির হয়ে পড়লো।

৪

নিধিয়ার মুখে-চোখে জল দিতে দিতে সে চক্ষু মেলে চাইল। ডেপুটী-সাহেবের গৃহিনীর আদেশে কাহারীণ কয়দিন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোরের সেবা করে নিধিয়াকে চাঙ্গা করে তুললে। নিধিয়ার এ আবার কি পরিবর্ত্তন! কেউ তাকে বাতাস করছে, কেউ গায়ের জল মুছিয়ে দিচ্ছে। সে কি স্বপ্ন দেখছে, না তাকে কোনো "জিন্"এ ভর করেছে? নতুবা এইমাত্র সে কোনো এক "বাগাইচা"র মধ্যে শয়ন করলে; অকস্মাৎ তার ফাটকে বাস ব্যবস্থা হল! আবার এইমাত্র তার বিচার হচ্ছে, মুহূর্ত্তমধ্যে সে পরিচারিকা-পরিবৃতা! কিন্তু সে যাই হোক, তার দৌলতের সংবাদ না জেনে আর উদাসীন থাকা তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার!

ডেপুটী-গৃহিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার শরীরটা একটু সেরেছে?" পাগলের মত ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টিতে ক্ষীণস্বরে নিধিয়া উত্তর দিল, "হাঁ মা—যাব মা?"

"কোথায় যাবে?"

"দৌলতকে আন্তে মা!—"

ডেপুটী-গৃহিনী বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, "তা' যেয়ো এখন, আগে শরীরটা একটু সুধরে নাও,—এখনো যে তুমি ধুঁকছ। খিদে পেয়েছে? কিছু খাবে কি?"

"খাবার!" নিধিয়া কেঁদে ফেললে—বললে, "দে না খাবার,—আজ কতদিন কিছুই খেতে পায় নি!"

উপস্থিত সকলেই নিধিয়ার আচরণে তাকে পাগল বলে সিদ্ধান্ত করলে। ডেপুটী-গৃহিনী যেন কিছু বিচলিত হয়েই তাকে পরিমাণমত "কলকন্দ" আর কয়েকখানি টাট্কা "জিলিপী" খেতে দিলেন। নিধিয়াকে আগ্রহের সহিত খাবারটুকু ছেঁড়া আঁচলের খুঁটে বাঁধতে দেখে, উপস্থিত সকলের মধ্যে একজন পাগল নাচাবার উদ্দেশ্যে বললে, "তুমি যদি খাবার না খাও, তোমার খাবার কেড়ে নেব, তুমি খাবার বেঁধে নিয়ে যেতে পাবে না!"

নিধিয়া মর্ম্মান্তিক যাতনায় হতাশ দৃষ্টিতে ডেপুটী-গৃহিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছল-ছল-নেত্রে বললে, "তবে নে মা তোর খাবার! আমি ভুলে গেছলাম মা;—সহরের লোকের যে ভিক্ষে দিতে নেই! আমার জন্য কি তোমরা সহরের অধিবাসী হয়ে সহরের ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পার মা? যদি জান্তে মার বুক থেকে দুধের বাছাকে ছিঁড়ে টেনে—

"না বাছা, রাখ রাখ,—খাবার তুমি বেঁধে রাখ—"

নিধিয়া ভাবতে লাগল, "হা অদৃষ্ট,—মা হয়ে ছেলেটার মুখে কোনোমতে একটু আহার দিয়ে তার অসহ্য যন্ত্রণার একটুখানিও নিবারণ করতে পারলাম না! অসহায় শিশু কোথায় এতক্ষণ দুটি খাবার জন্য কাতর হয়ে পড়ে আছে! সহরে তো কেউ তার কষ্ট বুঝবে না! আহা দৌলত আমার, সোনার চাঁদ দৌলত। এ অনাথার পেটে জন্মগ্রহণ করে তোর এতদূর দুর্গতি হচ্ছে?"

নিধিয়ার দু'নয়ন দিয়ে দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরতে লাগলো। এমনসময় সে নিজের মুক্তির সংবাদ পেয়ে ডেপুটী-সাহেবের প্রশ্নের উত্তর কাহারীণের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে টলতে টলতে দৌলতের অন্বেষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তার মুক্তির জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা বা আনন্দ প্রকাশ করতে না দেখে সকলেই ঠিক করলে, এ ভিখারিণীর পাগলের ছিট না থেকে যায় না। কিন্তু সে কী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে! তার আনন্দ কোথায়? সে যে এখনো চলে বেড়াচ্ছে,—সে কেবল দৌলতের চিন্তার উৎকট ব্যাকুলতা-প্রভাবে!

"নিধিয়া, নিধিয়া, নিধিয়া আমার?"

কি আশ্চর্য্য! নিধিয়ার কি মতিভ্রম হয়েছে? ভিখ্ণার গলার আওয়াজ নয়? এত মধুর এত স্নেহ-কাতর আহ্বান সে যে কতদিন শুনতে পায় নি! নিধিয়া অস্থির হয়ে ভিড়ের মধ্যে কাকে খুঁজতে লাগলো।

উদারহৃদয় ডেপুটী-সাহেবের কৃপায় মুক্তি পেয়ে ভিখ্ণা নিধিয়াকে খুঁজতে খুঁজতে কোতোয়ালী হতে ডেপুটী-সাহেবের বাংলো অভিমুখে আসবার সময় পথে দূর হতে নিধিয়াকে দেখে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে তার হাতখানি আবেগে সজোরে চেপে ধরলে।

অসম্ভাবিত ঘটনায় হতবুদ্ধি নিধিয়া ভিখ্ণার মুখের দিকে উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "তুমি,—তুমি,—আমার দেবতা তুমি!"

"নিধিয়া, নিধিয়া! অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক ভিখ্ণা

সর্দ্দারের স্ত্রী-পুত্রের এ-দশা কে কর্‌লে নিধিয়া ? মা কোথায় ?"

—"মা দেশে আছেন—ভাল আছেন। তোমার দৌলত—বলে' নিধিয়া শিশুর মত কেঁদে ফেললে।

ভিখণা বললে, "দৌলত আমার কুঠীতে আছে,—চল নিধিয়া, সে তোমায় জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছে।"

এই কথায় নিধিয়া ভিখণার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলো। এতক্ষণে তার সমস্ত দুর্ভাবনার অবসান হওয়াতে তার পরিশ্রান্ত দেহ শিথিল হয়ে পড়্‌লো। সে কেঁপে কেঁপে বসে পড়তে যাচ্ছে, এমন সময় একখানা এক্কায় চাপিয়ে ভিখ্‌ণা, মলিন-ছিন্ন-বসনা জীর্ণক্ষীণা নিধিয়াকে তার শয়নকক্ষে এনে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় সস্নেহে শয়ন করিয়ে দিল। দৌলত তখন "মাইয়া" বলে নিধিয়ার বুকের উপর শুয়ে কি জানি কেন কাঁদতে লাগলো। নিধিয়া তার সমস্তটুকু গায়ের জোর সঞ্চয় করিয়ে, দৌলতকে বুকের উপর চেপে ধরে, 'বাপ আমার, এই নাও—তোমার জন্য ভিক্ষে করে খাবার এনেছি, খাও তো বেটা। বলে আঁচল হতে "কলকন্দ" আর 'জিলিপী' দৌলতের হাতে দিল।

"নিধিয়া, নিধিয়া, তোমার এদশা কে কর্‌লে নিধিয়া ?"

"প্রতিবাসীরা আমার নামে অপবাদ দিয়েছে। তারা বলে, তুমিও জানো আমার কলঙ্কের কথা।"

"আমি ! আমি !—নিধিয়া ! সতীর নামে কলঙ্ক রটাতে তাদের কিসে এত ভরসা হল ? "

তবে নিধিয়া ভিখ্‌ণার চক্ষে দোষশূন্যা। নিধিয়ার শুষ্ক মুখে বিমল হাসির ক্ষীণ শুভ্র রেখা ফুটে উঠলো।

শ্রীরাখালচন্দ্র ভটাচার্য্য।

———o———

আবাহন

আজি শুভদিন,　　　　মঙ্গল বীণ
বাজে গম্ভীর ছন্দে,
অন্তর-পুর　　　　হোক্ ভরপূর
কল্যাণ মধু-গন্ধে।
আজি প্রভাতের　　　　অরুণ রাগের
লালিমা-দীপ্ত বর্ণে,
গৌরব-গাথা　　　　হৃদয়ের পাতা
ভরি' দিল রাঙা স্বর্ণে।
আজি এ উষায়　　　　সোনালি ভূষায়
সজ্জিত সারা বিশ্ব ;
সাজালো তোমায়　　　　সুধা-গরিমায়
ভাণ্ডার করি' নিঃস্ব।
নব বরষের　　　　আশা হরষের
ধ্বনিত পুণ্য শঙ্খ,
কণ্ঠে তোমার　　　　যশোরাশি-হার
অমলিন অকলঙ্ক !
এ-মধু বর্ষে　　　　ধরার হর্ষে
সঞ্চারে তব চিত্তে,
উৎসাহ জয়　　　　রিক্ত হৃদয়
ভরি' দিবে নানা বিত্তে।
ভক্তি পূজার　　　　শুভ উপচার
তুলি' নিয়ে কর ধন্য ;
মানস-বেদীতে　　　　গড়েছি পূজিতে
মূর্ত্তি তব প্রসন্ন।
শ্রদ্ধা ও প্রীতি　　　　চন্দন-নীতি
রচি' পবিত্র অর্ঘ্য,
চরণে তোমার　　　　হৃদয়-সম্ভার
করিয়াছি উৎসর্গ।
ওগো সাধনার　　　　ধ্যান-ধারণার
দেবতা আমার উচ্চ,
ভক্তি-মগন　　　　পূজা-আয়োজন
কোরোনা কো আজ তুচ্ছ।
হৃদয়-মন্দিরে　　　　পূত আঁখি-নীরে
সুখ-দুখ থেকে মগ্ন,
সার্থক কর　　　　আরাধনা মোর
শুভ কর এই লগ্ন।
মঙ্গল-ভোরে　　　　চিরসাথী মোরে
কর দেব কর ধন্য ;
ধেয়ানে আমার　　　　মূরতি তোমার
গড়েছি তোমার জন্য।

শ্রী————শর্ম্মা।

ইতিহাসের অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন

সংজ্ঞা :—ইতিহাসকে কেউ বল্‌ছেন Philosophy examplified আর কেউ বল্‌চেন বড় লোকদের life এর সমষ্টি, অর্থাৎ কেউ বলচেন ভাজা চা'ল, কেউ বল্‌চেন মুড়ি। যাই হোক এটা যে মানবজীবনেরই কোনোরকম বর্ণবিন্যাস তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই, "The best study of mankind is man" কবি পোপ বলেছিলেন। পোপের কথাটা সকলে স্বীকার করুন আর নাই করুন মানুষের studyতেই যে মানুষ সব চেয়ে interested এতে বোধ হয় কারো অন্যমত নেই। কারণ মানুষের চাইতে মানুষের এত আপনার আর কেউ নেই—হতেও পারে না। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখের ছায়াপাতে বিভিন্ন অনুপাতে ষড়ঋতুর যে-অভিনয় হচ্চে, তাতে কখনো মলয়ানিলের গন্ধ বিলিয়ে ফুটে উঠ্‌চে বসন্তের ফুল; কখনো মানুষের মজ্জা কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছে কুয়াসার আঁধারে হিমের হাওয়া। মানবের এই অনুভূতির ইতিহাস যেমন করে তার প্রাণের অন্তস্তলে গিয়ে স্পর্শ করতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না। তাই আমরা দেখ্‌তে পাই বিশ্বসাহিত্য সব চেয়ে বেশি নাড়াচাড়া করেছে মানুষকে নিয়ে। আর সাহিত্যের এই বিভাগটা সমজদার পাঠকও পেয়েছে সবচেয়ে বেশি।

ইতিহাস সমষ্টিগত হিসাবে মানুষের সুখ-দুঃখেরই ইতিহাস। সুতরাং মনস্তত্বের ল্যাবরেটারিতে বসে আমরা ভাবি, ইতিহাস-অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমজদার পাঠক পাওয়া যাবে। কিন্তু বাইরে এসে যা দেখ্‌চি তা এ-সিদ্ধান্তের অনুরূপ তো নয়ই বরং তার বিপরীত। সাধ্যপক্ষে কেউ তার ত্রিসীমা মাড়াতে চায় না। সরকার বাহাদুর যদি এমন একটা আইন করে বসেন যে, ইতিহাস পড়ার প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করা Amount to waging war against the Government established by law in British India, ইত্যাদি। তা হ'লে C. I. D. অনেক চেষ্টা করেও অনেক ছাত্রকে এ-আইনের কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন কিনা সন্দেহ।

Theoryর সঙ্গে Reality বা বাস্তবের এই যে অদ্ভুত বৈষম্য এর একটা নিগূঢ় কারণ আছে, তাতে বোধ হয় কেউ আপত্তি উত্থাপন করবেন না। মনের এই অস্বাভাবিকতা বা ব্যাধিগ্রস্ততার কারণ নির্ণয়ের একটা dietetic treatmentএর ব্যবস্থা দেওয়ার চেষ্টা এই প্রবন্ধের শেষভাগে করা হ'ল, তা গ্রহণ বা রক্ষণযোগ্য কি না তা সুধীগণের বিচার্য্য।

শিক্ষা বিভ্রাট :—স্বামী বিবেকানন্দ একবার প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছিলেন,—"Education is the menifestation of perfection already in man." মানুষের সুপ্ত বোধশক্তিকে জাগ্রত বিস্তৃত এবং প্রকাশিত করে দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের সমগ্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠার মধ্যে আর সবই আছে, নেই শুধু এইটে। আমাদের শিক্ষাবিভাগে হস্তীভুক্ হাঙ্গর থেকে কর্দ্দমপুষ্ট চুনো পুঁটি পর্য্যন্ত সবই আছে, নেই শুধু মানুষ গড়বার চেষ্টা করে এমন মানুষ। শিক্ষার উন্নতি হোক্ আর নেই হোক্ পরিদর্শকের সংখ্যা যে ক্রমাগত বেড়েই চলেচে, তা সবাই দেখ্‌তে পাচ্ছেন। ইদানীং পর্ণকুটীরবাসী বালকদের জন্য বিদ্যার palace তৈরী হচ্ছে। তাতে অনেক highly finished টুল, বেঞ্চ, হাই-বেঞ্চ, টানাপাখা, ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান ও কাচের জানালা। * এমনি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের Standard of living heighten করার গুরুতর অধ্যবসায় চল্‌চে। এবং তা maintain করতে গিয়ে আমরা middle class manরা একেবারেই bankrupt হয়ে যাচ্ছি। দেবতার অলঙ্কারের factoryতেই আমাদের সব energy খুইয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্তরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার দিকে আমাদের লক্ষ্যও নেই। †

---

* An effective teacher is certainly handicupped by inadiquate class-rooms equipment and that there is a close connection between education and standard of life. (Mr. Hornell in the "Progress of Education in India.")

† The modern tendency in India to extravagance in bricks and mortar for schools and colleges, should be checked. Many experienced observers believe buildings than those at

যে বহির্ম্মুখীন্ সাধনার ভীষণ সফলতায় অভিষ্ট হ'য়ে মানুষের অন্তরের দেবতা সমগ্র য়ুরোপটাকে একটা বিরাট ভূকম্পে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল, এখন সেইটেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার একটা অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলেছে, একথা কি বলা যায় না? এই ব্যা[illegible] দেখে আমাদের রবীন্দ্রনাথের সেই "তোতা-কাহিনী" মনে পড়ে। সে কাহিনীটা একবার সংক্ষেপে বলে নি:—রাজার যে তোতাপাখী ছিল, সেটিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তুলতে রাজা তাঁর শ্যালকদের হাতে দিয়েছিলেন। কারণ বড়-কুটুম্ব ছাড়া অধিক বিশ্বাসের পাত্র আর কেউ হ'তে পারে না। শ্যালারাও তোতার সোনার খাঁচা গড়তে বড় বড় কারিকর, খাঁচা রাখার ঘর তৈরী করতে দলে দলে mason-মিস্ত্রী, শাস্ত্র শেখাবার জন্য একদল বড়-পণ্ডিত লাগিয়ে দিল। পণ্ডিতেরা বস্তা বস্তা বই এনে টুক্‌রো টুক্‌রো করে লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে তোতার মুখে পুরে দিতে আরম্ভ করলেন। তোতা বেচারী প্রথম প্রথম খুব resist করে শেষে আস্তে আস্তে শান্ত হ'য়ে এল। খাঁচা তৈরী হ'ল, ঘর তৈরী হ'ল, equipmentও যখন শেষ হ'ল ততক্ষণে তোতা হাত-পা ছুঁড়ে বেশ সটান খাঁচার তলায় পড়ে আছে, আর সাড়াটিও নেই। ইতিমধ্যে অনেক বড় বড় Bill পাশ হয়ে গেছে, আর রাজামশায়েরও অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেছে। একদিন মহারাজ স্বয়ংই পরিদর্শনে এলেন। সেদিন শ্যালাদের কদর দেখে কে! তারা বলতে লাগ্‌লো,—দেখুন এমন গেট্, এমন Building, এমন সোনার খাঁচা তৈরী হয়েছে! আর training? সেজন্য তো বস্তা-বস্তা বই খরচ হয়ে গেছে। চাটুকার ছিল পাশেই দাঁড়িয়ে, সে অমনি শ্যালাদের মনস্তুষ্টির অবসর পেয়ে বলে উঠলো,—"বাহোবা বাহোবা বেশ!"

present erected are adequate for Indian Educational purposes. It is for the state to put money into the making of men for more than into ornate buildings. In particular the national (Primary) schools should be of the simplest constructions.

(*Educational supplement. The Times—29th Sept. 1917*).

The greatest teachers of ancient India were forest-dwellers, and gathered their students round them in the open air. A showing of the face in order to wait for good buildings and other conditions of an ideal state of things would be a crime against the young life of India and her future generations. —*India in Transition. H. H. The Aga Khan.*

আমাদের ছাত্ররাও এখন হাত-পা ছুঁড়্‌চে কিনা—তাই আমরাও লাঠি দিয়ে তাদের গলায় যা ঢুকিয়ে দিচ্ছি, তা শিক্ষা নয়—নীরস কাগজের কতকগুলো টুকরো। যাহোক্ অবান্তর কথা ছেড়ে এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাক্। কিন্তু রোগের origin আর historyটা ভালো করে না জান্‌লে সুচিকিৎসাটা যে নিতান্তই chance এর উপর নির্ভর করবে। আমরা গোবরগণেশ নাবিকরা অকূল সমুদ্রে অক্লান্ত পরিশ্রমে কেবল দাঁড়ই টান্‌ছি, কম্পাসের দিকেও দৃষ্টি নেই—কোথায় যে যাব তারও স্থিরতা নেই। সারাদিন দাঁড় টেনে সন্ধ্যেবেলায় দেখছি যে,—আমরা যে-অকূল সমুদ্রে ছিলুম, এখনো সেই অকূল সমুদ্রেই পড়ে আছি। "বনরাজী নীলা"র এতটুকু ক্ষীণ রেখাও দূর চক্রবালে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

নীতি-বিভ্রাট্:—আমাদের ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাটা হচ্ছে "থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড়" রকমের। ঘুরে ফিরে সেই Stuart, Hunter, Smith, Elphinstone, Eliot প্রভৃতিরই চর্ব্বিত-চর্ব্বন চল্‌চে। এঁরাই হচ্ছেন আমাদের Indian historyর বৈদিক ঋষি। তাঁরা যা বলে গেছেন বা বল্‌চেন, তাই আমরা Gospel truth মনে করে অথবা কিছু মনে করার Troubleটাও পর্য্যন্ত না নিয়ে একেবারে না-চিবিয়েই গলাধঃকরণ করচি। জ্ঞান যেমনি থাকুক্ মাষ্টারির ঘানিগাছে যাঁরা বেশিদিন ঘুরেছেন তাঁরা যেমন experienced teacher, আমাদের graduateরাও তেমনি experienced students মাত্র। তাঁরা কিছু দীর্ঘকাল ছাত্রগিরি করেছেন বটে, বিদ্যা কিন্তু সেই Matriculation এরই। উভয়েরই সম্বল অধর বাবুর সেই চুটকি—A short......Indian People.

Universityর বাঁধা গদের syllabus মুখস্ত করেই graduateরা খালাস। যেখানে পরিশ্রমটা একটা-

কিছু সৃষ্টি করচে না, সেখানে বাস্তবিকই তার কোনো মূল্য নেই। আর সেটা হৃদয়গ্রাহীও হতে পারে না। আমাদের Scholarরা কেবল পুরুষানুক্রমে মাটিই খুঁড়ছেন, কোনোদিন যে তার ফলে শীতল জলপূর্ণ জ্ঞানবাপীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, তার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেন ;—যে-শব্দটা ক্রমাগত অবিশ্রান্ত একইভাবে আমাদের কানে আসে সেটা অভ্যাসবশে শেষে নিঃশব্দের আকার ধারণ করে—আমাদের কানে আর তেমন appeal করে না। গাঁয়ের লোক প্রথমে কলিকাতা সহরে এ'লে ট্রামের ঘড়-ঘড়, ছ্যাঁকড়া গাড়ির ছড়্-ছড়্, লোকের অবিশ্রান্ত কল-কল আর ইদানীং মোটরকারের বুক-কাঁপানো গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে তাদের প্রাণটা কেমন আইঢাই করে ওঠে। কিন্তু শেষে ক্রমে সেই দৈত্যপুরীর ঝড়ো গরম হাওয়াটাও গায়ে লাগে না, কলরবটাও কানে বাজে না। অমরত্বটাও যদি অপরিবর্ত্তনশীলতার রাজত্বে চল্‌তে থাকে, তবে সেটাও মানুষকে তেমন Interested কর্‌তে পারে না। অমাবস্যার অভাবে পূর্ণিমা কখনো লোভনীয় জ্যোৎস্না বিকীরণ করতে পারে না। কবির কল্পনায় এমন স্বপ্নরাজ্যও সৃষ্ট হত না। আমাদের অজ্ঞানতাটা কেবল অমর নয়—যতদূর চেষ্টাহীন ততোধিক প্রাণহীন। কাজেই আমাদের শিক্ষাটা একটি machineএর movement ছাড়া আর বেশি কিছুই নয়।

আমরা একটা enlightenment এর যুগে আলোর রাজ্যে থেকেও চোখ বুজে স্থানুর মতো বসে আছি। এর চেয়ে যে আঁধারে হাতড়ানোও অনেকটা ভালো ছিল। তাতে একটা-কিছু করার, হওয়ার এবং পাওয়ার Energyও hope সর্ব্বদাই তার মধ্যে জেগে থাক্‌ত। একটা নূতনত্বের সঙ্গে নিত্য নিত্য মনে একটা living sensation মানুষ সর্ব্বদাই চেয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে তার গন্ধও আছে কি ? যেখানে কিছু পাওয়া নেই, হওয়া নেই, দেওয়া নেই, সেখানে স্বভাবই যেতে বারণ করে। গড্ডলিকার মতো গা ঢেলে দেওয়া তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

আমাদের ইতিহাস শিক্ষাটা হচ্ছে গতানুগতিক। প্রায়ই পরোক্ষীরিত গলাধঃকরণ। দু'চার জন যাঁরা উচ্ছিষ্টে সন্তুষ্ট নন, তাঁরা নুন-মসলা ছাড়া, আধ-সিদ্ধ আধ-কাঁচা raw materialটাই গিলে বসেছেন, আর বদহজমের অম্লময় উদ্গার দিচ্ছেন। কাজেই যে-শিক্ষার্থী এ-কে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে, সে আর এর ধারে-কাছেও আস্‌তে নারাজ।

শিক্ষক-বিভ্রাটঃ—এ-গুলো[illegible]ল ভিতরের কারণ। এ-ছাড়া আর কতকগুলি বাহ্য কারণও আছে। এখানে একটু খোলাখুলি ভাবেই বল্‌তে হবে। যেহেতু ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যর্থতার অব্যবহিত কারণগুলো শিক্ষকগণেরই ব্যর্থতার—অযোগ্যতার ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইতিহাস অধ্যয়নটা পারতপক্ষে ছাত্রেরা ভালোবাসে না কেন ? এমন শিক্ষক কমই আছেন যাঁরা নিজেরাই ইতিহাসের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বাস্তবিকই ভালোবাসেন। University ও Departmentএর ঘানিগাছে syllabus ও text books তিল সর্ষপ দিয়ে মাষ্টার মশায়ের duty হচ্ছে বেত্র-বকুনি-ফাইন দিয়ে ছাত্রদিগকে তার চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজ আদায় করে নেওয়া, অর্থাৎ to make them passable. ইতিহাস অধ্যাপনা বলে যে একটা-কিছু এদেশে আছে, এটা হচ্ছে তার "তৈলচিত্র"। এককথায় শিক্ষকগণ হচ্ছেন শিক্ষা-বিভাগের Infant prison এর warder. Barnard Shaw "The book-man" নামক বিলাতী সাময়িক পত্রিকায় লিখেছেন :—

School-masters are those who masquerade as such but do not teach. They set lessons and beat or otherwise torture children who do not learn them. School-masters may be and often are, callous ruffians, as cruel as they are lazy and incompetent. At least their work is no more skilled work than those of a prison warder. If they were police constables they would be unable to take the beats which require sense and tact. Such are fit for nothing better than the assertion of bruteforce and the maintenance of the crude terrors of the law. It is such school-masters who convert shools into mere prison houses where children are backed to keep them from worying their parents.

শিক্ষার দিক দিয়ে দেখতে গেলে অনেকেই শিক্ষক নন।

চাকর, মজুর, ইজিপ্সিয়ান টাস্ক-মাষ্টার বা অমনি একটা-কিছু। শিক্ষকদিগের উপর Shaw সাহেবের এই হিংস্র আক্রমণটা অবশ্য নিতান্তই মেনে নেবার নয়। বিশেষত আমাদের দেশের শিক্ষকদিগের পক্ষে বলবার অনেক কথা আছে। যাঁরা শিক্ষকদের উপরওয়ালা, তাঁরা শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষকত্ব অপেক্ষা দাসত্বের blind submission এবং পুলিশত্বের crueltyটাই বেশি চান। বিশেষত এটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের এবং যোগাড়ের যুগ; honest work আর merit appreciate করতে পারেন, এমন authority কমই আছে। কাজেই মাষ্টার মশায়রা honest workটাই বাদ দিয়ে কর্ম্মের ঠাটটা কোনোরূপে বজায় রেখে ব্যক্তিগত স্বার্থটা বেতনরূপে বাড়িয়ে নেবার যোগাড় বা যা করলে হয় তাতেই মনযোগ দেন। আর যাঁরা back doorটা পছন্দ করেন না, তাঁরাও rewardএর পৌণে ষোলো আনা minus hope দেখে দিনই গণে যান। গীতার "···মা ফলেষু কদাচন" মনে করে কাজ করার লোকের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। শিক্ষকদের chronic unsuccessএর কারণের বিস্তারিত আলোচনা করতে হ'লে প্রবন্ধটা দীর্ঘ হয়ে পড়ে, সুতরাং বিরত হলুম।

ভাষা-বিভ্রাট :—এখন আমাদের শিক্ষার ভাষা বা শিক্ষার ভাষায় যাকে medium of instruction বলে তার কথা কিছু বল্‌বো। কোনো দেশেই একটি ব্যাপক শিক্ষার জন্য বিজাতীয় ভাষার স্থায়ী আবশ্যকতা থাক্‌তে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে পরদেশী রাষ্ট্রীয় শাসনের সঙ্গে পরভাষার শাসনটাও যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসে আছে। প্রথমত ইংরেজী ভাষাটা আমাদের ব্যাধিগ্রস্ত শিক্ষাদেহে ঔষধরূপেই প্রবর্ত্তিত করা হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে তা এখন পথ্যের স্থানটাই দখল করেছে বিশেষভাবে। আমাদের খোকারা মাতৃভাষার মিঠে বুলি শিখতে-না-শিখতেই ইংরেজী বর্ণবিন্যাস ও ইংরেজী ভাষার বিকট শব্দাবলী গলদ্‌-ঘর্ম্মকলেবরে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে পরভাষায় জ্ঞানলাভ-জন্য গুরুতর চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। সেই দৃশ্য দেখে মনে হয়, যেন ছেলেরা তাদের কোমল দাঁতে বিলাতী সমুদ্রতীরের granite পাহাড়ের পাথর-নুড়ি চিবুচ্ছে। তাই এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রসাস্বাদনের পূর্ব্বেই তাদের দাঁত ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে। বাংলার অপ্রাপ্তবয়স্কা কুলবধু-প্রসূতিদের মতো বাংলার খোকারাও অস্বাভাবিক পরিশ্রমে অকালে শারীরিক ও মানসিক বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সখ্যতা করতে বাধ্য হয়।

হায়, এমনি করে জ্ঞানের দুর্গে ঢুকতে গিয়ে কত মেধা ও মনীষা যে ইংরেজী ভাষার দুর্গতোরণের সুদৃঢ় লৌহ কপাটে মাথা ফাটিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখারও একটি লোক নেই! বিদেশী ভাষার নিকট আমাদের এই মানসিক দাসত্বই অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় "বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার," কোট-প্যান্ট পরিহিত বাঙালী বাবু-সাহেবের ন্যায় এই বিদেশী ভাষায় আচরিত আমাদের স্বদেশী কাহিনীটাও আমাদের অনুভূতি ও অন্তরঙ্গতা স্পর্শ করতে পারে না। চিনির লাড়ুর উপর কুইনাইনের আবরণ থাকায় আমাদের রসনা মিষ্টতা অনুভূতিলাভ করার পূর্ব্বে তিক্ততার তীব্রতার আস্বাদ পেয়ে চিনির প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে।

পুস্তক-বিভ্রাট :—বাংলার গল্প-সাহিত্যে এখনো ইতিহাস স্থান পায় নি। সেখানে শুধু রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে রূপোর কাঠিতে মেরে সোনার কাঠিতে বাঁচানো হচ্ছে। ইতিহাসের কাহিনী বালক-বালিকাদের মনের মতো ছাঁচে ঢেলে তাদের কাছে উপস্থিত করা হয় না। ইংরেজী শিশু সাহিত্যে Nelson's High Roads of History প্রভৃতি মনোরম চিত্রশোভিত অনেক শিশুপাঠ্য পুস্তক আছে। যে-সকল পুস্তকের কেবল ছবির পাতাগুলি দেখেই বালক-বালিকারা ঐ-সকল চিত্রে চিত্রিত ব্যক্তি ও ঘটনানিচয়ের সম্বন্ধে একটা curiosity। ছেলেবেলাতেই মনের মধ্যে বসে যায় এবং যত বড় হয় ততই সে-সব বিষয় আরো ভালো করে জানতে চেষ্টা করে, Lytton, Scott, Shakespeare প্রভৃতি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার সাহিত্যের পোষাকে ইতিহাসকে এনে বৈঠকী দরবারে হাজির করেছেন। তাঁরা নিজেরা সবসময়ে ঠিক সত্য কথাটি না বল্‌লেও সত্য জানবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা লোকের মনে জাগিয়ে দিয়েছেন। তার প্রমাণ ঐসব গ্রন্থকারের Scholarly annotationএর মধ্যে পাবেন। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর গ্রন্থকারের বড়ই অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের তথা-কথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক

grounding নিতান্তই ঝাপ্‌সা। 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি নবীনচন্দ্র perverted. বর্ত্তমানে বঙ্গের খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস 'পাষাণের কথা', 'ধর্ম্মপাল' ও 'শশাঙ্ক' প্রভৃতিতে হাত মক্স করছেন মাত্র। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইতিহাসের দু'চারটি পাতায় সাহিত্যের রং ফলিয়ে কিছু কাজ করে গেছেন। তবে বিশেষভাবে কিছু করে গেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। এই কয়জনকে বাদ দিলে আমাদের সাহিত্যিকগণ অনেকেই নভেলের আদিরসে মস্‌গুল হ'য়ে আছেন। কারণ ওটাতে study ও preparation তেমন প্রয়োজন হয় না। কোনো প্রকারে নকলে-বিকলে স্ত্রীপুরুষের একটা romantic...... গড়ে তুল্‌তে পারলেই হ'ল। তাই বাংলার গল্প-সাহিত্যটা একেবারে একঘেয়ে দেখ্‌তে পাই। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জীবনও একঘেয়েই রইল। তার প্রমাণ কলকাতার যে-কোনো messএ গিয়ে মেম্বারদের সঙ্গে দু'চার দিন মিলে-মিশে থাক্‌লেই বেশ বুঝতে পারা যায়। আর বুঝ্‌তে পারা যায় সন্ধ্যায় নদী-তীরে অথবা অপরাহ্নে খেলার মাঠের কোণে কোনো-একটি solitary groupএর গোপন কথাটি যদি কান-পেতে শুন্‌তে পারা যায়।

শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা গ্রন্থকার হবার দুরাশা পোষণ করেন, তাঁরা কোনোপ্রকারে translation, compilation.........প্রভৃতির দ্বারা যা-হোক্ কিছু-একটা দাঁড় করিয়ে তার ওপর "Aproved by the text book committee..." ইত্যাদি বসিয়ে দিতে পারলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। তার পর এসব Aproved by the text book commiteeর দল পঙ্গপালের মতো ডিসেম্বর মাসে বেরিয়ে পড়েন। ছাত্রদের মস্তক ভক্ষণের প্রতিযোগীতা চল্‌তে থাকে। গ্রন্থকার শিক্ষকগণ mutual arrangement, অনুরোধ উপরোধ, recommendations...প্রভৃতির deplomacyতে ইস্কুলের পাঠ্য-তালিকায় যে-ভাবে বইএর নাম তুলতে সাধনা করেন ও সিদ্ধ হন, তা অল্প-বিস্তর অনেকেই জানেন। অবশ্য এই স্থানে এবং এই পাত্রে "অভাবে স্বভাব নষ্ট" কথাটিও মনে রাখ্‌তে হবে। আর মনে রাখা দরকার সেই বিখ্যাত ইংরেজী প্রবাদ-বাক্যটি—"It is easy to be honest on £ 1000 a year". পাঠ্য-পুস্তকের বাজারের তো এই অবস্থা।

তারপর আমাদের পড়াবারও কোনো-একটা সঙ্গত নিয়ম (scheme) নেই। এখন যা আছে তা class III হ'তে class X পর্য্যন্ত মাথা থেকে লেজ আবার লেজ থেকে মাথায় চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। সেই শাক্যসিংহ, সেই চন্দ্রগুপ্ত, সেই সুলতান মামুদ বা গজনির মামুদের প্রেতাত্মা আর তাদের B. C. এবং A. D.র ভূত-পেত্নীদের নিয়ে ছাত্র-জীবনের প্রত্যেকটা বৎসরের উপর মাষ্টার মশাইএর বেত্র-খণ্ড একটা দুঃস্বপ্নেরই সৃষ্টি করছেন। কাজেই ইতিহাস বিষয়টা যে একটা study of choice, study of love হ'তে পারেনি, তাতে বিস্মিত হওয়াটাই আশ্চর্য্য।

ইতিহাস শিক্ষার failureএর সাতটি প্রধান কারণ আমরা অনুভব করেছি।—

প্রথম ও প্রধান :—University ও department এর উপযুক্ত লক্ষ্য নেই।

২য়—উপযুক্ত গবেষণা ও অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কারের অভাব।

৩য়—মুদ্রিত পুস্তকের অন্ধ অনুসরণ।

৪র্থ—শিক্ষকদের Interest এর অভাব এবং তাঁদের steriotyped শিক্ষানীতি।

৫ম—বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান।

৬ষ্ঠ—ইতিহাসকে সুপরিচিত করবার অভিপ্রায়ে ঔপন্যাসিক প্রভৃতি লেখকগণের চেষ্টার অভাব।

৭ম—শিক্ষানীতির systemএর দোষ।

এখন হয়ত অনেকে বলবেন,—এটা নয়, ওটা নয়, এত হল distructive criticism; কিন্তু কি কর্‌লে যে যেটা হচ্চে না সেটা হবে সে-কথাটা কেউ বল্‌বে কি? এই কথার উত্তরে আমরা একটি constructive scheme সাধারণের দরবারে পেশ কোরবো, যেটা কয়েকজন শিক্ষক কয়েকটি ইস্কুলে প্রবর্ত্তিত করেছেন। যদিও উপযুক্ত studious, interested শিক্ষক এবং উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তকের অভাবে তাঁদের অনেকটা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, তথাপি তাঁরা যা ফল পেয়েছেন, তাতে তাঁরা নিরাশ হন নি। 'কুশদহ'র পাঠকদের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষা-বৈজ্ঞানিক আছেন; এই schemeটা বাস্তবিক ব্যবহারোপযোগী ও বর্ত্তমান পঠন-পাঠন-রীতি

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা এবং ছাত্রদের interest create করতে পারবে কি না তা তাঁরা বিবেচনা করে দেখ্‌বেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা refined হ'য়ে এমন একটা scheme যদি next session থেকে কাজে দাঁড়ায় তা হ'লে ভবিষ্যৎ শিক্ষার যে একটা পরম উপকার হয়, তা অস্বীকার করা যায় না। তা হ'লেই আমাদের পূর্ব্ব-কথিত ইতিহাস শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের মানসিক বিরুদ্ধভাব দূরীকরণের একটি উপায় হয়।

Scheme

শ্রেণী	বিষয়	পাঠ্য পুস্তক
III	হিন্দু ও মুসলমান পৌরাণিক সাহিত্যের গল্প।	উপেন্দ্র বাবুর ছেলেদের রামায়ণ ও মহাভারত। এবং ঐ-ভাবে রচিত ইস্‌লাম কাহিনী।
IV	অধীত বিষয়ের আলোচনা। গল্পের ভাষায় লিখিত একখণ্ড ইতিহাস।	খগেন্দ্র বাবুর "প্রথম শিক্ষা ভারত-ইতিহাস", অথবা ভট্টশালী ও আচার্য্যের "ভারত-কথা"।
V	অধীত বিষয়ের আলোচনা। পূর্ব্ব শ্রেণীর বইএর অপঠিত অংশ পঠন, য়ুরোপ ও রাজপুতনার ইতিহাসের বীরগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	পূর্ব্ব শ্রেণীর বই,—Creighton's Heroes of European History, Marsden's Heroes of Indian History এবং One Syllable Stories about Mewar এর মতো বই। (more easy and improved).
VI	হিন্দু ও মুসলমান যুগের ইতিহাসের আলোচনা। ঐ ঐ যুগের দেশের বিবরণের বিশেষ আলোচনা। ইংরেজ রাজত্বের সাধারণ আলোচনা। (সংক্ষেপ)	ভারত-ইতিহাস by M.N. Basu এবং class V এর মতো একটা additional Historical English text.
VII & VIII	সরল ইংরেজী ভাষায় লিখিত বহু চিত্রশোভিত একটি ভারত-ইতিহাসের বই। হিন্দু হ'তে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত। তারিখ সনের প্রয়োজন নাই। বইটি Little Arther's History of England এর নক্সায় রচিত হলেই ভালো হয়।	Junior History of India by E.Marsden. আরো কেটে ছেঁটে নিলে ভালো হয়।
IX & X	Matriculation Syllabus অনুযায়ী যে-কোনো পুস্তকের সহিত দৈনিক পড়ার সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজী ও বাংলা বড় বড় ঐতিহাসিক গ্রন্থ, নাটক, কবিতা, সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রভৃতির দিকে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। Historical Literature পড়্‌তে যাতে ছাত্রদের মনে বিশেষ আগ্রহ জন্মে তার চেষ্টা প্রধান ভাবে থাকবে।	* * *

আগমনী

(গান)

এই তো বুঝি চরণ-রেখা
শিউলী-ঝরা দূর্ব্বাদলে !
এই বুঝি মার স্নেহের আঁখি
মেদুর হ'ল গগনতলে !
এই বুঝি গো আঁচল রাজে
ধানের ক্ষেতের শ্যামল সাজে !
দুকূল ছেপে স্তন্যধারা
উথ্‌লে ওঠে নদীর জলে !
আয় মা আবার বরষ-পরে
অশ্রুঝরা আঁধার ঘরে !

কে মিটাবে বারের মত
স্নেহের তৃষা হিয়ার তলে ?
কোথায় শ্যামা বঙ্গভূমি
'ধনধান্যপুষ্পভরা' ?
কোথায় নিবিড় শান্তি ও মা !
মোহন হাসি ভুবনহরা ?
অন্নহীনের কাঁদন-মাঝে
অন্নদা, তোর বোধন বাজে ;
হাহাকারে বন্দনা মা,
অর্ঘ্য এবার নয়ন-জলে !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম্‌-এ ।

স্বরলিপি

(মল্লার—একতাল।)

আস্থায়ী

• ১ ২´ ৩
II { সন্‌। সা রা । মা -া পা I ধা ণা ণা । ধর্সা -ণধা পা ।
এ• ই তো বু • ঝি চ র ণ রে• •• খা

• ১ ২´ ৩
। ঋা পা মা । গমা -গা ঋা I সা -ঋঋা মগঋা । ঋা -মমা -ঋা ।
শি উ লী ঝ• • রা দূ র্ব্বা দ•• লে •• •

• ১ ২´ ৩
। না না নধা । নর্সা র্সা -া I নর্সা র্সা -া । না -র্সর্ঋা র্সা ।
এ ই বু• ঝি• মা র্ মে হে র্ আঁ •• খি

• ১ ২´ ৩
। ঋা পা -মা । মা গা -মঋা I সা ঋমা -মা । পমগা ঋগঋা -গঋসা } II
মে দু র্ হ ল •• গ গ• ন্ ত•• লে•• •••

অন্তরা

• ১ ২´ ৩
II { মপা পা না । না -া মর্সা I না র্সা -া । না -ঋা র্সা ।
এ• ই বু ঝি • গো• আ চ ল্ রা • জে

০ ১ ২ ৩
। র্সা র্ণা -া । ধা ণা পা I মমা পধা -ধা । মা -গরা রা ।
ধা নে০ র্ কে তে র্ শ্যা ম০ ল্ সা ০০ জে

০ ১ ২´ ৩
। র্রা র্রা -া । র্মা -গর্রা র্পা I র্মর্গা র্মা -া । র্রা -র্গা নর্সা ।
হু কূ ল্ ছে ০০ পে স্ত স্থ ০ ধা ০ রা০

০ ১ ২´ ৩
। র্সাঃ -ঃ র্রা । র্সা -ণা ধণপা I মা মপধা ধপা । রপা -মগা রমগরা } II
উ ৎ লে ও ০ ঠে০০ ন দী০০ র০ জ০ ০০ লে০০০

সঞ্চারী

০ ১ ২´ ৩
II { সন্া -সা ধা । পধণা ণা -ধা I পা মপা -ধা । পা -ধা মগরা ।
আ০ য় মা আ০০ বা র্ ব র০ ষ্ প ০ রে০০

০ ১ ২´ ৩
। সা ণা -া । ধা ণা -পা I মা মপা -ধধা । পা মা -গরা ।
অ শ্রু ০ ঝ রা ০ আঁ ধা০ ০র্ ঘ রে ০০

০ ১ ২´ ৩
। ররা রা পা । -মপা পা -া I মা গমা -া । রা -া ন্সা ।
কে০ মি টা ০০ বে ০ মা য়ে০ র্ ম ০ ত০

০ ১ ২´ ৩
। সসা রা -া । মা -গমা পা I ধা র্সা -ধণণা । ধণা পা -মপা } ।
স্নে হে র্ তৃ ০০ ষা হি য়া ০০র্ ত০ লে ০০

০ ১ ২´ ৩
। { র্সা ণা -া । ধা -ণা পা I মা -পা পা । নর্সা -র্রমা র্সা ।
কো থা য় শ্যা ০ মা ব ঙ্ গ ভূ০ ০মি ০

০ ১ ২´ ৩
। র্রা -া র্রা । র্মা -র্গর্মা র্মা I র্রা -র্রর্রা -া । নর্সা র্সা -নর্সা ।
"ধ ০ ন ধা ০০ ন্য পু ষ্প ০ ভ০ রা ০০"

০ ১ ২´ ৩
। র্সা নর্সা -া । র্সা র্ণা -া I ধা -র্সা ণা । ধা -ণা পা ।
কো থা০ য় নি বি০ ড় শা ন্ তি ও ০ মা

```
  •              ১                 ২´                      ৩
। সা     রা    -া । মা    পা    ধর্সা I ণা    -ধা    -ণা । ধমা    পমা   -গমা } I
 মো      হ     ন্ হা     সি     ভূ•    ব     •     ন্ হ•     রা•     ••
```

আভোগ

```
  •              ১                 ২´                      ৩
। { মা   -পপা   -মপা । নর্সা   নর্সা   -া I র্রা   নর্সা   -া । র্সা   -া   নর্সা ।
  অ      ন্ন    •• হী•     নে•     র্ কাঁ    দ•     ন্ মা     •    যে•

  •              ১                 ২´                      ৩
। র্সা   -ণণা   ধণা । া     -পা    -া I মা    পর্রা   -া । র্রা   -র্মর্মা   র্রা ।
  অ      ন্ন    দা• •      তো     র্ বো     ধ•     ন্ বা     ••      জে

  •              ১                 ২´                      ৩
। না     নর্সা   -া । র্সা   -নর্সা   র্সা I র্রা   -নর্সা   ণা । ধা   -ণা   -পা ।
  হা     হা•    • কা      ••      রে ব     ন্দ     না মা     •     •

  •              ১                 ২´                      ৩
। রা     -পা    পা । মা    গমা    মরা I সা    রা     -া । মগা   -মগা   ররা } II II
  অ      র্     ঘ্য এ     বা•     র• ন     য়     ন্ জ•     ••     লে•
```

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

তর্পণ

এই যে দুদিন আগে ছিলে গো ধরায়,
আজ তুমি কোথা হায় চির স্নেহময় ?
এত প্রেম সত্যনিষ্ঠা গেল চিরতরে!
প্রকৃতি রাখিল কোথা লুকা'য়ে তোমারে!
শোকদীর্ণ ভগ্ন হৃদে শুধু হা হুতাশে
জ্বলিতে থাকিব কি গো দগ্ধ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে ?
"না, না, তাহা হইবে না," কে দ্যায় আশ্বাস,
মৃত্যু-মাঝে অমৃতের হয় পূর্ব্বাভাস।
বিভুপদে চিত্ত রাখি' দিব্য দৃষ্টি খুলে,
আছ তুমি পরপারে জ্যোতিতে উজলে।
জীবনেতে ফুটেছিলে ব্রহ্মানন্দ-ধ্যানে,
সত্য ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলে ধরাধামে,
ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে পূর্ণ নীরব সাধক,
ধরা হ'তে গেছ চলে' সত্যের সেবক।
আজি যে বিদেহী আত্মা অনন্তে মজিয়া
ন্যায়ে সত্যে প্রেমে ধর্ম্মে রয়েছ ফুটিয়া!
শোক-অশ্রু মুছি তবে, অমৃত-সন্তান
মৃত্যু-মাঝে অমৃতের দিলে যে সন্ধান।

২৯ শে ভাদ্র, ১৩২৮ — শ্রীলীলাবতী মিত্র।

ভোজের আয়োজন

আমরা অনেকেই ভোজে যোগ দিয়াছি, কিন্তু অতি অল্পমাত্র ভোজেই সুশৃঙ্খলা দেখিয়াছি। কেবল অর্থ দ্বারাই যে ভোজের সুব্যবস্থা হয়, তাহা নহে। কারণ ক্রোড়পতির গৃহেও বিশৃঙ্খলা দেখিয়াছি।

পুত্রকন্যার বিবাহ, পিতামাতার শ্রাদ্ধ বা অন্য কোনো শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান-উপলক্ষ্যে আমরা আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিয়া থাকি। পবিত্র আনন্দ প্রদান ও সম্ভোগই ভোজের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহারা কখন ভোজ দিয়াছেন বা ভোজে যোগদান করিয়াছেন, তাহারাই জানেন উদরের আনন্দ ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে কষ্ট অনুভব করিয়াছেন। কলিকাতার ন্যায় বড় বড় নগরে এখন স্থানাভাব এত লোক নিমন্ত্রিত হয় যে সকলের বসিবার স্থান থাকে না—এমন কি দাঁড়াইবারও স্থান থাকে না; একস্থানে একভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকা কিরূপ কষ্টকর তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন—চিত্তরঞ্জনের জন্য পত্র-পুষ্প-পতাকা, ছবি, সঙ্গীত বাদ্য, হাস্য-কৌতুকের বন্দোবস্ত অল্পসংখ্যক লোকেই করিয়া থাকেন। যখন আহারের

আহ্বান আসে, তখন বলিষ্ঠ লোকেরা শিশু-বৃদ্ধদিগকে ঠেলিয়া অগ্রে স্থান দখল করিয়া থাকেন। অধিকাংশ শিশু ও বালকবালিকারা সন্ধ্যার কিছু পরে ভোজন করিয়া থাকে। তাহারা নিমন্ত্রণ-বাটীতে গিয়া জঠর-জ্বালায় কষ্ট পাইতে থাকে, ইহা অভিভাবকগণও স্বীকার করিবেন। আহার করিতে বসিয়া পরিবেষণের শৃঙ্খলার অভাব বশত একই গৃহে স্থানে স্থানে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় ভোজন শেষ করিতে হয়। বাহুল্য-ভয়ে সকল অসুবিধার কথা উল্লেখ করিলাম না। তবে সেইসব অসুবিধা দূর করিবার জন্য যে-উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। ভোজদাতা ধনী হউন বা নির্ধন হউন সকলেই ইহা পরীক্ষা করিতে পারেন।

প্রথমত যে-অনুষ্ঠান-উপলক্ষ্যে ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্রেরই যোগ দেওয়া উচিত। কোনো কোনো বিবাহ-বাটীতে বিবাহের পূর্ব্বেই অধিকাংশ লোক আহার সমাপন করিয়া থাকেন। যাহার জন্য ভোজ, তাহাকেই (বর বা কন্যাকে) দেখিলাম না, তাহার নাম, গুণাগুণ জানিলাম না অথচ ভোজে যোগ দিলাম। কোনো নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বলিতে পারেন, বর বা কন্যাকে দেখিতে গেলেই যৌতুক দিতে হইবে। যৌতুক দিবার প্রথা থাকাতে অনেকের কষ্ট হইতেছে; কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে যৌতুক দিবার প্রথা হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ করিতে হইলে অর্থব্যয়ের আবশ্যকতা নাই। স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনই এই প্রথার উদ্দেশ্য। কেহ-বা একটি সুন্দর পুষ্প, কেহ-বা মধুর ফল, কেহ-বা স্নেহ-পূর্ণ উপদেশ দিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারেন। শ্রাদ্ধ-বাটীতেও পরলোকগত আত্মার জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হওয়া উচিত; কারণ যাঁহার স্মৃতিকে সম্মানিত করিবার জন্য নিমন্ত্রিতেরা সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি জানিতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত।

সাধারণত সন্ধ্যার পর ভোজ দেওয়া হয়। নিমন্ত্রিতেরা কোন সময়ে আসিবে তাহা নির্দ্ধারিত হয় না, তজ্জন্য সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত ভোজ চলিতে থাকে। ইহাতে গৃহস্বামীর পরিবারবর্গ, পরিবেষণকারীগণ সকল পক্ষেরই কষ্ট পাইতে হয়। প্রশস্ত বাটীতে মাত্র ৫০জন লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াও এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিয়াছি। যদি লোকসংখ্যা কম হয়, তাহা হইলে একই সময়ে সকলকে আসিতে বলিতে পারা যায়। লোকসংখ্যা অধিক হইলে, দুইটি বা তিনটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। ধরুন্ যদি ৩০০ লোকের নিমন্ত্রণ হয় এবং একশতের অধিক লোককে বসিবার ও একসঙ্গে ভোজন করাইবার স্থান না থাকে, তবে গ্রীষ্মকালে রাত্রি ৭॥০, ৮॥০ ও ৯॥০ এই তিনটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া, একশত লোককে ৭॥০ টায় দ্বিতীয় একশত লোককে ৮॥০ টায় এবং অবশিষ্ট লোককে ৯॥০ টায় আসিতে বলিতে পারি। ইহাতে সকলপক্ষেই সুবিধা হয়—আহারের জন্য অভ্যাগতগণকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না। আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকাতে অভ্যাগতগণকে জঠরানলে দগ্ধ হইতে হয় না। যদি এইরূপভাবে সময় নির্দ্দিষ্ট করা অসম্ভব হয়, আমরা গ্রীষ্মকালে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিতগণকে আসিতে বলিতে পারি। অধিক লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া স্থানাভাব বশত কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হ্রাস করা সমীচীন, কারণ আনন্দদানই ভোজ দিবার উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত—গৃহকর্ত্তা নিজে কোনো কাজ স্বহস্তে না করিয়া, বিশ্বস্ত লোকের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার অর্পণ করিলে সুশৃঙ্খলার আশা করা যায়। এইজন্য গৃহকর্ত্তাকে স্বয়ং চিন্তা করিতে এবং বিজ্ঞ বহুদর্শী লোকের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। কার্য্য-বণ্টনই গৃহকর্ত্তার বিশেষ কর্ত্তব্য, উপযুক্ত লোকের সন্ধান করিয়া পূর্ব্বেই তাহার উপর নির্দ্দিষ্ট কাজের ভার দিতে হইবে।

(১) যে-অনুষ্ঠানের জন্য ভোজ দেওয়া হইতেছে, তাহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি লোক (নিকট আত্মীয় হইলে ভাল হয়) নিযুক্ত করিতে হইবে। (২) যে-যে স্থানে পুরুষ ও মহিলারা বসিবে তাহা পরিষ্কৃত, সুসজ্জিত ও চিত্তরঞ্জক হওয়া আবশ্যক, ইহার জন্য একজন লোকের উপর ভার থাকিবে এবং কয়েকজন সহকারীও আবশ্যক। (৩) অভ্যর্থনা করিবার জন্য গৃহদ্বারে একজন প্রেমিক পুরুষ থাকিবেন যিনি ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ২।৪টি মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পর আরো কিছুক্ষণ তথায় থাকিবেন। এইরূপ আর একটি বয়স্কা মহিলা নারীদের

অভ্যর্থনা করিবেন এবং তাঁহার সহযোগিনীগণ পথ দেখাইয়া দিবে। অভ্যর্থনাকারীর সহকারীগণের পুষ্প, সুগন্ধি জল বা পান বিতরণ করা বিশেষ আবশ্যক এবং সভাস্থলে কাহারো কোনোরূপ অসুবিধা হইয়াছে কিনা সহকারীগণ সর্ব্বদা সেবিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। এরূপ দেখিয়াছি, বিলম্ব হওয়াতে কোনো শিশু কাঁদিতেছে, কারণ অনুসন্ধান করাতে জানিলাম সে ক্ষুধায় কাতর, তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য কিছু খাদ্য আনয়ন করা আবশ্যক। (৫) নিমন্ত্রিতগণের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত, বাদ্য, হাস্যকৌতুক, ম্যাজিক, কোনো সৎ বিষয়ের সমালোচনা প্রভৃতির বন্দোবস্ত কিছু চেষ্টা করিলেই করা যাইতে পারে। সেইজন্য কোনো লোকের উপর ভার দিতে হইবে।

মহিলাদিগকে আনাইবার জন্য একটি লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। যিনি অপরাহ্ণে যথাসময়ে আসিয়া প্রত্যেক নিমন্ত্রিতার বাটীতে গাড়ী পাঠাইবেন এবং কাহারা আসিল ও কাহারা ভোজনান্তে গৃহে ফিরিয়া গেল তাহার হিসাব রাখিবেন। গাড়ীভাড়া বা রেলভাড়া তিনিই দিবেন। (৬) পরিবেষণের জন্য একজন দক্ষ লোককে দায়ী করিয়া তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে কাজ করিবার জন্য কয়েক জনকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। যজ্ঞবাটীতে যথাসময়ে বহুলোককে পাওয়া যায় যাঁহারা পরিবেষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ভার না দেওয়াতে কেহ শেষ পর্য্যন্ত থাকেন না। ভাণ্ডার-গৃহে একটি ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা ঝুলাইয়া রাখা উচিত, তাহা দেখিয়া নবাগত পরিবেষণকারী ও পরিদর্শক-গণের কাজের সুবিধা হইবে। পরিদর্শকগণ ভোজনের সময় পরিবেষণকারীদের ভ্রম বা ত্রুটি দেখাইয়া দিবেন। একই জিনিষ একস্থানে বহুবার আসিতেছে, অন্যত্র কিন্তু মোটেই সে-জিনিষ যায় নাই—সেদিকেও লক্ষ্য রাখিবেন। কোন্ ভোজ্য কি পরিমাণে প্রত্যেককে দিতে হইবে, এবং কি কি দ্রব্য একাধিকবার দিতে পারা যায় এই বিভাগের কর্ত্তা তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরিবেষণকারী ও পরিদর্শক-গণকে বলিয়া দিবেন। সময়ে সময়ে এবিষয়ে যে পরিবর্ত্তন (হ্রাস বা বৃদ্ধি) করা হইবে তাহাও তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন। নিমন্ত্রিত লোকগণের অনুমেয় মোট সংখ্যার প্রত্যেক বারে কত লোকে খাইতেছে; প্রত্যেক ভোজ্য কত মজুৎ আছে ইত্যাদি বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী লক্ষ্য রাখিবেন। এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিশেষত তরকারীর অভাব অনুভব করিবার পূর্ব্বেই প্রস্তুত করাইয়া লইবেন বা বাজার হইতে খরিদ করিবার আদেশ করিবেন—এই কাজটি বড় কঠিন, অভিজ্ঞ লোক ভিন্ন অন্য কেহ পারিবেন না। কোনো কোনো ভোজে তরকারীর জন্য একঘণ্টা পর্য্যন্ত আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছে।

আহারের জন্য আসন পাত্র প্রভৃতি সাজানো হইলে এই কর্ম্মচারী স্বয়ং বা তাঁহার আদেশে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অভ্যাগতগণকে ডাকিবেন। শিশু, বালকবালিকা ও তাহাদের অভিভাবকগণকে সর্ব্বাগ্রে ডাকিয়া লইয়া পরে (স্থান থাকিলে) অন্যান্য লোককে আহ্বান করা উচিত; যদি একই স্থানে পুরুষ ও মহিলাগণের আহারের বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে মহিলাগণকে সর্ব্বাগ্রে ভোজন করাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ কুমারীরা বালিকা; এবং অন্য রমণীরা অধিকাংশই সন্তানবতী।

পরিবেষণকারী, পরিদর্শক এবং সকল বিভাগের কর্ম্ম-চারী ও সহকারীগণকে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে জলযোগ করানো ভাল, কারণ কাজের চাপে তাহাদের আহার করিতে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে এবং লজ্জাবশত তাহারা যাচিয়া মিষ্টান্ন চাহিতে পারেন না। এই কাজের জন্য একজন প্রৌঢ়া মহিলা বা পরিণতবয়স্ক পুরুষ নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।

এই ভোজ-উপলক্ষ্যে গৃহকর্ত্তার নিকট-আত্মীয়গণ ২।৪ দিন পূর্ব্বে সপরিবারে আসিয়া থাকেন ও ২।১ দিন পরে প্রস্থান করেন। উপরোক্ত মহিলা এই কয়েকদিন প্রত্যহ দুইবেলা শিশু বৃদ্ধ ও রোগীদিগের জন্য দুগ্ধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন এবং অন্যান্য লোকদিগকে জলযোগ করাইবেন। গৃহকর্ত্তা ও গৃহিণী অন্যান্য কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে, তাঁহারা এ-বিষয়ে তেমন মনোযোগ দিতে পারেন না; তাহাতে নবাগত কুটুম্বগণ মনে মনে দুঃখভোগ করিতে থাকেন।

রন্ধনশালার জন্য একজন বহুদর্শী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে। নিমন্ত্রিত লোক-সংখ্যার হিসাব করিয়া কত শাকসবজি ময়দা প্রভৃতি কাঁচা মাল ক্রয় করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তদপেক্ষা কিছু

অধিক পরিমাণে প্রত্যেক দ্রব্য খরিদ করাইতে হইবে। যদি অধিক লোকের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে, লুচি প্রভৃতি এমনভাবে মজুত রাখিতে হইবে যে তাহা শক্ত বা বিস্বাদ হইয়া না যায়। এবং ভোজের সময় কতগুলি পাচক একই সময়ে লুচি প্রভৃতি তৈয়ারী করিবে তাহাও হিসাব করিতে হইবে। রান্না তরকারী ডাল প্রভৃতি একদিনেই পচিয়া যায়, তজ্জন্য অনুমেয় লোকসংখ্যার মতন তরকারী প্রভৃতি তৈয়ার করা উচিত। অতিরিক্ত তরকারী আবশ্যক হইতে পারে, তজ্জন্য আলু প্রভৃতি কাটিয়া ধুইয়া রাখা উচিত; পরিবেষণ-কর্ম্মচারীর ইঙ্গিত পাইবা মাত্র নূতন তরকারী রন্ধন করানো উচিত। এই উভয় বিভাগের কর্ম্মচারীদ্বয়ের মধ্যে নিত্য যোগ থাকা আবশ্যক। ভালরূপে কলাই-করা না হইলে পিতল-কাঁসার পাত্রে তৈল বা ঘৃত এবং তদ্দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য রাখিলে বা রন্ধন করিলে বিষ উৎপন্ন হয়। আজকাল পরিবেষণের সময় পিতলের বাল্‌তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমাদের নিত্য-ব্যবহৃত দস্তা-মণ্ডিত লৌহের বাল্‌তি ব্যবহার করাই শ্রেয়স্কর।

আলু ময়দা প্রভৃতি কাঁচা মাল এবং সন্দেশাদি পাকা মাল খরিদ করিবার এবং ফরমাইজ দিয়া আদায় করিবার জন্য একজন লোক নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক। যখন পবিত্র আনন্দ বিতরণ করাই ভোজ দিবার প্রধান উদ্দেশ্য, তখন জিনিষপত্র খরিদ করিবার সময় টাট্‌কা ও উৎকৃষ্ট দেখিয়া লওয়া উচিত। সস্তায় প্রচুর নিকৃষ্ট জিনিষ অপেক্ষা অল্প উৎকৃষ্ট জিনিষ ভোজন করিলে ভোজদাতার প্রতি সহজেই শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। ভোজ্যের মনোহারিত্বে আমরা গৃহকর্ত্তার হৃদয়ের উদারতা মহত্ত্ব অনুভব করি। এইজন্যই বেতন অধিক দিয়া উৎকৃষ্ট পাচক নিযুক্ত করা আবশ্যক। অনেক রকম ভাল-মন্দ ভোজ্য না দিয়া বরং কয়েকরকম উৎকৃষ্ট সুস্বাদু, মনোহর আহার্য্য দিলে মানব-মন সহজেই মুগ্ধ হয়।

(১০) বাটীর ভিতর ও বাহিরের জলবায়ু যাহাতে সর্ব্বদা পবিত্র থাকে, কোনো স্বাস্থ্য-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। মলমূত্র পরিত্যাগের স্থল পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য একটি মেথরকে নিযুক্ত করিতে হইবে; মহিলাদের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থার আবশ্যক, ইহা ভুলিবেন না।

ইহা বলা বাহুল্য যে, নিমন্ত্রিত লোকের সংখ্যা যত কম হইবে, গৃহকর্ত্তা বা গৃহিণী তত অধিক বিভাগের কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করিতে পারেন।

ব্যয়—শ্রাদ্ধ বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ধনী দরিদ্র সকলেই ভোজ দিয়া থাকেন, তাহাতে অধিকাংশ লোক সাধ্যমত ব্যয় না করিয়া বরং সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়া ঋণ-জালে জড়িত হইয়া থাকেন। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার প্রস্তাব, কংগ্রেস, সামাজিক সমিতি, এবং ব্রাহ্মণ হইতে নমঃশূদ্র পর্য্যন্ত নানা সম্প্রদায়ের সভার অধিবেশনে বৎসরের পর বৎসর উৎসাহের সহিত গৃহীত হইতেছে। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই বলিবেন যে, সমাজের ভয়ে তাঁহারা বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকেন। বড় বড় সামাজিক সভায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও উচ্চ-শিক্ষিত লোকগণ যে-মত প্রকাশ করেন, সেটা কি সমাজের মত নহে? এইসব সভায় কেহই বিরুদ্ধবাদী থাকেন না, অর্থাৎ সকলেই অন্তরে অন্তরে ব্যয়বাহুল্যের বেদনা অনুভব করিয়াছেন এবং তাহা মোচন করিবার জন্য তীব্র ইচ্ছাও জাগিয়াছে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কেহই অগ্রণী হইতে চাহেন না। যিনি গরীব তিনি 'বড়' লোকের দোহাই দেন। এই যুক্তি-চক্রের চাপে আমরা সমাজের মস্তকে দলন করিতেছি এবং নিজেরাই দলিত হইতেছি—আমাদের আর্থিক অবনতি ক্রমশই বাড়িতেছে। ব্যয়সংক্ষেপ করিলে জাতি ও ধর্ম্মনাশের কোনো সম্ভাবনা নাই; তথাপি এ-কার্য্যে আমরা কেন অগ্রসর হইতেছি না? সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়, ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। এই অভয় বাণীর উপর নির্ভর করিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হউন্। ভোজ-উপলক্ষ্যে সাধ্যাতীত ব্যয় দ্বারা ঋণগ্রস্ত হওয়া কি ন্যায়সঙ্গত?—না ধর্ম্মসঙ্গত? যাহার অন্তর আনন্দে পূর্ণ নহে, তিনি কি কখনো অপরকে আনন্দ দিতে পারেন? সাধ্যমত ব্যয় কমাইয়া নিজের অন্তঃকরণ আনন্দ-রসে পরিপূর্ণ করিয়া পরকে আনন্দ বিতরণ করুন্, তবেই ভোজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আনন্দবর্দ্ধক হইবে।

শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ দে এম্-এ
অধ্যাপক
বিদ্যাসাগর কলেজ।

প্রতিধ্বনি

অস্পৃশ্যতা ও মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে সম্প্রতি অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম:—

অস্পৃশ্যতা আমাদের উন্নতির পথে এক প্রবল বাধা, এই বাধা আমাদিগকে প্রাণপণ শক্তিতে অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের অনেকের মনের মধ্যে এই একটা ভাব গুপ্তভাবে আছে যে, অস্পৃশ্যতা রাখিয়াও আমরা স্বরাজ পাইতে পারি। এই ধারণাটার ভিতর যে একটা বিরোধের ভাব রহিয়াছে ইহা তাঁহারা দেখিতেও পান না। স্পৃশ্যদের জন্যও যেমন স্বরাজের প্রয়োজন, "অস্পৃশ্য"দের জন্যও তেমনি প্রয়োজন। নারায়ণভরম্ হইতে একজন লিখিয়াছেন:—"আমাদের এই অঞ্চলে পঞ্চমদিগের প্রতি হিন্দুরা, বিশেষত ব্রাহ্মণরা বিশেষ খারাপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেদিকে ব্রাহ্মণরা বাস করেন তাহাদিগকে সেদিক মাড়াইতেও দেওয়া হয় না। ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে তাহাদিগকে যথেষ্ট দূরে থাকিয়া কথা বলিতে হয়।"

এই সংবাদটির "ব্রাহ্মণ"এর জায়গায় "সাহেব" ও "পঞ্চম"এর জায়গায় "ভারতবাসী" করিয়া পড়িলে কিরূপভাব অন্তরে উদিত হয় একবার ভাবিয়া দেখ তো। এমন অনেক সাহেব আছে যাহারা অনেক ব্রাহ্মণের চাইতে ঢেরগুণ বেশী ভাল, এই কথাও আমি বিশেষভাবেই বিশ্বাস করি। যতদিন জন্মের দোহাই দিয়া আমরা আমাদের কোনো ভাইকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব ততদিন স্বয়ং ভগবানও আমাদিগকে স্বরাজ দিতে পারিবেন না। লোকে বলে, মানুষ তাহার কর্ম্মের জন্যই দায়ী, জন্মের জন্য নহে। কিন্তু আমার কর্ম্ম তো কোনো পাপীকে ঢিল মারিতে বাধ্য করে না। ধর্ম্ম মানুষকে বড় করিবার জন্যই তৈরী হইয়া থাকে, তাহার কর্ম্মের পরিমাণ দ্বারা তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য নহে। নীচকুলে জন্মহেতু কাহাকেও চিরমৃত্যুর কোলে ছাড়িয়া দেওয়া কর্ম্মের মহান আদর্শের ব্যভিচার মাত্র। মৎস্যজীবির কাছে সম্মানের সুযোগ পাইয়া রামচন্দ্র গৌরব বোধ করিয়াছিলেন। যুগে যুগে এদেশের মহাত্মারা হতভাগ্য ভাইদিগকে দারুণ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। আধুনিক হিন্দুরা কি তাদের দেশের মহাত্মাদের আদর্শ অনুসরণ করিবেন না এবং যাহা হিন্দুত্বকে এমনি করিয়া কলুষিত করিয়াছে সেই অস্পৃশ্যতারূপ কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া ফেলিবেন না?

(স্বরাজ) ("ইয়ং ইণ্ডিয়া"—স্বাঃ, এম, কে, গান্ধী)

বঙ্গের জনসংখ্যা

১৯১১ অব্দের লোক-গণনায় বঙ্গের জনসংখ্যা শতকরা ৮ বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরোত্তর বঙ্গের স্বাস্থ্য এমন অপকৃষ্ট হইয়াছে, ম্যালেরিয়া বিসূচিকা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে ১৯২১ সালের গণনায় বঙ্গের লোকসংখ্যা শতকরা ২·৭ মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯১১ সালে বঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল—৪,৬৩,০৫,১৭০। ১৯২১ সালে লোকসংখ্যা হইয়াছে—৪,৭৫,৪৯,৩৫০ অর্থাৎ ১০ বৎসরে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে—১২, ৪৪, ১৮০। (সঞ্জীবনী)

বিদেশী বস্ত্র-ব্যবহার পাপ কেন

ভারতবর্ষের কার্পাস-বস্ত্রশিল্প যখন ভুবনবিখ্যাত ছিল, তখন বিলাতে প্রচুর পরিমাণে ঐ-বস্ত্র রপ্তানি হওয়ায় বিলাতী বস্ত্রশিল্প প্রায় লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হয়, এবং ইংরাজ তাঁতির বড়ই দুরবস্থা ঘটে। অবস্থা কিরূপ সাংঘাতিক হইয়াছিল এবং তাহা নিবারণকল্পে মরণের পথযাত্রী এক ইংরাজ তাহার দেশবাসীকে কি উপদেশ দিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আমাদের বিশেষরূপ প্রণিধানযোগ্য।

১৭৩৪ সালে Gentleman's Monthly Intelligencer নামক বিলাতী সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

"আজ চুরি অপরাধে মাইকেল কারমতি নামক এক ব্যক্তির ফাঁসি হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে নগদা তাঁতির দল (জনসাধারণের বিদেশী অর্থাৎ ভারতীয় কার্পাস-বস্ত্র ব্যবহারের কু-অভ্যাসের ফলে যাঁহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে) সমবেত হইয়া অপরাধী জল্লাদ ও ফাঁসির মঞ্চ বিদেশী কার্পাস-বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য

ইংরাজদের বুঝানো যে, দেশে বিদেশী (ভারতীয়) কার্পাস-বস্ত্র প্রচলনে মানুষ ফাঁসিতে ঝোলে, বিদেশী বস্ত্র যে ব্যবহার করে, সে প্রকারান্তরে আর কাহারো মৃত্যুর হেতু হয়, অতএব সে জল্লাদের সমতুল্য। বিদেশী কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করা মানে ফাঁসি কাঠকেই আলিঙ্গন করা, কারণ এ-অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে জাতির মৃত্যু অনিবার্য্য। বধ্যভূমিতে অপরাধী এক বক্তৃতা করে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, মরণোন্মুখ পাপীর উক্তি মন দিয়া শুনুন। আমি স্বীকার করছি, অভাবগ্রস্ত হয়ে বহুবিধ গুরু অপরাধ আমি করেছি। মনে আমার সন্দেহ নেই, আমার অন্নাভাবের কারণ অর্থাভাবের কারণ দেশে বিদেশী (ভারতীয়) কার্পাসবস্ত্র প্রচলন-হেতু স্বদেশী পশমী বস্ত্রশিল্পের অধঃপতন।

"হে খৃষ্টানগণ, একবার ভেবে দেখুন। আমার ধারণা বিদেশী (ভারতীয়) তুলার কাপড় ব্যবহার করে স্বদেশী বস্ত্র-শিল্পের প্রসার রোধ করলে আপনাদের দেশকেই আপনারাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত করবেন, এবং তার ফলে আমার মত হতভাগা অপরাধীর দলে দেশ ছেয়ে যাবে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাবধান করচি, এর পরে আমার মত প্রত্যেক অপরাধীর ফাঁসির জন্য আপনারাই দায়ী। যে মানুষ মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে, আপনাদের কাছে তার প্রার্থনার যদি কোনো মূল্য থাকে তো আমি অনুরোধ করছি যে, যে-বিদেশী (ভারতীয়) তুলার কাপড়ে আমার মৃত্যুমঞ্চ আচ্ছাদিত তার ব্যবসা যারা করে, তারা জল্লাদ, তারাই আমার মৃত্যুর কারণ। তাদের কাছ থেকে ও-কাপড় আর কিনবেন না। যা আমাকে দুর্দ্দশা থেকে চৌর্য্যে এবং চৌর্য্য থেকে অকালমৃত্যুতে নিয়ে এসেছে, যদি দেখি আপনারা সেই কাপড়ই পরছেন, তা হলে আমি কবরে শান্তি পাব না। দেশের প্রতি ভদ্রসম্প্রদায়ের মমতা নেই জানি, তবুও তাঁদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে আমি মিনতি করছি, তাঁদের ছেলেপিলে চাকরবাকরকে আর যেন তাঁরা বিদেশী (ভারতীয়) তুলার কাপড় ব্যবহার করতে না দেন। এরপর ও-কাপড় আর কোনো আত্মসম্মানী লোকই পরবে না, পরবে কেবল মেছুনী, কয়েদী, ধড়ীবাজ, বদমায়েস আর সাধারণ জল্লাদ।"

যে ইংরেজের এককালে ভারতীয় বস্ত্র ব্যবহারের প্রতি এত ঘৃণা ছিল যাহার জন্য স্বদেশী বস্ত্রের কলের উন্নতির জন্য শুল্ক আমদানি-শুল্ক স্থাপন দ্বারা ভারতের বস্ত্রশিল্প নষ্ট করিয়াছেন, সেই ইংরেজ এক্ষণে ভারতে বিদেশী কাপড় ব্যবহারে কোনো দোষ দেখেন না। এবং তাহাতে বাধা পড়িলে মহা রুষ্ট হন। (পল্লীবার্ত্তা)।

পেঁপের আঠার উপকারিতা

পেঁপের শ্বেত আঠা নানা রোগের ঔষধ। ইহা কৃমি নষ্ট করে। এক চামচ শ্বেত রস, এক চামচ মধু, উভয়কে উত্তমরূপে মিশাইয়া চারি পাঁচ চামচ গরম জল একটু একটু করিয়া দিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর খাঁটি রেড়ীর তৈল, নেবুর রস বা সির্কার সঙ্গে সেবন করিলে, দুইদিনের মধ্যে সমস্ত কৃমি নষ্ট হইয়া যায়।

পেঁপের ভিতর গোলমরিচের মত যে-বীজ আছে, তাহাতেও পোকা নষ্ট হয়। পেঁপে ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সুরাসারে ফেলিয়া দিলে যে-পরিমাণে বস্তু থিতাইয়া পড়ে, তাহাকে শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া লইলে ব্যবহারোপযোগী পেপ্‌সিন প্রস্তুত হইয়া থাকে ইহা প্লীহা রোগের এক মহৌষধ। ইহার শ্বেত রসে বর্দ্ধিত-আয়তন প্লীহা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ছোট চামচের এক চামচ পাউডার ও সেই পরিমাণ চিনি দিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলে রোগ একেবারে সারিয়া যায়। একটি কাঁচা পেঁপে থেঁতো করিয়া সমস্ত রাত্রি হিমে ফেলিয়া রাখিয়া সকালে লবণের সহিত সেবন করিলে প্লীহা রোগ আরোগ্য হয়।

মাংস সিদ্ধ করিবার সময়ে কয়েক ফোঁটা পেঁপের রস দিলে মাংস শীঘ্রই গলিয়া যায়। কাঁচা পেঁপে মাংসে ফেলিয়া দিলেও কতকটা এই কার্য্যের সাহায্য হয়। মাংস কাটিয়া পেঁপের পাতায় ঢালিয়া রাখিলেও মাংস সহজে সিদ্ধ হইয়া গলিয়া যায়।

কাঁচা পেঁপে কাটিলে যে-শ্বেত রস বাহির হয়, তাহার গুঁড়া আহারান্তে দুগ্ধ বা চিনির সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়। পেঁপে গাছের অভাব নাই। যে-কেহ ইচ্ছা করিলে পেঁপের এই সকল গুণ পরীক্ষা করিতে পারেন। (সময়)

বিবিধ প্রসঙ্গ

নানারকম অসুবিধায় পূজার আগে আর আশ্বিন সংখ্যা কাগজ বার করতে পারা গেল না। এ-সংখ্যা যখন পাঠকদের কাছে পৌছিবে তখন একবৎসরের সঞ্চিত আনন্দ-আবেগের সঙ্গে মহামায়ার আগমনের তিনদিন-ব্যাপী উচ্ছ্বাস কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। কাজেই চোখের জল ফেলেই হোক বা হেসে-খেলেই হোক যিনি যে-ভাবে এই আনন্দের দিন ক'টা কাটিয়েছেন তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন ও বিজয়ার যথোপযোগী সম্ভাষণ আমাদের এক সঙ্গেই সারতে হচ্ছে।

বিজয়ার দিন যে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করা হয় ইহা যদি দেশের বর্ত্তমান সময়েও কেবল মাত্র একটা বাহ্যিক লৌকিক ব্যাপার হয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। কিন্তু সমাজের মধ্যে এই প্রথাটার ভিতরের ভাব গ্রহণ করা এখন একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। না হলে বৃথাই মায়ের বোধন করে তাঁকে আনবার জন্য এত আয়োজন হয়েছিল। মায়ের প্রতি যদি ভক্তি অটুট থাকে তবে আজ বিজয়ার পর থেকেই আবার এক নতুন দিন এল, যখন আমরা হিংসা-দ্বেষ সব ভুলে গিয়ে—সব অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে ভক্তি আর ভালবাসা উদ্বুদ্ধ করে কাজে নামব। দেশমাতৃকার বোধন করেই যদি তাঁকে আনবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জেগেছিল তা হলে তাঁর আদেশ প্রতিপালন করিতেই হবে।

দেশের অবস্থা তো এখন-তখন। তার ওপর যদি-বা দুটো কানা-খোঁড়া ছেলেয় মিলে যা-হোক করে একটু চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছে, অমনি নানা দিক থেকে তার নানা শত্রু এসে তাকে দলন করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না। কাজেই আমাদের রাজনীতির আন্দোলন এবং ধর্ম্ম-ঘটের কথা বলে কাজ নেই।' তবে মোটামুটি যা রাজনীতির বা কূট-নীতির মধ্যে পড়ে না তাও তো দেখি হাজার শত্রুর মুখ এড়িয়ে তবে পাওয়া যায়।

* * *

খাঁটুরা আমাদেরই একখানা ছোটগ্রাম। তবু যা-হোক সেখানে যে-কয়ঘর লোক বাস করেন তাঁদের ইচ্ছে নিজেদের সাধ্যমত যা-হোক একটু দেশের সেবা করেন। কিন্তু স্থানীয় জমীদারের কর্ম্মচারী মশায়ের নাকি তা ভাল লাগে না। কিন্তু ওখানে জমীদারীটা যাঁর, তিনি থাকেন কলকাতায়; তাঁর কর্ম্মচারী করেন জমীদারী চালনার কাজ। খাঁটুরার কয়েকটি কানা-খোঁড়ায় মিলে, খেটে-খেগো শ্রমজীবিদের জন্য একটা নৈশবিদ্যালয় করেছিলেন রঘুনাথপুর—কাছেই একখানা গ্রামে। শুনছি সেখানকার জমীদারের যিনি ম্যানেজার তিনি জোর করে এই পাঠশালা বন্ধ করে গিয়াছেন। হায় রে হায়, যখন দুঃসময় পড়ে তখন লোকে হিত বললে বিপরীত বোঝে! শ্রমজীবীরা যদি একটু সামান্য লেখাপড়া শেখে তাতে যে জমীদার মশায়ের কর্ম্মচারিটি আপত্তিজনক কি দেখতে পেলেন তা তো বুঝতে পাচ্ছি না। জানিনা জমীদার মশায় নিজে এর কোনো খোঁজ-খবর রাখেন কিনা। আর রাখলেও তিনি নিজে যে তার এই দক্ষ-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কিছু বলবেন তা তো মনে হয় না। যাইহোক কিন্তু এসব দুর্ম্মতি লোকের কতদিনে যে সুমতি হবে তা ভগবানই জানেন। এ যে আত্মঘাতী ব্যাপার! কর্ম্মচারী মশায় কি বোঝেন না যে আজকাল তিনিও যা আর যে-শ্রমজীবীরা তাঁর প্রজা তারাও তাই। কতটুকু তফাৎ। কেবল সাদা জামা-কাপড়ের, তাই-বা কই। যিনি বেশী সাদা কাপড় পরেন আজকাল লোকে তাঁকেই তো আরো হেয় মনে করে।

* * *

মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন নিয়েও নাকি ইনি দেশের

লোকের বিরুদ্ধাচরণ করচেন। এঁকে শুধু একটা মাত্র কথা জিজ্ঞাস্য যে এই রকম আত্মঘাতী ও বিদ্বেষপূর্ণ মনের ভাব হৃদয়ে পোষণ করলে এর ফল কি শুভ হবে? ঐ-রকম মনের ভাবকেই মহাত্মা গান্ধী "দাসত্ব-বুদ্ধি" বা Slave mentality নাম দিয়েছেন। একে তো আজ কতদিনের কঠোর অত্যাচারের পীড়নে দেশ কঙ্কালসার, তার উপরেও এই সব!

বিলাতী কাপড় পরা আমাদের পক্ষে পাপ কেন এই সম্বন্ধে আমাদের কাগজে একটা প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী" ও দৈনিক "স্বরাজ" এই পাপত্ব বোধের অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন ও অনেক প্রতিকূল তর্ক করেছেন। এ-জিনিষটা দেশের লোকের কাছে যতদিন না বিনা-তর্কে গৃহীত হবে, ততদিন বল্‌তে হবে যে এখনো আমাদের দুঃখ ঘুচবার যথেষ্ট বিলম্ব আছে। যাঁরা "বিলাতী কাপড় ব্যবহার পাপ কেন" বলে তর্ক তুলতে চান তাঁদের প্রতিপাদ্য কি বুঝি না। যদি পাপ নয় প্রমাণ করতে পারেন তবেই দেশের পক্ষে খুব একটা ভাল জিনিষ হবে নাকি?

খাঁটুরা পাঠাগার

গত ২০শে আশ্বিন বেলা ৪টার সময় খাঁটুরা পাঠাগার কর্ত্তৃক পরিচালিত আলোচনা-সভার এক অধিবেশন হইবার কথা ছিল। কিন্তু প্রধান বক্তা সিটি কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় যথাসময়ে খাঁটুরায় পৌঁছিতে না পারায় উহা স্থগিত থাকে। পরদিন বিকালে খাঁটুরা ইস্কুল-গৃহে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ডাঃ শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুদূর রঘুনাথপুরের নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অনেক ছাত্র এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সতীশ বাবু বক্তৃতায় বলেন যে, "আজ শক্তিস্বরূপিনী মাতার পূজার উদ্বোধন। কিন্তু উপস্থিত অনেকে বোধন শব্দের প্রকৃত অর্থ জানেন না। বোধন অর্থে চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করা বা জাগানো। আজ মাতাকে আমরা যদি জানতুম তবে দেশের এত দুঃখ থাকত না। দেশে শক্তি নাই, একতা নাই, ভ্রাতৃভাব নাই। আমাদের প্রধান দোষ যে আমরা অজ্ঞ। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতের মধ্যে জ্ঞান-প্রচারের চেষ্টা অতি কম। শিক্ষার একটি উপায় গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন। অতি দুঃখের বিষয় যে রঘুনাথপুরে যে-নৈশবিদ্যালয়টি ছিল, স্থানীয় জমিদারের কর্ম্মচারীর রোষানলে পতিত হওয়ায় উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। দেশের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যিনি এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতীকার করতে পারেন?"

শ্রীকালিদাস রক্ষিত—সম্পাদক।

রবীন্দ্র-মঙ্গল

(আবাহন)

তব জয় জয় রবে নন্দিত বিশ্ব,
এসো কবি, এসো রাজা, হে বাউল নিঃস্ব!
দানবের ভীতি এসো, মানবের গৌরব,
ধরণীর সম্পদ, ত্রিদিবের সৌরভ।
পুণ্যের শুভ্রতা, মুক্তার কান্তি,
ভারতের সান্ত্বনা, জগতের শান্তি।
এসো প্রেম, এসো প্রীতি, এসো গাতি, গন্ধ,
বিশ্ব-মধুপ এসো লয়ে মকরন্দ।

তুমি বুঝি দুর যুগে বীণা ল'য়ে বক্ষে,
কেঁদেছিলে শরাহত ক্রৌঞ্চের দুঃখে।
হেরি বুঝি জানকীর ম্লান মুখ-ইন্দু,
শ্লোকে গেঁথে রেখেছিলে অশ্রুর বিন্দু।
শুনি তব বীণাধ্বনি সম্ভ্রমে অগ্রে,
বসেছিল মেষ মৃগ সিংহ ও ব্যাঘ্রে।
আজি সেই গমকের সাড়া পাই কর্ণে,
নব রস লভে ধরা গন্ধে ও বর্ণে।

হে কিশোর, হে অমর, চির-সুধাসিক্ত,
অফুরান ভাণ্ডার হ'বে না'ক রিক্ত।
স্বরগের গোধূলির ছায়া নামে অঙ্গে,
যুগে যুগে পরিচয় নাই জরা সঙ্গে।
এ রবির রবি কাছে আসিবে না সন্ধ্যা,
কেন্দ্রীয় ঊষা উঠে, ফুটে নিশিগন্ধা।
তুমি পিতা তুমি নেতা মুনিগণগণ্য,
তব অভিনন্দনে নিজে হই ধন্য।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ঘরের কথা

গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটী।

প্রতি তিন বৎসর অন্তর মিউনিসিপ্যালিটীর নূতন কমিশনার মনোনয়ন সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। এ-বৎসর গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর নূতন কমিশনার মনোনীত হইবার প্রথম দিন গত ৯ই জুলাই তারিখে ধার্য্য ছিল। ঐ-সময় পদপ্রার্থীগণ স্ব স্ব "বি" ফরম যথানিয়মিত সময়ে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মকর্ত্তাগণের ত্রুটীতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ৯ই জুলাই তারিখের মনোনয়ন বাতিল করিয়া গত ২৪শে সেপ্টেম্বর মনোনয়নের দিন ধার্য্য করেন। ঐ-তারিখ মনোনয়ন হইয়াছিল। এবারও শুনিতেছি কর্ম্মকর্ত্তাগণের পূর্ব্ববৎ নানাপ্রকার ত্রুটী হইয়াছে। বারম্বার একই কার্য্যে ত্রুটী প্রশংসনীয় নহে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসর পদপ্রার্থী হইয়াছেন।

ওয়ার্ড	নাম
১নং ওয়ার্ডে	শ্রীযুক্ত বাবু জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
২নং ওয়ার্ডে	,, ,, বিমলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এল-এম-এস,
	,, ,, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য
৩নং ওয়ার্ডে	,, ,, কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় কবিরাজ
৪নং ওয়ার্ডে	,, ,, কুমুদবিহারী রায়
	,, ,, প্রমথনাথ দত্ত
	,, ,, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,
	,, ,, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
৫নং ওয়ার্ডে	,, ,, শিবদাস রক্ষিত
	,, ,, নগেন্দ্রনাথ রায়
	,, ,, নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬নং ওয়ার্ডে	,, ,, পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
	,, ,, সুরেশচন্দ্র মিত্র এল-এম-এস,
	,, ,, প্রবোধচন্দ্র মিত্র এম-এ,
	,, ,, কিশোরীমোহন বসু।

২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে ২নং ওয়ার্ডে বাবু বিমলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতিযোগীতায় বিমল বাবুই ঐ ওয়ার্ডের কমিশনার হইয়াছেন। ৪নং ওয়ার্ডে বাবু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও বাবু প্রমথনাথ দত্ত এই দুই জনের প্রতিযোগীতায় পঞ্চানন বাবুই ঐ-ওয়ার্ডের কমিশনার হইয়াছেন। ৫নং ওয়ার্ডে বাবু শিবদাস রক্ষিত ও বাবু নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুইজনের প্রতিযোগীতায় শিবদাস বাবুই ঐ-ওয়ার্ডের কমিশনার হইয়াছেন। ১নং ও ৩নং ওয়ার্ডে কোনো প্রতিযোগীতা ছিল না। ৬নং ওয়ার্ডে কিশোরীমোহন বসু ব্যতীত সকলেই এবং ৪নং ও ৫নং ওয়ার্ডে উপরি লিখিত প্রতিযোগী ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই নিজ নিজ দরখাস্ত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। মনোনীত কমিশনারগণের নাম গেজেটে প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—খাঁটুরা।

নৈশ-বিদ্যালয়

বর্ত্তমান সনের বৈশাখ মাসে কুশদহ-সমিতির খাঁটুরা হয়দাদপুর শাখা দ্বারা রঘুনাথপুর গ্রামে একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত ইস্কুলের যাবতীয় ব্যয় উক্ত শাখা-সমিতি নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক জমিদার মহাশয়ের হয়দাদপুর-কাছারীর নাএব বাবু শিখরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাকি কোনো কারণে রঘুনাথপুরের একজন প্রজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রথম শাস্তিস্বরূপ উক্ত নৈশবিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা দেশের শক্তিশালী ব্যক্তি তাঁহারা দেশ-হিতকর কার্য্যে সহায়তা না করিয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বিপক্ষতাচরণ করিলে দেশের কোনো শুভ কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা জানি না জমিদার বাবু শ্রীযুক্ত বসু মল্লিক মহাশয় উক্ত ঘটনার বিষয় অবগত আছেন কি না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়—খাঁটুরা।

Printed at the Bengal PrintingWorks, 66 Manicktola Street, Calcutta by N. N. Mukerjee and published by him from 87 Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয়ের সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস অনন্তের "কোণে" ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে।

নব পর্য্যায়, ১ম বর্ষ পৌষ—চৈত্র ১৩২৮ ৯ম ১০ম ১১শ ১২শ সংখ্যা

কুশদহ

মাসিক পত্রিকা

কুশদহ-সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত

কার্য্যালয়—৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।০] [প্রতি সংখ্যা ।০

"কুশদহ"র নিয়মাবলী

১। "কুশদহ"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ২।৶০। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য তিন আনা। নমুনারও ঐ মূল্য লাগে। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে বৈশাখ হইতে কাগজ লইতে হইবে। মূল্য "সম্পাদক, কুশদহ" এই নামে প্রেরিতব্য।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের শেষ তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তিসংবাদ ডাকঘরে ও পত্রিকা-কার্য্যাধ্যক্ষকে জানান আবশ্যক।

৩। রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৪। অমনোনীত রচনা ফেরত চাহিলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

৫। পুরাতন গ্রাহকগণ যে কোন পত্র লিখিবার সময় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৬। নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে গ্রাহক-নম্বর সহ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৌছানো আবশ্যক।

"কুশদহ"র বিজ্ঞাপনের মূল্য

১। মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা—

পূর্ণ পৃষ্ঠা ১২৲। ½ পৃষ্ঠা ৭৲। ¼ পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা।

২। মলাটের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা—

পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲; ½ পৃষ্ঠা ৬৲; ¼ পৃষ্ঠা ৩॥০ টাকা।

৩। বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা—

এক পৃষ্ঠা ৬৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩॥০, সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা।

৪। বিজ্ঞাপনের ফর্ম্মার ১ম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা—

১ পৃষ্ঠা ৭৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৲, সিকি পৃষ্ঠা ২॥০ টাকা।

৫। উক্ত বিজ্ঞাপনের হার সমস্তই মাসিক।

৬। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৭। এক বৎসরের চুক্তিতে অগ্রিম টাকা জমা দিলে শতকরা ৫৲ টাকা কম লওয়া হয়।

৮। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

"কুশদহ"-কার্য্যাধ্যক্ষ

৮৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

পৌষ—চৈত্র ১৩২৮

কুশদহ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

নবপর্য্যায়, ১ম বর্ষ | পৌষ—চৈত্র, ১৩২৮ | ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ

জাগরণ

১

জননী, জনম ভূমি, চিরগরীয়সী মোর!
এত দিনে দুখনিশি সত্য কি পোহাল তোর?
বিলাসী সন্তানগণ ছিল মোহে অচেতন,
ছাড়িয়া সে সুখ নিদ্রা চাহিছে নয়ন মেলি
আলস্যের আবরণ ঘৃণায় চরণে ঠেলি।

২

রাজরাজেশ্বরী মাতা কে বলে দুঃখিনী মায়?
শ্রাবণে শ্যামল ক্ষেত্র দেখরে ভরিয়া নেত্র
যেদিকে ফিরাই আঁখি জীবন জুড়ায়ে যায়
রাজরাজেশ্বরী মাতা কে বলে দুঃখিনী মায়?

৩

নদনদী সরোবরে তৃষিতে যোগায় জল
তরুবরে থরে থরে ধরিয়া রসাল ফল
"ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এ বসুন্ধরা"
তবুও দরিদ্র মোরা এ দুঃখ কহিব কায়?
লজ্জা রাখে ম্যাঞ্চেষ্টারে, এ লজ্জা কি সহা যায়।

৪

'উন্নতি, উন্নতি' রবে করি বৃথা আন্দোলন;
প্রকৃত উন্নতি কিসে ভাবিনি তা কদাচন।
বিদেশী বর্জ্জনযাগে চিত্তশুদ্ধি কর আগে
কিসের অভাবে মোরা সোনা দিয়ে কিনি ছাই?
যা চাব, দেশেই পাব—প্রাণ দিয়ে যদি চাই

৫

উঠেছে নূতন মন্ত্র ভারতে নূতন তানে।
স্বাবলম্বনের স্পৃহা জেগেছে জাতির প্রাণে।
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, পদানত, রুগ্ন ক্ষীণ
তথাপি 'দাসত্ব মুগ্ধ'—আজি নাহি সেই মন
বাঙালী বক্তৃতা ছাড়ি বাণিজ্যে সঁপিছে ধন।

৬

পুরুষ জেগেছে যদি নারী কি ঘুমায়ে রবে?
শক্তিরূপা নারী বিনা নরে শক্তি কে জাগাবে?
চিকন বসন ছাড়ি পর সবে মোটা সাড়ী
ভাঙ্গিয়া কাঁচের চুড়ি শাঁখা হাতে কর সার।
'বিলাসিনী বঙ্গবালা' এ কলঙ্ক কেন আর।

৭

বিদেশী মাত্রেই হোক্ বর্জ্জনীয় আমাদের
তবে ত উন্নত হ'বে শিল্পরাজি স্বদেশের
গৃহে গঞ্জনার দায় যে শক্তি না কুরায়
এস আজি শুভদিনে মিলিয়া ভগিণীগণ,
মাতৃ সম্মানের তরে দেশী দ্রব্য করি পণ।

৮

ঐ হের পূর্ব্বাকাশে নবরবি অভ্যুদয়!
কাহার মাভৈঃ মন্ত্র দিগন্তে ধ্বনিত হয়!
শত শত বর্ষ ধরি অন্ধকার গুহা ভরি
জমেছে যে মলিনতা, দাও তারে জ্বালাইয়া।
জন্মিছে যে হোমানল লহ তারে জাগাইয়া।

শ্রীইন্দিরা দেবী

গৃহহীন

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাঘের প্রারম্ভ। কলিকাতা সহরে শীত পুরামাত্রায় বর্ত্তমান। রায় বাহাদুর কমল কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, আগামী পরশ্ব বিবাহের দিন। রায় বাহাদুর পুত্রের বিবাহে ত্রিভুবন নিমন্ত্রন করিতেছেন। সাহেব সুবাও বাদ পড়ে নাই।

প্রাতঃকাল। রায় বাহাদুর দ্বিতলের বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া আল বোলায় ধূম পান করিতেছিলেন, ব্যস্তভাবে খুল্লতাত পুত্র সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দাদা, ফর্দ্দে ছোট কাকার নাম দেখছিনে কেন?

রায় বাহাদুর বাম হস্তের অঙ্গুলি মধ্যে নলটি চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কে ছোট কাকা?

সুশীল এক মুহূর্ত্ত রায় বাহাদুরের মুখের পানে নীরবে চাহিয়া, বলিল—আমাদের ছোট কাকা!

ওঃ—পঙ্কজ! তাই বল! না ও নামটা নেই বটে!

সুশীল পকেট হইতে পেন্সিলটি বাহির করিতেই, রায় বাহাদুর কহিলেন—ওটা ভুল হয় নি, সুশীল।

সুশীল কথাটা বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল। রায় বাহাদুর নলটি মুখে দিলেন, একটি মাত্র টান দিয়াই বলিলেন—তোমার ছোট কাকার কাণ্ড শুনেছ ত?

সুশীল হাসিয়া কহিল—কি দাদা?

শোন নি? বলছি—বোস। তোমার ছোট কাকার ছেলে দু'টি......

সুশীল বলিয়া উঠিল—তারা ত খালাস পেয়ে এসেছে।

রায় বাহাদুর বলিলেন—তা এসেছে। এবার তোমার ছোট কাকার পালা—তাঁকে যেতে হবে। আমি পাকা খবর জানি।

সুশীল বলিল—আশ্চর্য্য নয়। যে রকম দিন পড়েছে তা'তে আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই।

রায় বাহাদুর কৃত্রিম হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া বলিলেন—না, তা নেই। তবে এতেও বিশেষ আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই সুশীল।

সুশীল বলিল—কিসে?

রায় বাহাদুর কহিলেন—এই তুমি যা বলছ—ঐ ফর্দ্দে নাম নেই......

সুশীল বিস্মিতস্বরে বলিয়া উঠিল—তাঁকে বলা হবে না?

না?

তাঁদের বাড়ীর কাউকে... ..

না।

সে কি দাদা?

রায় বাহাদুর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একান্ত মনে ধূম পান করিতে লাগিলেন।

সুশীল কিন্তু থামিতে পারিল না। সে পূর্ব্ববৎ কণ্ঠে বলিল—তিনি যে আমাদের আপনার কাকা......

রায় বাহাদুর বিরক্ত ভাবে কহিলেন—আমি জানি।

সুশীল দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক, কিঞ্চিৎ উদ্ধত প্রকৃতির। রাগ দমন করা শিখিতে পারে নাই, তবে চেষ্টা করিতেছে। রায় বাহাদুরের বিরক্তিতে দমিবার ছেলে সুশীল নয়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তাহলে তাঁর ছেলেরা জেলে গেছল বলে......

ওহে অমল......

অমল বারান্দা দিয়া কোথায় যাইতেছিল, রায় বাহাদুরের আহ্বানে ঘরের মধ্যে আসিতে রায় বাহাদুর প্রশান্ত মুখে কহিলেন—ওদের সঙ্গে কথা মিটল?

মিটেছে, বাবা।—বলিয়া অমল একবার সুশীলের পানে চাহিয়া মুখ নত করিল।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসিলেন—তাইতেই হল ত? কে? পেলিটি?

হ্যাঁ।

সুশীল এই সময়ে আবার বলিল—কি বলছেন দাদা?

রায় বাহাদুর নলটা টেবিলের উপর ছুড়িয়া দিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন কতবার বলব সুশীল? হ'বে না, হ'বে না। ও রকম লোকের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখি নে।

সুশীল সোজা হইয়া জিজ্ঞাসিল—তাঁদের অপরাধ কি! জেলে গেছেন, স্বদেশী করেন, এই?

রায় বাহাদুরের ইচ্ছা হইতেছিল, এই মূর্খ অভদ্রটাকে

— থাক্! বলিলেন—হ্যাঁ ঐ অপরাধ। তবে শুধু ঐ নয়—আরো আছে।

সুশীল জিজ্ঞাসিল—আরো আছে?

হ্যাঁ—আছে।

অমল পিতার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—কার কথা হচ্ছে?

রায় বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন—তোমার ছোট কাকার। বল ত অমল, সুশীল বাবুকে বল ত .....

অমল জিজ্ঞাসিল—সুশীল কি বলতে চায়?

রায় বাহাদুর হাঁ করিবার পূর্ব্বেই সুশীল বলিল—ছোট কাকার বাড়ী নিমন্ত্রন হ'বে না কেন তাই জানতে চাই?

অমল পিতার পানে চাহিল, পিতা বলিলেন—জানতে চাও ত জান। হ'বে না, কারণ তোমার ছোট কাকা মানুষ নন। তোমার ছোট কাকার ছেলেরা জেল খেটে এসেছে, তিনি নিজেও দু'একদিনের মধ্যেই যাবেন, তারপর স্বদেশী স্বদেশী করে তাঁর বাড়ী শুদ্ধ লোকের মাথা খারাপ হ'য়েছে—তাঁদের আমি বাড়ীতে আনতে পারি না। খুড়ো আছেন, খুড়ী আছেন, যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন, আমার এখানে ও সব হ'বে না। তা সে বাবার ভাই-ই হোন, আর বাবার বাপই হোন্।

সুশীল স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠে শক্তি ছিল, সে এত টুকু একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কিন্তু রায় বাহাদুর তৎক্ষণাৎ কহিলেন—একদিন খুড়ী এসেছিলেন শুনলুম বিধবা মেয়ে দু'টিকে নিয়ে চরকা চালাবার উপদেশ দিতে—তা বড় সুবিধে পান নি। এবং বেশ কড়া কড়াই শুনে গেছেন। গিয়ে আবার কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছেন। তবে আর কি! আমি একেবারে মরে গেলুম! বাংলা কাগজ গুলোও হয়েছে যেমন......

অমল পিতার পুত্র। বলিল—অত কথার দরকার কি বাবা! আমরা ওঁদের বলব না এই যথেষ্ট। যাঁরা চরকা নিয়ে পথে পথে ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন তাঁদের কোন কাজ কর্ম্মে নিমন্ত্রন করা শুধু যে অপমানকর তা নয়, বিশেষ আপত্তি জনক।

সুশীল অমলের কথাগুলি যেন গিলিয়া খাইতেছিল, শেষ হইবামাত্র বলিল—তুমি খুব সংস্কৃত শিখেচ দেখছি অমল, সাধু ভাষা ছাড়া কথাই কও না, তা বেশ! কিন্তু যত ছোট তোমরা তাঁদের মনে করছ তারা তা নন্। তোমাদের চেয়ে তাঁদের সম্মান কোথাও কম নেই, বরং বেশীই আছে।

সুশীল আরো কি বলিতে যাইতেছিল, রায় বাহাদুর হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, সুশীলের মুখের সম্মুখে হাত ঘুরাইয়া বলিলেন—চরকা কাট?

সুশীল উত্তরীয়খানি দেখাইয়া বলিল—নিজের হাতে বোণা।

রায় বাহাদুর বসিয়া পড়িয়া পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন—তাই!

অমল কথা কহিল না। কিন্তু সে যে পিতার কথার সমর্থন করিল, সুশীলেরও তাহা অজ্ঞাত রহিল না।

রায় বাহাদুর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—ভলেণ্টিয়ার হও নি? জেলে যাবে না?

সুশীল স্থিরস্বরে কহিল—ভলেণ্টিয়ার আজ নূতন হই নি, দাদা......

হুঁ...তা'হলে অমল, বল্ছি কি, ফর্দ্দটা তুমিই নাও—ছোট মামাকে নিয়ে, বাবা, তোমাকেই ওটা সেরে ফেল্তে হ'বে। সুশীল বাবুকে আর কষ্ট দেব না।—সুশীলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তোমার মাও ত এসেছেন?

সুশীল বলিল—এসেছিলেন। তাঁকেও আমি নিয়ে যাচ্ছি।

রায় বাহাদুর ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—গাড়ীটা জুতে দিতে বল্ব না-কি?

সুশীল বলিল—আজ্ঞে না। আমার মা'কে আমি ভাড়া গাড়ী করেই নিয়ে যাচ্ছি।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

রায় বাহাদুর পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—বিশ্বাস কা'কেও নেই, বুঝলে অমল! যাক্—আগে থাক্তেই সরে পড়েছে, সে একরকম ভালোই হ'য়েছে। তোমার একটু খাটুনি বাড়ল, বাবা, তা আর কি করবে বল? বুড়ো বাপ্......

অমল বলিল—এ আর খাটুনি কি?

রায় বাহাদুর সস্মিতমুখে কহিলেন—তাহ'লেই আমি নিশ্চিন্ত হই অমল। বাড়ীতে কত কালের পর কাজটা

হ'চ্ছে যেন কোন ত্রুটী না হয় বাবা। আর হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের সাহেব ক'জনকে বেশ করে' বলেছ ত? ওরা যে কত কাল ধরে বলছে তার আর ঠিক নেই। আর একটা কথা, তোমার বড় মামা বলছিল—কাঙালী ভোজনের কথা... তুমি কি বল?

অমল বলিল—মন্দ কি?

রায় বাহাদুর বলিলেন—না, না, অত তাড়াতাড়ি নয়, বেশ ভেবে চিন্তে বলতে হ'বে। অবশ্য গোটাকত কাঙালী খেতে পাবে বটে, কিন্তু তা'তে কাজ কিছু হ'বে না বাবা। সারা দেশের কাঙালী খাওয়াব এমন সাধ্যও আমাদের নয় কিছু, মিছে কতক মতক খাইয়ে সুনামও হ'বে না, আর গালাগালিও সইতে হ'বে। ও বেটারা খেয়ে আর কবে সুখ্যাতি করে বল? যাবার সময় সেই গাল দেবেই, পয়সাকে পয়সা, বাড়ার ভাগ গালাগাল, তার চেয়ে আমি বলি কি, ও টাকাটা—ধর এই হাজার পাঁচেক টাকা ত খরচ হ'তই—ভূত ভোজন করাতে, সেইটে—আমি বলি কি, ঐ 'বেবী ক্লিনিক' না কি খুললে সেদিন লেডী রিডিং সেইটিতেই দিয়ে দিই।

অমল সোৎসাহে কহিল—সেই বেশ।

রায় বাহাদুর সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন—তাহ'লে সেই বেশ—কেমন? বেশ, কাজ কর্ম্ম মিটে যাক্, টাকাটা বউ মা সুচারুর নামেই দেব, কি বল অমল?

অমল নতমুখে, পুলকিতকণ্ঠে বলিল—সে আপনি যা ভাল বুঝবেন, বাবা...

অমলের এক সাহিত্যিক বন্ধু অমলের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তোর জীবনকাহিনী ছাপবার সময় পিতৃ-ভক্তি বলে একটা প্রকাণ্ড অধ্যায়ই রাখ্‌তে হ'বে দেখছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুচারু ডক্টর এস্ সি সেনের কন্যা। ডক্টর এস্ সি সেন! সাহেব পাড়ার ডাক্তার, চৌরঙ্গীতে সুবৃহৎ অট্টালিকা—সেই ডক্টর এস্-সি সেনের কন্যা সুচারু। অমলের সহিত তাহার বছর চারেক আগে প্রথম দেখা হইয়াছিল। দেখাটা অবশ্য অত্যন্ত সাধারণ রকমেই হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে কোন দিন যে সেই দেখাটা অন্য কোন আকার ধারণ করিতে পারে তাহা বোধ করি স্বয়ং অন্তর্য্যামীরও জানা ছিল না।

তবে যদি সত্য কথা বলিতে হয়, অমল প্রথম সেই দেখার দিনেই সুচারুকে দেখিয়াছিল, নির্মেঘ আকাশে একখণ্ড জ্যোৎস্নার মত; আহা!

মধুপুরে প্রথম সাক্ষাৎ!

তার পর হঠাৎ একদিন রায় বাহাদুর বলিলেন—সুচারুকে তোমার কেমন মনে হয়, অমল?—অমল অবশ্য মুখ ফুটিয়া বলে নাই কিন্তু উত্তর দিয়াছিল। মুখ না ফুটুক—তাহার আরক্ত কর্ণদ্বয় বলিয়াছিল, তাহার আবিষ্ট নেত্র দু'টি জানাইয়া দিয়াছিল।

ইতিমধ্যে সুচারুর সঙ্গে তাহার বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছে। কয়দিন সেখানে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সুচারু, সুচারুর মা তাহাকে খুব আদর যত্ন করিয়াছেন। সুচারু নীচে নাম সহি করিয়া নিজের একখানি ফটো উপহার দিয়াছে।

সুচারু মেয়েটি—দেখিতে অসাধরণ এমন কিছু নয়, তবে চেহারাটি বড় স্নিগ্ধ, বর্ণ শ্যাম, পরিপূর্ণ দেহ, মুখখানি চোখ দু'টি অনিন্দ্যনীয়।—

অমলের শয়নকক্ষে ম্যাণ্টল প্লেসের উপর ঐ-যে বঙ্গীয় যুবতীর প্রতিকৃতিটি—সেইটিই সুচারুর। সুচারুর অঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, বুঝি তাহার প্রয়োজনও ছিল না,—অলঙ্কার সে রূপের শোভা আর কি বাড়াইবে? বেশের চাকচিক্য নাই—কিন্তু সেই সহজ সাদাসিধা সাড়ীতেই সুচারুকে কি সুন্দর দেখাইতেছে!

উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে অমলের কোন দিনই পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে নাই; তাই বরাবরই তাহাদের সম্বন্ধে খানিকটা সঙ্কোচ, খানিকটা সম্ভ্রম আর খানিকটা প্রলোভন মিলিয়া মিশিয়া অমলের মনের মধ্যে এমনই তাল পাকাইয়াছিল যে অনেকদিন পর্য্যন্ত বেচারা ভাবিয়াই পায় নাই যে সে সুচারুর যোগ্য হইবে কি-না! সুচারু তাহাকে প্রাণ মন দিয়া ভালোবাসিবে কি-না! অমলদের সংসারে এক মা ছাড়া আর রমণী কেহই ছিলেন না। তার উপর মা কোথায় যাওয়া আসা করিতে একান্তই নারাজ থাকায়

তাহাদের বাড়ীতেও কোন শিক্ষিত মহিলার গমনাগমন ছিল না। কাজেই অমলের মনের ভয় বা সঙ্কোচ বরাবরই সমানভাবে থাকিয়া গিয়াছিল। মাত্র সেদিন সে সুচারুর সরল অমায়িক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া আসিতে পারিয়াছে। অন্য মেয়েরা কি রকম, তাহারা সুচারুর মতই কি না অমল এখনও জানিতে পারে নাই, বোধ হয় আর জানিবার প্রয়োজনও নাই তবে সুচারুকে লইয়া সে-সে সুখী হইতে পারিবে এ বিষয় তাহার একতিল সন্দেহও ছিল না।

পূর্ব্বকালে ওকালতী করিয়া এবং একালে তেজারতীর ছলে-বলে-কৌশলে সংসারের আসল উপাদানটি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে রায় বাহাদুর কোন দিনই অবহেলা করেন নাই এবং কলিকাতার ধনী মহলে তাঁহার নাম-ডাকও একটু আধটু ছিল, তবে সাহেব মহলে প্রতিপত্তিটা ছিল অনেকের চেয়েই বেশী। সেটা এতই বেশী হইয়া উঠিয়াছিল যে শ্যামবাজারের বাড়ীটা জলের দামে বিক্রয় করিয়া কেবলমাত্র গৌরচন্দ্রের মন রক্ষার্থেই তাঁহাকে বালিগঞ্জে বাড়ী করিতে হয়। বালিগঞ্জে আসায় তাঁহার দুইটা সুবিধা হইয়াছিল। প্রথম, ফটকের পার্শ্বে নিজ নাম ফলক আঁটিয়া তাহার গায়ে 'আউট্' লিখাইয়া দিয়া আত্মীয় অনাত্মীয় দরিদ্র উমেদারদিগের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, সাহেবেরা যখন খুশী রায় বাহাদুরের দর্শন পাইয়া চরিতার্থ হইতেন। রায় বাহাদুর গভর্ণমেন্টকে চাঁদা দিয়া নাম কিনিতে চাহিতেন না—এ অপবাদ পরম শত্রুতেও তাঁহার দিতে পারিবে না। তবে সাহেবদের উপর তাঁহার কেমন একটা আজন্ম প্রীতি ছিল, তাই সময়ে অসময়ে সাহেবদের সেটা না জানাইয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। লিন্টন সাহেব ত একটা কালাপাত্রী ছিল, কার্শিয়ঙে যখন স্কুল করে তখন রায় বাহাদুর কি কম সাহায্যটা করিয়াছিলেন! পোড়া ডাঙ্গায় সমাধি স্থানটি আপনারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন, প্রায় বিশ পঁচিশ বিঘা জমি হইবে, কম করিয়া মূল্য ধরিলেও দশ হাজার টাকা কাঠা ত বটেই. কে নিঃস্বার্থভাবে দিতে পারে? তা'ও আবার অনাত্মীয় বিদেশী বিধর্ম্মী বিজাতীর জন্য? রায় বাহাদুর কিন্তু এতটাই পারিয়াছিলেন।

গভর্ণমেণ্টের তহবিলে পুঁষ দিবার ইচ্ছা রায় বাহাদুরের কোনদিনই ছিল না, এখনো নাই। তবে এবার যে ঐ বেবী ক্লিনিকের জন্য টাকাটা দিবেন স্থির করিয়াছেন উহাও তিনি গভর্ণমেণ্টকে দিতেছেন না, লেডী রিডিং গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে ঐ সমিতি স্থাপন করেন নাই, তিনি নিজে ব্যক্তিগত হিসাবে ঐ মহৎ অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন—রায় বাহাদুর সেই কারণেই পাঁচ হাজার টাকা তাঁহার হস্তে দিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ডক্টর সেন বিবাহে যৌতুক বা কন্যার অলঙ্কার বাবদ পাঁচটি হাজারও দিতে পারিবেন না—তবু যে রায় বাহাদুর এমন একটা কাজে নামিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র দেশের কোন এক কন্যাদায় পীড়িত ভদ্রলোককে আশু বিপন্মুক্ত করা। তাঁহার পুত্র, ঐ একমাত্র পুত্র, না-ই বা পাশ করা হইল। (নয়ই বা কেন? অমল ত পাশ করিয়াছিল, ইউনিভারসিটি গোলমাল করিয়া নম্বর কমাইয়া বদনাম রটাইয়া ফেল করিল বৈ ত নয়!) তাহার বিবাহে যে পাঁচশ ত্রিশ হাজার আসিত—তাহাতে কি কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? অতি বড় হিংসক লোকও বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে ডাক্তার সেন যেমন দান ধ্যান করিয়াই ফতুর হইয়াছেন, তাঁহার যেমন যত্র আয়, তত্র ব্যয়—রায় বাহাদুর তেমনি বিনা-পণে উহাঁর মেয়েটিকে গ্রহণ করিয়া বড়ই বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন! হইবে না কেন? ঈশ্বর আছেন ত! ডাক্তার সেনের মত লোক যে তাঁহার দয়া প্রাপ্ত হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি? তাঁহার নিজের মুখেরই একদিনের কথা বলিতে পারি—তিনি কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—দেখ সুচারুর জন্যে আমি কোনদিনই ভাবি নি। কেমন আমার বিশ্বাস ছিল, ওর বিয়েটা আমি থাকতে থাকতেই দিয়ে যাব। তবে সুলতার জন্যে সত্যিই আমার ভাবনা হয়—ভাই, ততদিন যদি না থাকি, তাই ভাবছি ওর জন্যে একটা কিছু করতে হ'বে। কিন্তু কি করে যে করব—তা ত জানি নে। তুমি ত সবই জানো। দু'তিন হাজার টাকা ত ফি মাসেই আসে, কিন্তু কি-যে হ'য়ে যায়—কে জানে! দেখ রমেশ, বড় গরীব দেশ এ······তোমার মুখের গ্রাসের দিকে চেয়ে যে কত হাজার হাজার লোক হাঁ করে বসে আছে, তার আর সংখ্যা নেই!

বন্ধু রমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি যে কিছুই রাখ্‌তে পার না এ বড় দুঃখের কথা, সেন। এত রোজগার করেও যে তোমার মেয়েটির বিয়েতে তুমি কিছুই দিতে পাচ্ছনা এতে রায় বাহাদুরও যে খুব সন্তুষ্টচিত্তে এ কাজ করছেন, আমার ত এমন মনে হয় না ভাই! তাঁর পূর্ব্ব ইতিহাস ত জানি, তিনি বিনা পয়সায় কাজ করছেন শুনে প্রথমটা ত বিশ্বাসই হয় নি— ইংরাজী বাংলা খবরের কাগজে পড়েও বিশ্বাস কর্‌তে পারি নি; তারপর যখন তোমার স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে গিয়ে বলে এলেন তখন, কাজেই বিশ্বাস করতে হল— কিন্তু ভাই আশ্চর্য্য!

নাহে রমেশ! আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই। ভেতরে কথা আছে। অমল সুচারুকে খুব পছন্দ করেছে বলেই রায় বাহাদুর 'না' কর্‌তে পাচ্ছেন না। আর ও পূর্ব্ব ইতিহাস যাই হোক্— এখন কিন্তু লোকটির ব্যবহার শুনলে তুমিও প্রশংসা না করে' পারবে না। সেদিন আমি বল্লাম যে আমার সংসারে সুচারুই গিন্নী, বাপ যা রোজগার করে' আনে, মেয়ে বাপের সঙ্গে দু'হাতে এমন খরচ করতে শিখেছে যে, অনেক সময় বাপ, ও হারমেনে যায়! গরীব গুর্ব্বোর নাম শুনলেই মেয়ের আমার চোখ দিয়ে জল বেরিরে পড়ে। শুনে কি বল্লেন জান? রায় বাহাদুর সুচারুকে আশীর্ব্বাদ করে' বল্লেন যে, এই ত চাই! বাপের ঘরে যতদিন ছিলে সে ঘর সার্থক করেছ, এইবার শ্বশুরের ঘর, স্বামীর] ঘরও সার্থক করবে চল মা!— কি বল রমেশ?

রমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তাই ত হে! * *

কিন্তু কাগজ পত্রে এতটা হাঁকাহাঁকি করার কি দরকার ছিল বল? ক'দিন দেখছ ত...

তা'তে আর ওঁর দোষ কি বল? লোকে ত করবেই হৈ চৈ! আর আমি ত কোন দোষই দেখিনে ভাই রমেশ! এই রকমই ত চাই! দেশের কত লোক এই থেকে শিক্ষা পেতে পারে জান?

তা হয় ত পারে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই যে রায় বাহাদুর এতটা না করলেই পারতেন!

ডকটর সেন সহাস্যে কহিয়াছিলেন, তুমি ভাবছ কাগজে রায় বাহাদুরই লিখ্‌ছেন! পাগল আর কি!

রমেশবাবু অপ্রসন্নমুখে কহিলেন— বিশ্বাস করছ না, বুঝি? আমি কাল নিজে তোমার ভাবী জামাতাটিকে দেখিছি "সেবক" অফিসে। একটা কি লেখা কালীবাবুকে বোঝাচ্ছিল।

ওহো! আজকের কাগজে দেখ-নি বুঝি তুমি! অমল "সিভিল গার্ডদের" উৎসাহিত করে একটা চমৎকার চিঠি লিখেছে হে! ঐযে রাস্তায় গরু কুকুরের পিঠে পেঠে সব রঙীন কালী দিয়ে সিভিলগার্ড লিখে দিয়েছে কিনা— তারই ওপর চিঠি খানা— সত্যি ওতে বড়ই নীচতা প্রকাশ পাচ্ছে, রমেশ। অবশ্য ছেলেছোকরায় করছে আমি জানি কিন্তু তাদের গার্জ্জেন বা নেতাদের ওটা প্রশ্রয় দেওয়া ভালো হ'চ্ছে না। অমলও সেই কথাই লিখেছে যে অন্যের নীচতা দেখে তোমরা পেছিও না, তারা নীচ, তাই বলে তোমরা কেন উচ্চ হ'বে না? তোমাদের উচ্চতা দেখ্‌লে তারাই একদিন না একদিন বুঝবে যে ভালো হ'চ্ছে না।

রমেশবাবু বলিয়াছিলেন— খুব ভালো হচ্ছে।

অন্য দু'একটি কথার পর রমেশচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি সত্যই কিছু দেবে না রমেশ?

কোত্থেকে দেব ভাই! আর দেওয়া? সুচারুর চেয়ে বড় সম্পদ ত আমাদের কিছুই নেই।

কিন্তু রায় বাহাদুরের ধারণা অন্যরকম, সেন। তিনি আশা করে আছেন যে 'দেব না' 'দেব না' করেও তুমি যা দেবে তা কোনমতেই অল্প হ'বে না।

তা ত হ'বেই না রমেশ! সুচারু একদিকে আর লক্ষ টাকার হীরা জহরৎ একদিকে—

কিন্তু তিনি তাতে ভুলবেন বলে মনে হয় না।

রমেশবাবুর দিকে গড়গড়ার নলটা অগ্রসর করিয়া দিয়া ডক্টর সেন সহাস্যে কহিলেন— তুমি অবিচার করছ রমেশ। অমল সবই জানে, তা'তে সে একটু বিচলিত নয়। অনেকদিন আগেই এ কার্য্য হ'য়ে যেতে পারত অমল তারও চেষ্টা করেছিল কেবল আমার স্ত্রীর অসুখের জন্যই হ'তে পারে নি।

রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন— যাই বল ভাই, ওদের সঙ্গে কাজ না করাই উচিত ছিল

তোমার! শুধু তোমাকেই বা বলি কেন, বাঙ্গালা দেশের কোন ভদ্রলোকেরই উচিত নয় যে ওদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করে। মেয়ের বিয়ে দেওয়া ত দূরের কথা।

সেন পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—রমেশ, মেয়ের বিয়েটাই বাঙ্গালা দেশে এক মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার মধ্যে আর রাজনীতি ঢুকিয়ো না ভাই। গরীব বাপ-মা বেচারারা মারা পড়বে।— একমুহূর্ত্ত থামিয়া সুহৃদ্বরের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রক্ষা করিয়া কহিলেন—তোমার সে সব মত কোথা গেল, রমেশ! তুমি না খুব ঈশ্বর বিশ্বাস করতে? এখন ছেড়ে দিয়েছ বুঝি! আমি কিন্তু এখনও করি।

রমেশচন্দ্র আর কথা বলিলেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস তিনি অল্প করিতেন না, কিন্তু মানুষের মন সেই বিশ্বাসকে ছাপাইয়া কখন্ যে যুক্তির তর্কের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে তাহা অনেক মানুষই সময়ে বুঝিতে পারে না।

বিশ্বাস করিয়া যতখানি অগ্রসর হইয়াছিল, যুক্তি তর্কের প্রাবল্যে যে তার চেয়ে বেশীদূর পিছাইয়া যাইতে হয় জানিয়াও কেন যে সামলাইতে পারে না, তাহা আমরা জানি না, বা বুঝি না।

ডক্টর সেন বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিলেন—উপরে চল। সুচারুর মাসী নিজের হাতে পশমের কাপড় বুনে পাঠিয়েছেন, তেমন আর দেখনি, এস দেখ্‌বে। চমৎকার জিনিষ হয়েছে। কাল সেই কাপড় পরিয়েই সুচারুকে সম্প্রদান করব। এস……

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের অব্যবহিত পরেই নব দম্পতীরা কি ভাবে বা কি করে তাহার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিবার ক্ষমতাও আমার নাই, কাজেই আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম। আর আমার বিশ্বাস সে বর্ণনা অত্যন্তই নিষ্প্রয়োজন।

সুচারু সুন্দর মুখখানি তুলিয়া সহাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তুমি যে সত্য সত্যই রাত জাগতে আরম্ভ করলে?

অমল ম্লান মুখে কহিল—বল্লুম ত চারু, যে রাত্রেই আমাকে বাবার সঙ্গে বাইরে যেতে হবে। যতক্ষণ আছি—ঘুমুব না।

সে যথাসম্ভব তদগত ও প্রেম পূর্ণস্বরে কথা কয়টী বলিয়াছিল এবং আশু বিচ্ছেদাশঙ্কায় কণ্ঠের নীচেই যেন খানিকটা বাষ্প জমিয়া তাহার মুখটাকেও করুণ করিয়া তুলিয়াছিল—এমত অবস্থায় আশা করা আদৌ অসঙ্গত নহে যে এই বিরহ ব্যথা, দয়িতাকেও বাজিবে! আপনা আপনি তাহার গলাটীও ভিজিয়া উঠিবে, কিন্তু হায়! সুচারু হাসিয়া ফেলিল। বলিল—আমি বলি, বাবার সঙ্গে যেতে হ'লে যখন রাত জাগতেই হ'বে তখন এখন একটু ঘুমিয়ে নাও! বুঝ্‌লে?

অমল কি বুঝিল, কে জানে, তাহার মুখ সহসা আঁধার হইয়া আসিল। বলিল—বেশ, ঘুমাও। আমি কাপড় চোপড় ঠিক করে নিই।

হ'বে অখন। কাপড় চোপড় ঠিক করার এত তাড়া পড়ল কেন?—না, না এখন ঘুমোও। আমি তোমায় ডেকে দেব'খন।

তুমি বুঝি জেগে থাক্‌বে?

আমি ত জেগেই—আমার ঘুম যে খুব কম হয়।

অমল বলিল—সেই জন্যে বুঝি মাথার কাছে বই রেখে দাও?

সুচারু লজ্জানম্র মুখে কহিল—না না রাত্রে আমি পড়ি না। দেখ কাল অবধি বাড়ীময় ঐ একটা কথাই শুনতে পাচ্ছি, চাকর বাকর অবধি বলাবলি করিছে যে আমি দিনরাত বই নিয়ে থাকি। কেন বল ত? কেউ দেখেছ আমায় দিনরাত বই নিয়ে বসে থাক্‌তে?

অমল সুচারুর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথাক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—থাক্‌লেই বা চারু! বই পড়া মন্দ কাজ নয়। আর বইগুলি পড়বে বলেই ত এনেছ—চারু, কেন পড়বে না, পড়বে। আমি বল্‌ছি—তুমি পড়ো।

সুচারু একমুহূর্ত্ত নীরব রহিল; তার পর ধীরে ধীরে কহিল—আমি বই আনি নি, পড়তেও চাই নে। বাবা জোর ক'রে আমার বইগুলো সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন, আর আমার ঝি মাগীটা সেখানে যে রকম সাজান থাকৃত সেই রকম করে' আনার মাথার কাছে সাজিয়ে রেখেছে—

আমার দোষ নেই। শুনলুম বাবাও বিরক্ত হয়েছেন .....

অমল তাহা জানিত। পিতা যথাসময়ে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তবে কেবলমাত্র গ্রন্থপ্রীতিহেতু নহে, অমল তাহা জানিত—কিন্তু এ বিষয়ে সে পিতার সঙ্গে এক মত হইতে পারিল না। সুচারুকে বেচারা অমল ভালবাসিয়াছিল। আর নবীন প্রেমিকের ভালবাসা, অন্ধ, সরল, জ্ঞানশূন্য।

মুখের কথাটি কাড়িয়া লইয়া অমল সুচারুর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—তা শোন্ তুমি বই পড়ো। যার যা অভ্যাস। বরং কাল থেকে সন্ধ্যের পর আর আমি বেরুব না। তবে পড়া শুনা আমার সুবিধে নয়, তা আগেই বলে রাখছি, তবে তুমি যদি বুঝিয়ে সুজিয়ে দাও......

যাও—বলিয়া সুচারু হাতে অমলের মুখখানি একটু খানি ঠেলিয়া দিল; তখনি আবার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—কথায় কথায় ঠাট্টা!

এবারে অমল আর ছাড়িল না। সুচারুর সুকোমল বাহু দু'টির উপরে নিজের দু'টি হাতের বন্ধন দিয়া শুইয়া পড়িল,—এবং বাহুলগ্ন থাকিয়াই, অমল ঘুমাইবে না স্থির করিয়াও ঘুমাইয়া পড়িল।

বিদ্যুতের আলোকে সুচারু নির্নিমেষ নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। একি মাদকতা, একি উত্তেজনায় তাহার হৃদয় মন বর্ষার নদীর মত স্রোতস্বতী উত্তাল হইয়া উঠিল। সেই গৌরবর্ণ, সুপুষ্ট সুন্দর যুবার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না,— কিন্তু বেশীক্ষণ নহে, অল্পক্ষণ পরেই অমলের হাত দুটিকে সস্নেহে সন্তর্পণে একপাশে নামাইয়া দিল। একটি বুঝি একটুখানি বাঁকিয়া পড়িয়াছিল, মমতায় সুচারুর যেন সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করিয়া হাতটি ঠিক করিয়া ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া আলোটি নিবাইয়া বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি কত বলা যায় না, রায় বাহাদুর সসব্যস্তে পুত্রের শয়নকক্ষের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন—অমল। অমল!

অমল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—কে ?

রায় বাহাদুর জলদগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—আমি। একবার এদিকে এস।

রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে অমলের জড়িমা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। সে অন্ধকারেই, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই রায়বাহাদুর বলিলেন—দরজাটা টেনে বন্ধ করে দাও।......এস।

অমল নির্ব্বাক বিস্ময়ে পিতাকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার আফিস কক্ষে ঢুকিল। রায়বাহাদুর একখানা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীরস্বরে আর একখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন—বস।

অমল চেয়ার খানায় বসিয়া পড়িয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে, পিতার মুখের পানে চাহিল।

রায়বাহাদুর বলিলেন—ডক্টর এস, সি সেন বল্লে কা'কে বোঝায় ?

অমল প্রশ্নটিই সম্যক বুঝিল না তা উত্তর দিবে কি ? সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

রায়বাহাদুর উত্তেজিতস্বরে কহিলেন—কলকাতায় আর কোন ডাক্তার আছেন ঐ নামের ?

অমল বলিল—কি জানি! —বোধ হয় নাই। কেন ?

রায় বাহাদুর সেলফ্ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—ডিরেক্টারীখানা পাড়িয়া দেখ আর কোন ডাক্তার ঐ নামের আছেন কি না ?

অমল ডিরেক্টারীখানা পাড়িয়া আনিয়া জিজ্ঞাসিল—কি হ'য়েছে ?

হ'য়েছে, বল্‌ছি। তুমি দেখ।

অমল দু'চার পাতা উলটাইয়া কহিল—ও'র নামে ডাক্তার আর কেউ আছেন বলে ত বোধ হয় না।

রায় বাহাদুর কহিলেন—তাহ'লে তোমার শ্বশুরই ডক্টর এস্ সি সেন! —জুয়াচোর, লোফার!

অমল আরক্তমুখে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল,—কি বল্‌ছেন আপনি ?

তোমার শ্বশুর একজন নন্‌-কো-অপারেটার জান ? মেয়ের বিয়ে দেবার সময় এ কথা আমাদের

জানায় নি, গোপন করে' সব কাজ যখন শেষ করেছে……

অমল সগর্ব্বে কহিল—কে আপনাকে মিথ্যে খবর দিয়েছে বাবা!

রায়বাহাদুর বলিলেন—মিথ্যে নয়। তোমার শ্বশুর ডক্টর এস্ সি সেনকে আজ পুলিস ধরে নিয়ে গেছে—এই মাত্র আমি খবর পেলুম।

ধরে নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

অসম্ভব!

না, অসম্ভব নয়, বরং খুবই সম্ভব। সকালে খবরের কাগজ এলেই বুঝ্‌তে পারবে। আর খবর যে মিথ্যে নয় এর আরু একটা প্রমাণ এই যে তোমার শ্বশুর ঐ ডক্টর সেনেরই রমেশ বোস্ বলে কোনো বন্ধু আমাকে টেলিফোণ করে জানালেন- যদি আমি তাঁর মুক্তির কোন উপায় গভর্ণমেণ্টকে বলে ক'য়ে করতে পারি। কাজেই বুঝতে পারছ, মিথ্যে নয়!

অমল যুক্তিতর্ক ভুলিয়া গেল। কোথাকার এতটুকু একটি মলিন মুখ আর সজল ছুটি আঁখি তাহার মনের পাতায় ভাসিয়া উঠিল, অমল বিহ্বলের মত বলিল—আপনি কি বল্লেন?

রায় বাহাদুর স্থিরস্বরে কহিলেন—সে কথা পরে বলছি। তুমি আগে তাঁর মেয়ের কাছে খবর নাও সে এ সম্বন্ধে কিছু জানে কি-না!

অমল বলিল—কাকে জিজ্ঞাসা করব? সুচারুকে? তিনি কি করে, জান্‌বেন, কলকাতায় কি হ'য়েছে না-হয়েছে?

রায় বাহাদুর গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন—তা না জান্থন, তাঁর বাপ্ নন্-কো-অপারেটোর কি-না তা ত বল্‌তে পারবেন। তাহলেই হ'বে।

তবুও অমল উঠিল না। সরলা বালিকাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া কোন রূঢ় প্রশ্ন করিতে তাহার যুবা-চিত্ত কিছুতেই সায় দিতেছিল না, সে নতমুখে বসিয়া রহিল, ঠিক এই সময়েই, অমলের জননী কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রায় বাহাদুর বলিলেন—বসে রইলে কেন অমল? জিজ্ঞাসা করে এস……

গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন—কা'কে আবার জিজ্ঞাসা করবে? বউমাকে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বৌ-মাকে।

তাকে কেন? সে জানবে কেমন করে? আর, একটা রাত্রি তুমি অপেক্ষা করতে পারছ না—কাল সকালেই ত সব জানা যাবে; একটা রাত্রি বৈ ত নয়।

রায় বাহাদুর ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন—না, একটা রাতও নয়। যদি জান্‌তে পারি তা হ'লে ওঁকে আজই কলকাতায় পাঠিয়ে দেব। এখানে ওঁর থাকা হ'বে না।

অমল দীপ্তনেত্রে পিতার পানে চাহিল; কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। তাহার জননী বলিলেন—তার অপরাধ?

রায় বাহাদুর রোষযুক্তস্বরে কহিলেন—সে তুমি বুঝবে না। পরে পুত্রের উদ্দেশে কহিলেন—বুঝতে পারছ অমল, যদি কথা সত্য হয়, বিপদ কতদূর গড়াবে। গবর্ণমেণ্ট যে শুধু তাঁকে ধরেই ক্ষান্ত হ'বে—তা নয়—তার সম্পর্কে যেখানে যে আছে সব টেনে টেনে বার করবে, আর ফল কি দাঁড়াবে তা আর তোমাকে বোধ করি বল্‌তে হ'বে না। শুধু তাই নয় অমল, তোমার সেই ছোট দাদা-ম'শায়টির জন্ত আগে থাক্‌তেই আমাদের সতর্ক থাক্‌তে হ'য়েছে, জানই ত তারই জন্যে সেদিন সেই ছোঁড়াকেও তাড়াতে হ'য়েছিল, তবে সে সম্বন্ধে সুবিধা এই তাঁর সম্পর্কের কাউকে এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় কেউ দেখ্‌তে পায় না! তোমার বিয়েতে যে তাঁদের বলিনি কেন, তুমি ত জান!

অমল নীরবে মাথা নাড়িল।

রায় বাহাদুর বলিলেন—এ একটা মস্ত পরীক্ষার সময় এসেছে। মাথা গরম করেছ কি গেছ! দেখছ ত— দিনের পর দিন সব পঙ্গপালের মত চলেছে, ভাবছে ভারি কাজ করছি। আরে বাবু ওতে কি আর ওরা ভয় পায়? হরদম ধরবে আর পুরবে, দিনকতক বাদে তোদেরই দল শেষ হ'য়ে যাবে, তখন তোদের দলের যেখানে যার সন্ধান পাবে তা'দেরই কি অমনি অমনি ছাড়বে ভেবেছ? এই

রাগ সব তুল্‌বে না ? অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে মিলিয়ে তুল্‌বে !

রায় বাহাদুর একমুহূর্ত্ত থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন—তাই এসময়টা বুঝে চালানই বুদ্ধির কাজ ! পয়সা কড়ি বল, মান সম্ভ্রম বল, কতক্ষণ থাক্‌বে ওদের চটিয়ে রাখ্‌লে ? না থাক্‌তে পারে ? ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার হ'লেই হ'ল ! ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মার !

অমল নিরুত্তর। গৃহিণী বলিলেন—তা আমরা ত আর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক নূতন করে কিছুই করতে যাচ্ছি নে, আমাদের ভয়ই বা কিসের ? আর বউমা আমার তেমন নন্‌ ! এই ত ক'দিন এয়েছেন, দেখ্‌ছি ত, লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত, অন্য কোন খেয়ালই দেখি নে।

রায় বাহাদুর বিরক্তভাবে বলিলেন—কথা হ'ত না যদি কাজটা অনেকদিনের পুরাণো হ'য়ে যেত ! এখনও যে দশ দিন হয় নি, অমলের বিয়ে দিয়েছি, এ থেকে ওদের ত সন্দেহই হ'তে পারে জেনে শুনে আমি রাজদ্রোহীর ঘরের মেয়ে এনেছি। একবার সন্দেহ হ'লে কি রক্ষা আছে ভেবেছ ? ধরতে কতক্ষণ ! এত বড় বাড়ী, এত পয়সা কড়ি, এত সম্মান, তখন কেউ আট্‌কাতে পারবে না, সব এক গাড়ে পুরবে !

গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁ গা তুমি কি বলছ ? একি মগের মুলুক যে যা'কে ইচ্ছে অমনি ধরে ধরে সাজা দেবে !

মগের মুলুক ছিল না, পাঁচ বেটাতেই করে তুলেছে। সে কথা থাক্‌—অমল, তুমি বাবা বুঝে দেখ। আর আমি অন্যায় কথা কিছু বলছি নে,—যতদিন না এই সব হাঙ্গামা মেটে, ততদিন উনি কলকাতায় থাকুন, তারপর সব চুকে বুকে গেলে আস্‌বেন—কি বল ?

অমল দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিল, বাহির হইতে যাইবে মা বলিলেন—কি বল্‌বি শুনি ?

তাই ত কি বলিবে ? অমল মা'য়ের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মা বলিলেন—ধরে নিয়ে গেছে টেছে যেন বলিস্‌ নে।

না—বলিয়া অমল বাহির হইয়া গেল এবং দু'মিনিট পরেই উর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মা সুচারু নেই। তোমার দেওয়া এই বালা জোড়া বালিশের নীচে পড়ে……

নেই কি রে অমল ?

না, মা, নেই। আমি ওদিকটা সব দেখে এসেছি, নেই।

বলিয়া অমল চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রায় বাহাদুর স্থির গম্ভীরস্বরে কহিলেন—তা' হলে তিনি লুকিয়ে আমাদের কথা সব শুনেছেন। শুনে অধীর হ'য়ে……

গৃহিণী বলিলেন—দেখ, তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি সত্যিই লোপ পেয়েছে দেখ্‌ছি। বউমা শুনে অধীর হয়েই পালিয়েছেন—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি রায় বাহাদুর হ'য়েছ ?

রায় বাহাদুর বলিলেন—তবে কোথায় গেলেন শুনি ?

এ কথার উত্তর গৃহিণী তৎক্ষণাৎ দিতে পারিলেন না—পুত্রের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—অমল, তুমি যখন উঠে এসেছিলে, বৌমা ত ঘুমোচ্ছিলেন, দেখেছিলে ?

হাঁ—বলিয়াই অমল বলিল-না মা, তখন আমি অন্ধকারেই বেরিয়ে এসেছি, দেখি নি।

রায় বাহাদুর চেয়ারখানার উপর সটানভাবে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন—যাক্‌—এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—আমাদের আর কষ্ট করে' বল্‌তে হ'ল না। কি বল অমল ?

এ কথায় গৃহিণী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন-তুমি কি মানুষ নও ?…অমল, এস ত বাবা—দেখি……

ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন বৌ-মার ঝি পশ্চিমের ঘরটায় থাকতো, সে ঘরটা দেখেছ ? দেখ নি—চল দিকিন। সে'ও যদি না থাকে,……

বাধা দিয়া অমল বলিল—মা এ'ও কি সম্ভব ?

কি অসম্ভব অমল ?

সুচারু এই রাত্রে একলা……

হ'তে যে না পারে এমন নয়, বাবা। বাপকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে শুন্‌লে কোন্‌ সন্তান স্থির থাক্‌তে পারে ?

তা হ'লেও এত রাত্রে একলা যাওয়ায় লোকে কি

অমল ইতঃস্তত করিতেছে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন—লোকে নিন্দা করবে ? সেটা আশ্চর্য্য নয়, অমল ! তোমার

বাবার মত লোকের অভাব নেই। কিন্তু আমি নিন্দা করব না।

তাঁহারা কথা কহিতে কহিতে পশ্চিমের ঘরের দ্বারের সম্মুখীন হইতেই দেখিলেন, কক্ষমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে, দ্বারের ফাঁক দিয়া আলোকের রেখা বাহিরে পড়িতেছিল।

দ্বার ভেজানই ছিল, ঠেলিয়া ঢুকিতেই যাহা দৃষ্ট হইল, যেমন আশ্চর্য্যজনক, তেমনি মনোরম।

ঝি-টি বসিয়া একরাশ তুলা সাজাইয়া সাজাইয়া তুলিতেছে, আর সুচারু নিবিষ্টচিত্তে একটা চরকা ঘুরাইতেছে।

ইঁহাদের দেখিয়া সুচারু দাঁড়াইয়া উঠিল। অমলের উদ্বেগ কমিয়া গিয়াছিল কিন্তু এখন নূতন যন্ত্রণায় তাহার বুকটি ভরিয়া উঠিল।

অমল বলিল—তোমার বাবাকে পুলিসে নিয়ে গেছে সুচারু!

সুচারু বলিল—আজ?

অমল বলিল—হাঁ, তিনি নন্‌কোপরেশানের দলে ছিলেন।

সুচারু বলিল—জানি।

অমল হতবুদ্ধির মত তাহার পানে চাহিয়া রহিল। প্রায় দুই মিনিট পরে কহিল—তোমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে।

সুচারু বলিল—সে ত শুনলুম।

অমল বলিল—জেল হ'বে জান?

জানি।

অমল নির্ব্বাক! আবার কিছুক্ষণ পরে বলিল—আর তুমি?

সুচারু কথা কহিল না। বোধ হয় প্রশ্নটা বুঝিতে পারে নাই।

অমলের মা এতক্ষণ দূরেই দাঁড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন—তুমি ও কি করছিলে বউমা?

সুচারু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—চরকা কাটছিলুম। বাবা আমাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন, অবসর সময়টা .....

পার?

পারি মা।

কই—দেখি?

সুচারু চরকার সামনে বসিয়া পড়িল। বাম হাতে তুলার গুচ্ছটি তুলিয়া লইয়া ডান হাতে চরকা ঘুরাইতে লাগিল।

এই সময়েই রায় বাহাদুর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তমধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, আহত সৈনিকের মত টলিতে টলিতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

এ-ঘরে আসিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন মোটর তৈরী অমল, বৌমাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর।

অমল নতমুখে বলিল—আমিই ওকে নিয়ে চল্লুম বাবা!

রায় বাহাদুর হতবুদ্ধির মত দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। অমল এ ঘরে আসিয়া দেখিল, মা পরমোৎসাহে সুতা কাটা শিখিয়া লইতেছেন, দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া গেল।

পরদিনই কলিকাতায় একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া রায় বাহাদুর মণি খানসামাকে একমাত্র ও অদ্বিতীয় সঙ্গী করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

—তারপর—

যাঁরা আজ প্রশ্ন করচেন, "তারপর?" তাঁহাদের আমরা এই অনুরোধই করব, স্বরাজ কি তাই জান, নিজেদের জান, নিজেদের শক্তির পরিচয় নাও তারপর কাজে প্রবৃত্ত হও। কোন বিশেষ একটা পথের পানে চেয়ে থেকোনা, কারু মুখের দিকে চেয়ে থেকো না—পরধর্ম্ম আশ্রয় করো না। তা হলেই আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না "তারপর?"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ভাল না লাগে—ছেড়ে দাও। ভালো লাগে—পড়ো। পড়া ভালো লাগেনা, জেলে যেতেও ইচ্ছে করে না—ব্যবসা কর বা পল্লীতে যাও। অন্নের সংস্থান কর, দেশকে সমৃদ্ধ কর, দেশের লোকের বাহুর শক্তি বাড়াও, মনে তাদের শক্তি জাগাও। ভাব-প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে কেবল জিজ্ঞাসা করো না—"তার পর?" —— (বিজলী)

পুরাতন দৃশ্য।

"তারা দিলিনে দিলিনে দিন
(আমি) তারা তারা বলে ডাকি সারাদিন
দিলিনে, দিলিনে—"

আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি প্রত্যুষে এইটুকু গান করিতেই তাঁহার গৃহিণী গৃহাভ্যন্তর হইতে উত্তর দিলেন "তারা দিন ত দিয়াছেন কিন্তু আজকের দানা ত দেন নাই, আজও দানা ঘরে নাই" এইটুকু শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঈষৎ কোপের ভান করিয়া বলিলেন "আঃ! এই অসুদয়েই নেই নেই আরম্ভ করলে; তা দানা নেই কিনা পরমায়ুঃ নেই?" গৃহিণী শুনিয়া একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আমি কি তাই বল্‌ছি, আমি বল্‌ছি ঘরে চাল নেই" ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "আবার ঐ কথা!" গৃহিণী কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন "তবে কি বলবো? যা বলি তাতেই দোষ"। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, রণজয় হইয়াছে অতএব উপদেশছলে বলিলেন "বল, ঘরে চাল বাড়ন্ত।" এইরূপ কিয়ৎক্ষণ দম্পতির মধ্যে রসভাব চলিলে, উভয়ে স্থির করিলেন যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট যাইয়া প্রার্থী হইলে এ দারিদ্র্যদুঃখের বিমোচন হইতে পারে।

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ যথাসাধ্য সুসজ্জিত হইয়া ছত্রদণ্ড ধারণ ও চর্ম্মপাদুকা কুক্ষিদেশে স্থাপন পূর্ব্বক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ পথে যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, গৃহিণীর কথায় উৎসাহিত হইয়া আসিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই, কারণ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ত পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করিলে বৃত্তি বা ব্রহ্মোত্তর লাভ ঘটে না, তার উপায় কি? ব্রাহ্মণ আপনার বিদ্যা বিলক্ষণই জানিতেন, সুতরাং একবার ভাবিলেন যে এই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্, আবার ভাবিলেন যে এতদূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত নয়। দেখাই যা'ক কি হয়? কালিদাসত একডুবেই পণ্ডিত হইয়াছিলেন, আমার ভাগ্যে কি তা ঘটিবেনা? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছেন দেখেন প্রান্তর মধ্যে এক বটবৃক্ষতলে দুইটি ষণ্ড দুই দিক হইতে আসিয়া ঘোররবে তুমুল যুদ্ধারম্ভ করিল। দর্শনমাত্রেই তাঁহার মনে কবিতার উদয় হইল, যেমন পণ্ডিত তার বিষয় তেমনই। তিনি অবিলম্বে বঙ্গ ভাষায় এক কবিতা (?) রচনা করিলেন। সারাপথ সেই কবিতার আবৃত্তি ও আপনা আপনি তার সমালোচনা চলিল। রাত্রিতে যে গৃহস্থবাটীতে অতিথি হইলেন সেখানেও মনে মনে তাহারই আলোচনা। এইরূপ করিতে করিতে পরদিন মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কৃষ্ণনগর উপস্থিত হইয়া কোন স্থানে মধ্যাহ্ন ব্যাপার শেষ করিয়া অপরাহ্নে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা তৎকালে বহুদ্বিজ্জন সমাগমে প্রাচীন কালের বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায়ই ছিল। বহুপণ্ডিত বহু বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়া বহুবিত্ত লাভ করিয়া প্রস্থানের পর সর্ব্বশেষে আমাদের ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের উপর মহারাজ দৃষ্টি পাত করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে আকাট মূর্খ সুতরাং তাঁর ভয় বা সঙ্কোচ কিছুই ছিল না, অতএব রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই তাঁর স্বরচিত মনোহর সুচ্ছন্দ সুললিত কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন; পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কবিতাটি নিম্নে দেওয়া হইল।—

"হোঁকা মেয়ে, রোক্কা ষাঁড় যত্রতত্র ঘুরিছে। ক্ষুধা পেলে বাড়ী এলে লাথি ঝাঁটা খাইছে॥ ভরলে পেট, মাথা হেঁট শয়নেরি বাসনা। মহারাজ। করকাজ দিয়ে তারে আস্তানা।" যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চি প্রভৃতি স্থানের মহামহোপাধ্যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া বিত্ত লাভ করেন সেখানে এমন কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া মহারাজ নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। সভাসদ্বর্গও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। সকলেই হাসিয়া আকুল। মহারাজ তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন যে ষাঁড়ের আস্তানার জন্য পাঁচ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করা হউক। লেখক দান পত্র লিখিবার সময় নাম জিজ্ঞাসা করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "লেখ, আনন্দ চন্দ্র ষাঁড়" লেখক প্রতিদিনই কত লোকের উপাধি শ্রবণ করেন কিন্তু এমন অদ্ভুত উপাধি কখনও তাঁহার কর্ণ গোচর হয় নাই। কাজেই তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মহারাজ

এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং ভট্টাচার্য্যের উপাধি জিজ্ঞাসা করাতেও সেই উত্তরই পাইলেন। তৎপরে মহারাজের আদেশে ঐ নামেই দান পত্র লেখা হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এরূপ উপাধি গ্রহণের কারণ কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর দিলেন মহারাজ স্বগুণেই এই উপাধি লাভ করিয়াছি আর বলিতে কি বিদ্যা ত মহারাজ এক্ষণেই প্রত্যক্ষ করিলেন সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনাটা ত ভাবিতে হয় কারণ যদি কখন মহারাজ বা মহারাজের কোন উত্তরাধিকারী বিদ্যা-হীনতার জন্য কাহারও নাম কাটিয়া দেন ত তাহার প্রতি-বিধান করা চাই। মহারাজ শুনিয়া বলিলেন ইহাতে তার কি প্রতিবিধান হইল? ভট্টাচার্য্য উত্তর দিলেন মহারাজ! আপনি হিন্দু ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আর যাহারই নাম কাটুন, হিন্দু কেহই ষাঁড়ের গলায় কোপ দিতে সাহস করিবেন না। মহামূর্খ ব্রাহ্মণের বুদ্ধিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চ বিঘার স্থানে পঞ্চবিংশতি বিঘা দানের আদেশ করিলেন। এইরূপে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যদুঃখের অবসান হইল। গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। সুরসিক কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গ বিখ্যাত গোপাল ভাঁড়কে ইহা অপেক্ষা বহু বেয়াদপিতে বহুবার বহুধন দান করিয়া ছিলেন বাল্যকালে লেখক ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশধরের গৃহিণী প্রসন্ন ষাঁড়ের স্ত্রীকে দেখিয়াছেন। আর অদ্যাপি ষাঁড়ের ভিটেও ষাঁড়ের দহ বর্ত্তমান। সুতরাং ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রীপতিরাম বৃহস্পতি
গৈপুর ২৪পরগণা

স্বরাজের আকাঙ্খা

সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে যেমন প্রথমে আপনার স্বরূপ চিনিতে হয়, স্বরাজ লাভ করিতে হইলেও আগে সেইরূপ স্বজাতিকে চিনিতে হয়। স্বজাতির প্রকৃতি না বুঝিলে স্বরা-জের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা জাগে না। যাহারা আপনাদের জাতীয় জীবনের বিশালত্ব ও বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাহারাই স্বরাজের মহিমা বুঝিয়াছে, তাহারাই শুধু স্বরাজ-লাভের সাধনায় আপনাদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে। —আত্মশক্তি

জননীর মূল্য

আমরা ইতিহাস পুরাণে পাঠ করিয়াছি যে কর্ম্ম ভেদ জাতি ভেদের মূল কারণ। প্রথমে চারিটি বর্ণ, তাহা হইতে কত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং বিভিন্ন প্রদেশের এক জাতির (ধরুন্ ব্রাহ্মণ) লোকেরা একত্রে বসবাস ও আহার করে না অর্থাৎ স্বতন্ত্র জাতির ন্যায় পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করে। রেলওয়ে যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে শিক্ষা, চাকুরি বা ব্যবসায়ের জন্য নানা প্রদেশের লোক একস্থানে বাস করিতেছে। কোচবিহারে যে বাসায় আমি থাকিতাম তথায় কয়েক বিঘা খালি জমি পড়িয়াছিল তাহাতে আলুর চাষ করিব বলিয়া আমার চাকরকে জমিতে কোদাল দিতে অনুরোধ করি। সে যুক্ত প্রদেশের লোক, আমার উচ্ছিষ্ট বাসন প্রভৃতি মাজিত এবং জুতাও বুরুস করিত। সে আমার কথা শুনিয়া সেইদিন বৈকালেই চলিয়া যায়। অবশেষে জানিতে পারিলাম যে জাতিচ্যুত হইবার ভয়েই সে আমার কাজ ছাড়িয়াছে। ইহাতে বুঝিলাম যে কোন কোন জাতি জমিতে কোদাল দেওয়া অপেক্ষা জুতায় বুরুস দেওয়া অধিকতর হেয় বলিয়া বিবেচনা করে না।

কয়েকজন ধুনুরি (যাহারা লেপ তোষক, প্রভৃতি তৈয়ারী করে) বাটিতে লেপ, বালিশ প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছিল; তুলার অভাব হওয়াতে জাতি নষ্ট হইবার ভয়ে তাহারা তুলা বহন করিয়া আনিতে পারিল না। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে কোন্ জাতির কি কি কাজ নিষিদ্ধ তাহা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বলিতে পারিবেন না।

(ক) বড় বড় সহরে সকালে বেড়াইতে গিয়া দেখিতে পাই যে রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তবে স্থানে স্থানে বিষ্ঠা বা মৃত ইন্দুর বা বিড়াল পড়িয়া রহিয়াছে। অনু-সন্ধানে জানিয়াছি যে, যে ধাঙ্গড় রাস্তা পরিষ্কার করে, সে ওসব জিনিষ স্পর্শ করে নাই; বিষ্ঠার জন্য মেথর আসে এবং মৃত জন্তুর জন্য ডোম রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। যদিও পাঠক পাঠিকার নিকট তিন জনেই সমান শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার পাত্র,

তথাপি তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম ও জাতি রক্ষা করিবেই করিবে।

রজকের বাটী হইতে পরিস্কৃত বস্ত্র বহন করিবার জন্য একটি মুটিয়া নিযুক্ত করিলাম, সে একটি বৃদ্ধ মুটিয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া বলিল "আমি কি ধোপা যে কাপড় লইয়া যাইব? না, আমি পারিব না।"

এই তো গেল মূর্খ লোকদের কথা। এইবার ভদ্রলোকদের কথা বলিব। ভদ্রতার আবার তারতম্য আছে। অতিভদ্রের যা নিষিদ্ধ তাহা সাধারণ ভদ্র করিতে পারে। আবার সাধারণ ভদ্রের যাহা নিষিদ্ধ তাহা পল্লীবাসী ভদ্র করিতে পারে। শারীরিক পরিশ্রম হইতে বিরত থাকাই ভদ্রতা (?)। কোন ভদ্রলোক সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার হইবে না তবে আধুনিক নূতন কর্ম্ম (যথা কল কব্জা, বয়লার (boiler) পেটা, ঁচাচা বা বিজলী আলোর তার, পাখা প্রভৃতি লাগান) করিতে সাধারণ ভদ্রেরা সম্মত হইবে। ভার বহন করিতে হইলে তাহা হাতে ঝুলাইয়া বা বগলে ধরিয়া লইয়া যাইবে স্কন্ধে ও মস্তকে ভার বহণ ভদ্রতাবিরুদ্ধ; যদিও পল্লীবাসী ভদ্রেরা তাহাও করিয়া থাকে। তবে অতিভদ্র লোক হাতে ঝুলাইয়া কোনও দ্রব্য বহন করা লজ্জাজনক মনে করে। কোন কলেজের রসায়ণ বিভাগে ৪জন প্রফেসার, ২জন শিক্ষক (Demonostrator) ২জন সহকারী (Assistant) ও ৩ জন চাকর। যাহারা সহকারী ছিলেন, তাহারা ছাত্রদিগকে (Experiment) পরীক্ষণ দেখাইবার জন্য যন্ত্রাদি ও ঔষধ বাহির করিতেন চাকরেরা তাহা বহন করিয়া ক্লাসে লইয়া যাইত (মানহানির ভয়ে সহকারীরা সে কার্য্য করিত না)। Laboratoryতে (ফলিত রসায়ণের ঘরে) চাকর দিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত কারণ শিক্ষক ও প্রফেসারগণ কেবল ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতেন এবং সহকারীদ্বয় চাকর দিগকে খাটাইতেন এই ৩জন চাকরকে ৮জন মনিবের কাজ করিতে হইত বলিয়া তাহাদিগকে অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত; তা„ সত্ত্বেও রসায়ণ বিভাগের বিশৃঙ্খলতাও অপরিচ্ছন্নতা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। কিন্তু এই ১১জন ব্যক্তি যদি সাধ্য মত কায়িক পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত থাকিত তথায় শৃঙ্খলতাও সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান হইত।

ভদ্রাভদ্র ভেদের পর নারী নরের কর্ম্ম বিভাগের কথাই বলিব। একটি পরিবারে ধরুন্ ৫টী পুত্রও একটি কন্যা; বাটীর ভিতরের সমুদায়কর্ম্মই মাতা ও কন্যাকেই করিতে হয়, কারণ বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা, জল তোলা, রাঁধা প্রভৃতি পুরুষ জাতির নিষিদ্ধ কর্ম্ম (রসিক পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "এসব কর্ম্মে কি পুরুষত্বহানি হয়?") কোন পরিবারে স্বামী স্ত্রী ও ১টি ২বৎসরের সন্তান; যখন মাতা রন্ধনে নিযুক্ত আছে, তখন সন্তান মলত্যাগ করিয়াছে এদিক পিতার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে, তথাপি তিনি সন্তানকে পরিস্কৃত করিয়া লইতে বিরত থাকেন, কারণ এ কাজটি পুরুষের এলাকার ভিতর নহে।

কর্ম্মভেদে তিন প্রকার জাতি

উপরে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলাম যে কর্ম্মভেদ দ্বারা সমাজকে আমরা তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছি; (১) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি (২) ভদ্র ও অভদ্র (৩) নারী ও নর।

এই সব চিন্তা করিতে করিতে যখন জননীকুলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই যে মাতার নিকট সকল ভেদ মুছিয়া গিয়াছে। জননী সন্তানের ধাঙ্গড় মেথর ও ডোম। তিনি তাহার মলমূত্র, বিছানা, ঘর, পরিষ্কার করেন, ঘরের মৃত জীব জন্তু ফেলিয়া দেন। জননী সন্তানের ডাক্তার আবার নার্স নার্সের কাজ করিতে জননী-ডাক্তারের মানহানি হয় না। সন্তানের জন্য মা সকল কাজই করিতে পারেন; কোন আশ্রয় না থাকিলে মা সন্তানের জন্য ভদ্রতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ভার বহন করেন। সন্তান পিতৃহীন হইলে, জননী পুরুষের (পিতার) ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, অপরের বাটীতে দাসত্বও করিয়া থাকেন, সন্তানের জন্য মান-ইজ্জতও বর্জ্জন করেন। সন্তানের নিকট মাতা কত মূল্যবান্। তাহার নিকট মাতা যে সকল—জাতি, মাতা যে ভদ্র আবার অভদ্র, মাতা যে পুরুষ। সন্তানের সেবার জন্য মাতা যে নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। আমার মাতা যতদিন ইহধামে ছিলেন, ততদিন ত' তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারি নাই, তাঁহার মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এই পৃথিবীর জননীর মধুময় আচরণ, তাঁহার

আত্মোৎসর্গ দেখিয়া সেই জগৎ জননীর কথা স্মরণ হয়। ইহলোকের জননীরই যদি এত গুণ, তবে না কি সেই অনন্ত সর্ব্বগুণী, বিশ্ববিধাত্রী জননীর কত না গুণ। ভক্তিভরে তাঁহারই চরণে মস্তক অবনত হয়

অধ্যাপক—হৃদয় কৃষ্ণ দে, এম্ এ
বিদ্যাসাগর কলেজ

ঊনপঞ্চাশী।

পণ্ডিতজীর কেমন বদ অভ্যাস তাঁর ছেলেটাকে ইস্কুলে পাঠশালে পাঠাবেন না। ছেলেটা ষাঁড়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে পাড়া মাথায় করে বেড়াচ্চে। তার জ্বালায় গাছে পেয়ারা থাকবার জো নেই, লাউ মাচায় খুটি থাকবার জো নেই। বই হাতে দিলে তার ঘুম পায়, না হয় মাথা ধরে, না হয় পেট কামড়ায়। পণ্ডিতজীকে একদিন অনুনয় বিনয় করে বললুম—"দেখুন, আপনার ছেলে মুখ্যু হবে—এটা দেখতে শুনতে বড় খারাপ। ছেলেটার একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।" পণ্ডিতজী অম্লান বদনে উত্তর দিলেন—"লেখা পড়াটা আমাদের বংশে কেমন সয় না। আমরা সবাই না পড়ে পণ্ডিত। আমার বাবা যখন ছেলে বেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতেন তখন দাদা মশায় তাঁর শুভঙ্করীতে বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আচ্ছা বল দেখি, এক একটা শিয়ালের এক এক একটা লেজ হয়, তো ৫০টা শিয়ালের ক'টা লেজ হবে?' বাবা ধাঁ করে উত্তর দিলেন-'আজ্ঞে আমরা মন কষা পর্য্যন্ত শিখেছি, এখনও লেজ কষা শিখিনি।' দাদা মশায় রেগে বাবার কাণ মলে দিতে গেছলেন বলে ঠাকুর মা রাগ করে তিন দিন ভাত খান নি। শেষে রাগ যখন পড়লো, তখন তিনি হুকুম জাহির করলেন—'আমার ছেলে মুখ্যু হয় ত পণ্ডিতি করে খাবে ; তা বলে ওর গায়ে কেউ হাত তুলো না।' সেই হুকুম আমাদের বংশে এখনও বহাল রয়েছে। আমরা যখন মুখ্যু হই তখন পণ্ডিতি করে খাই।"

—বিজলী।

কিসে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় ?

অনেকেরই মুখে শুনিয়াছি—দূষিত জল খাইলে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়'। এই উক্তি ভ্রমাত্মক। সুতরাং কোনও বিষয়ে বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে এরূপ একটা ভুল ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয় নহে কেননা না জানিয়া অর্থাৎ ভ্রমপ্রসূত যে প্রতিবিধান চেষ্টা বা প্রতিরোধ চেষ্টা তাহা বিপথেই পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা। দূষিত জল সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় কিন্তু তাই বলিয়া দূষিত জলই যে ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করে এরূপ ভ্রম থাকা ভাল নহে। দূষিত জল পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে পারে না—অন্যান্য বহুবিধ সাংঘাতিক ব্যাধি আক্রমণের সম্ভাবনা আছে যথা কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি। ম্যালেরিয়ার জন্য দূষিত জল পরোক্ষভাবে দোষী কেন না ম্যালেরিয়ার-বিষ বাহক যে মশা তাহারই বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্র এই দূষিত জল। পচা খানা ডোবা, পুষ্করিণী অথবা খাল বিল এবং স্রোতহীন নদী ইত্যাদি যাবতীয় জলাশয়ই মশক বৃদ্ধির সাহায্য করে সুতরাং এই হিসাবে দূষিত জল দেশবাসীর পক্ষে অনিষ্টকর (অবশ্য মাত্র ম্যালেরিয়ার কথা লইয়া)।

বর্ত্তমান সময়ে ম্যালেরিয়ার জন্য, দূষিত জল অপেক্ষা ম্যালেরিয়া গ্রস্থ রোগী অনেক বেশী দায়ী ইহা মনে করিয়া রাখা উচিৎ। কেননা মশকবৃন্দ ম্যালেরিয়া বিষ লইয়াই জন্মায় না। তাহারা শৈশবাবস্থা হইতে যখন সবল ও দংশন ক্ষম হইয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্থ লোকের শোণিত পান করে তখনই তাহাদের শরীরে ঐ বীজ প্রবিষ্ট হয় এবং তারপর যখন এই বিষপূর্ণ মশা অপর সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে তখন এই দ্বীতিয় ব্যক্তির সুস্থ শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ সঞ্চারিত হয় এবং পর্য্যায়ক্রমে অপর সকলের মধ্যে ঐ বিষ মশক বৃন্দ দ্বারা পরিচালিত করিবার উপযোগী হইয়া পড়ে। সুতরাং যদি দেশবাসী সকলের কিছু কাল মশারির মধ্যে বাস করা সম্ভব হইত অর্থাৎ প্রত্যহ মশক দংশন দ্বারা নূতন নূতন মশার শরীরে বিষ প্রবেশ করিবার পথ বন্ধ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে

বিষযুক্ত মশাগুলির মৃত্যু হইলে দেশে আর ম্যালেরিয়া থাকিত না। অবশ্য যাহারা মশারির মধ্যে বাস করিতেছিলেন তাহারা সেই খানে বসিয়াই কুইনাইন খাওয়া উচিৎ এবং নিজেদের শরীরের ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট করা উচিৎ।

মশারির মধ্যে বাস করা অসম্ভব হইতে পারে কিন্তু ইহা হইতে এইটাই প্রমান হয় যে মশকের দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। পাতকুয়া বা ভাল ইদারার জল খাইলে কিম্বা যেমন অনেককে বলিতে শুনিয়াছি "বাড়ী গিয়ে শুধু ডাবের জল খাইলে" অথবা "পুকুরের জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাইলে" ম্যালেরিয়ার বিশেষ কিছু যাইবে আসিবে না। পুকুরের জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়া, কিম্বা ডাবের জল খাওয়া কিম্বা ভাল কুপের জল খাওয়া খুবই দরকার—তবে সে ম্যালেরিয়া ভয়ে নহে কলেরা জ্বরাতিসার ও আমাশয় ইত্যাদির ভয়ে ইহাই বক্তব্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, বি,।

মনের কোণে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিকাশ চিনিতে না পারুক, বৃদ্ধ এক দৃষ্টিতেই বিকাশকে চিনিয়া বলিলেন—আপনিই ?

বিকাশ সহাসনেত্রে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ বিভবশালী যুবকের কোমল হাস্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন—নমস্কার মশাই, নমস্কার। আপনার হাওয়া-গাড়ী না থাকলে সে রাত্রিটা আমাকে গারদ বাস করতে হ'ত।

বিকাশ হাসিয়া বলিল—গারদ বাস নয়, কষ্ট পেতে হ'ত।

যা বলেন—বলিয়া বৃদ্ধ রমণী বিশ্রামাগারের ভিতরে পা বাড়াইয়াই বাহির হইয়া আসিলেন; দৃষ্টিটা কক্ষের দিকেই রাখিয়া ডাকিলেন—নতুন বৌ!

বিকাশ শুধু নতুন বৌর হাতখানারই একাংশ দেখিতে পাইল। বাকীটা তাহার মনের মধ্যে কি রঙে ফুটিয়া উঠিল, কে জানে, সে মুখ ফিরাইয়া লইল। শুনিতে পাইল, টাকা ক'টা বাক্সয় তোল। গাড়ী এখন আসেনি, এলে তখন যাওয়া যাবে।

ফিরিয়া আসিয়া নাগ মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন—আপনার কতদূর যাওয়া হবে ?

বিকাশ বলিল—দেখি।

নাগ মহাশয় আর প্রশ্ন করিলেন না। তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীতেই তিনি বার বার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন যে কলকাতার লোকের চাল-চলন কথাবার্ত্তায় কেমন একটা হেঁয়ালীর ভাব মাখানো, সব জিনিষটা বুঝিয়া ওঠা অনেক সময়ে তাঁহার মত বয়েসী লোকেরও অসাধ্য ছিল। যাহারা ষ্টেশনে আসিয়া, মেয়েছেলেকে মেয়েলোকের ঘরে বসাইয়াও বলিতে পারে দেখি, তাহাদের সম্বন্ধে নাগ মহাশয়ের একটা চিরন্তন সন্দেহ ছিল। বিকাশের সঙ্গে আর কথা কহিবার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া তিনি একখানা সাজানো এঞ্জিনের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। পিত্তল ফলকে কি কতকগুলা কথা বিদেশী ভাষায় লেখা ছিল, নাগ মহাশয় দোকানদার লোক, ওসবের সম্পর্ক নাই, অক্ষর গুলির উপর চোখ বুলাইয়া কল কব্জায় দৃষ্টি দিলেন। সহজ বোধ্য চাকা-চাবীর গায়ে একটা হরপ না থাকিলেও তাহারাই যে এঞ্জিনগুলিকে দৌড় করাইয়া লইয়া বেড়ায় তাহা তিনি বুঝিলেন। সৃষ্টি-কর্ত্তাকে বোধ করি অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া কেবলমাত্র অদূরে জনতার দিকে ফিরিয়াছেন, উর্দ্দিপরা মুটেটি আসিয়া কহিল—চলিয়ে বাবু। গাড়ী লাগা হুয়া।

নাগ মহাশয় সসব্যস্তে সেই ঘরখানার দিকেই চলিলেন, বিকাশ মধ্য পথেই দাঁড়াইয়াছিল, একবার তাহার দিকে বঙ্কিম দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া বলিলেন—আপনাদের গাড়ীর দেরী আছে বুঝি ?

হাঁ না বিকাশ কিছুই বলিল না। বৃদ্ধ হীরককে পশ্চাৎ ও তোরঙ্গবাহী মুটাটাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ডনং প্ল্যাটফর্ম্মের উদ্দেশে প্রস্থান করিতেই বিকাশ মোটর সাইকেল ও ক্যামেরা ঘাড়ে মুটেটাকে ডাকিল, বলিল—চলো টিশান মাষ্টার সাবকো হুঁয়া!

বড়া ?

চলো, বড়া, উস্মে ক্যা হায়।

লোকটা চলিতে আরম্ভ করিল। বিকাশ আর একবার ৬ নম্বরের দিকে চাহিল। তখনও সেই ফিরোজা রঙে মোড়া হীরককে সে দেখিতে পাইল, কুলী বলিল—ঐ বড়া সাব্ আতা হায় ইধার।

বিকাশ গাড়ী খানা জমা রাখিবার পরামর্শ চাহিল। সাহেবটি আঙুল নাড়িয়া একটা দিক্ দেখাইয়া দিয়া কুকুরটিকে শিষ্ শিখাইতে শিখাইতে প্রস্থান করিলেন।

গাড়ী জমা দিয়া বিকাশ প্ল্যাটফরমে ঢুকিয়া গাড়ীর জানালাগুলিই দেখিয়া চলিতেছিল, ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের জানালার ধারেই তরুণী হীরক বসিয়া হাওড়া সহরটার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে, হঠাৎ বিকাশকে দেখিয়া তাহার মুখখানি আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিকাশ জিজ্ঞাসিল—সেখানে গিয়ে কেউ থাক্‌তে পারে ?

হীরক বলিল—কেন পারবে না !

বিকাশ মাথা নাড়িয়া বলিল—তা নয়। বিদেশী লোক গিয়ে কোথায় থাকে ? হোটেল টোটেল নেই ত ?

হীরক সহাস্তে কহিল—হোটেল ! সে কি সহর ?

এই সময়ে হন্ হন্ করিয়া এক ভদ্রলোক গাড়ীর কাছে আসিয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া ডাকিল—কৈগো ! মেয়ে গাড়ী আছে ও দিকে, চট্ করে' এস এই কুলী, কুলী……

দুই মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোকটি দুইটি রমণী ও গোটা দশেক তোরঙ্গ বাক্স পোঁটলাপুঁটলী নামাইয়া প্রস্থান করিল।

বিকাশ আবার গাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইয়া হীরকের দিকে ফিরিয়া বলিল—তবে আমি কোথায় গিয়ে থাক্‌ব ?

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং নিমেষ মধ্যেই গাড়ীখানাও নড়িয়া উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথম ঘণ্টা কখন্ বাজিয়া গেছে কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই, এক্ষণে গাড়ী চলিতে দেখিয়া বিকাশ সেই গাড়ীরই হাতলটা ধরিয়া উঠিয়া পড়িতেই হীরক বলিল—এ যে মেয়ে গাড়ী !

বিকাশ হাসিয়া বলিল—না। এটা পুরুষের গাড়ী !

গাড়ী ততক্ষণে প্ল্যাটফরমের বাহিরে আসিয়া গতিবেগ বৃদ্ধি করিতেছিল। দু'তিনটা ব্রিজ পার হইয়া যখন শব্দটা একটু কমিয়া গেল, হীরক বিকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—উনি এটা মেয়ে গাড়ীই ভেবেছিলেন।

বিকাশ হীরকের নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসিল—ভয় কি হীরক ?

হীরক স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিল—না, ভয় কি !

মুখে সে নির্ভয় উচ্চারণ করিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের কতকটা অংশ সংশয়ে ভরিয়া উঠিয়া তাহার মুখখানাকে ধীরে ধীরে বিমর্ষ করিয়া তুলিতেছিল—বিকাশ তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলিল—তোমার মা কোথায় হীরক ?

হীরক নতমুখে কহিল—কলকাতায়।

তোমরা তবে কলকাতাতেই আছ ?

হীরক মাথা নাড়িল।

বিকাশ জিজ্ঞাসিল—কাকীমা, হীরক ?

ওখানেই আছেন !—বলিয়া হীরক বাহিরে চাহিল।

বিকাশ অধীরভাবে কহিল—আমি এসে অবধি তোমাদের খবরের জন্য যে কত চেষ্টা করেছি তা কি বলব, কিন্তু কোথাও পাই নি !

হীরক মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসিল—কেন ?

বিকাশ বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া বলিল—তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ, হীরক ?

হীরক ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

এ-কথায় বোধ করি বিকাশ অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে হীরকের মুখের পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, গাড়ী কোন্ একটা ষ্টেশনে থামিতেই, হীরক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল আমায় একটা মেয়ে গাড়ীতে তুলে দিন্ না।

এখানে থাক্‌তে আপত্তি কি হীরক ?

না, না। মেয়ে গাড়ী ত আছে, ঐ লোকটি বলে গেল। আমাকে সেখানে রেখে আসুন-না।

বিকাশ বলিল—তুমি এখানেই থাক, আমি অন্য গাড়ীতে যাচ্ছি। বলিয়া সে দ্বার খুলিতেছিল, হীরক তাহার সামনে আসিয়া বলিল—আমাকেও রেখে আসুন।

সময় নেই। ঐ গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে !—বলিয়া

বিকাশ আবার সেইখানেই বসিয়া পড়িল। এবার আর সে হীরকের পানে ফিরিয়াও চাহিল না। এই নারী! এতই অসার, এতই হৃদয়হীন হৃদয় তাহার! সে যে ইহারই সংবাদের আশায়, ইহারই দর্শন কামনায় কত অমূল্য সময় সুখে নষ্ট করিয়াছে, কত সুখ দুঃখে গড়া বাল্যের কঠোর সুখস্মৃতিগুলি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কালাতিপাত করিয়াছে, সেই নারী!

বিকাশ এই কথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, যাক্ —একটা দুর্ভাবনার হাত হইতে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইহার সংবাদ পাইয়াছে, সম্ভবতঃ এ সুখেই আছে—এই-খানটা তাহার বুকটা ক্ষণেকের তরে একবার ছ্যাঁত করিয়া উঠিয়াছিল, তখনই সে উন্মাদনা বিকাশ দমন করিয়া বলিল —নিশ্চয়ই সুখে আছে! ঐ পরিপূর্ণ দেহ, ঐ নিটোল-সুন্দর মুখ, ঐ বিকশিত অপরাজিতাসম নেত্রদ্বয়—নিশ্চয়ই সুখে আছে। যাক্—আর কোন ভাবনা রহিল না। এবার নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কাযে মন দিতে পারা যাইবে।

যাহাদের বিশ্বাস মনকে এইরূপ আঁখি ঠারিয়া সংসারের বিচরণ পথ মসৃণ করা চলে তাঁহাদেরই আমি বলিতে চাই যে, তাহা একেবারেই সম্ভব পর নহে। মন মিথ্যা প্রবোধ তখনকার মত মানিয়া লইতে পারে কিন্তু সেই মনের পরীক্ষার সময় তাহার সেই পিপাসার্ত্ত শুষ্কমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ নগ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। ষোড়শী হীরকের কল্যাণ চিন্তায় বিকাশ যে মনঃপ্রাণ ভরিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতীতের অপব্যয়িত সময়টুকুর ক্ষতি পুরণাশায় তখনি নিজের কাযে লাগিবার সংকল্প স্থির করিয়া পরের ষ্টেশনেই গাড়ী হইতে নামিতে চাহিতেছিল, সেই মন, সেই প্রাণই নতাননা যুবতীর মুখের একটি কথায় সব উলোট্-পালোট করিয়া তাহারই ইচ্ছার তলে লুটাইয়া দিতে দ্বিধাও করিল না।

হীরক নতমুখেই বলিল—কাকীমা আপনার কথা বলেন!

বিকাশ একমুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আমি যে দু'বছরের জন্যে গেছলুম তা কি তোমরা জান্তে না, হীরক?

হীরক অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—জান্তুম।

তোমার মা, কাকীমা সবাই জান্তেন বোধ করি?

জান্তেন!

বিকাশ আরক্ত মুখে কি কথা বলিতে গেল, আবার না বলিয়াই চুপ করিল। হীরক তাহার এই ব্যাকুলতা এবং সংযম লক্ষ্য করে নাই সে আপন মনেই বলিল—তাই ত কাকীমা বলেন, আপনি ফিরে এসেছেন কি-না ..

তোমরা ত আমাদের সম্পর্ক রাখ-নি, হীরক!

হীরক বিকাশের মুখের দিকে চাহিল, কথা কহিল না।

বিকাশ আবার বলিল—আমি ত কাকীমাকে বলে গেছলুম হীরক যে দু'বছর পরেই আমি ফিরব।

তথাপি হীরক কথা কহিল না।

বিকাশ বলিতে লাগিল—এ কথা আর কেউ না জানুক, আমার মা'ও জান্তেন, তোমার কাকীমাকেও বলেছিলুম।

আমি জানি।

বিকাশ মুখ তুলিতেই হীরক বলিল—আপনি ত আমাদের বাড়ী জানেন, একদিন কাকীমার সঙ্গে দেখা করে আসবেন না। আপনাকে দেখ্‌লে তিনি সুখীই হ'বেন।

তোমার কাকীমা ওখানেই থাকেন?

আর কোথায় যাবেন? কাকাবাবু ত ··সে আর বলিতে পারিল না। আর তাহার প্রয়োজনও ছিল না। একটু পরে হীরক সিক্তকণ্ঠে কহিল—ওটা ত কাকীমারই বাপের বাড়ী। আমাদের বাড়ী বিক্রী হওয়া থেকে আমরা ওখানেই আছি। যাবেন একদিন? আমি তাহ'লে কাকীমাকে লিখ্‌ব?

না।

হীরক বিষণ্ণ মুখে কহিল—যাবেন না?

না। আর কি করতে যাব হীরক? হয়ত তোমার সঙ্গে আজ দেখা না হলে একদিন খুঁজে খুঁজে যেতেও পারতুম, আর তার দরকার নেই।

হীরক কথা কহিল না। বেঞ্চের উপর পা দু'টি গুটাইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। আর একজন লোক যে নির্জ্জনে, নীরবে তাহারই

নারী দেহের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্তরের পিপাসা মিটাইয়া লইতেছিল, সে তাহার কোন সংবাদই জানিল না। তবে সে বাহিরের কোন দৃশ্যই দেখিতে পাইতেছিল না। কোথাকার খানিকটা ধোঁয়া তাহার দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দিয়াছিল এবং সেই ধোঁয়ার পীড়াই তাহার দুই চক্ষে শতধারা বহাইয়া দিতেছিল।

বিকাশ অকস্মাৎ উঠিয়া আসিয়া বলিল—আমি শুধু তোমারই সংবাদ চেয়েছিলুম, হীরক। তুমি সুখে আছ, তুমি শান্তিতে আছ, এটুকু জান্তে পারলেই আমি সুখী হ'তে পারব! তাহ'লে আর তোমাদের দেশেও আমায় যেতে হবে না।

হীরক যেমন ওদিকে ফিরিয়া বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

উত্তেজনার ঝোঁক একবার বাড়িতে সুরু করিলে নিবৃত্ত করা যে কত দুঃসাধ্য তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। প্রশ্ন করিয়া বিকাশ কি উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল, কে জানে, কি জবাব পাইলে তাহার আকুলতা প্রশমিত হইত জানি না—হীরককে নিরুত্তর দেখিয়া তাহার মন অশান্তিতে ভরিয়া গেল।

সে আরও সরিয়া আসিয়া, একেবারে হীরকের বেঞ্চের নীচে বসিয়া পড়িয়া বলিল—শুধু ঐটুকু, হীরক! ঐটুকু! আমি জান্তে চাই তুমি সুখে আছ, তোমার কোন দুঃখ নাই। না হীরক, চুপ করে থাকলে চলবে না! একথা তোমায় বলতেই হ'বে। না শুনে আমি থাকতে পারব না! বল—সুখে আছ? আর কিছু না, ঐ একটি কথা, বল তোমার কোন দুঃখ নাই?

হীরক উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিয়া বলিল—কিসের দুঃখ?

কিন্তু ও-কি! তুমি—তুমি—বিকাশ সসব্যস্তে উঠিয়া আসিয়া জানেলা দিয়া হাত বাড়াইয়া হীরকের মুখখানি টানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল। হীরক দু'হাতে কাপড় টানিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিকাশ কাতরকণ্ঠে কহিল—মিথ্যে বল না, হীরক, মিথ্যে বল না।

হীরকের ক্রন্দন শব্দ ভেদ করিয়া শুধু একটা "না—না না—মিথ্যে না"—এইটাই তাহার কাণে গেল।

বিকাশ বলিল—তবে কাঁদ কেন হীরক?

হীরক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আপনি চলে গেলে আমাদের যে কত দুঃখকষ্ট গেছে!

আমি চলে গেলে?

কাকীমা জ্যেঠাইমাকে কি বল্‌তে গেছলেন একদিন। জ্যেঠাইমা—জ্যেঠাইমা তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমার মা—হীরক?

কাকীমা আপনার ঠিকানা চেয়ে ছিলেন...

তার পর?

তারপর—আর আমি বল্‌তে পারব না। সেই থেকেই পাড়ায় আমাদের মুখ দেখান ভার হ'য়েছিল। অন্য চারদিকের বাড়ীর মেয়েরা আমাদের দেখ্‌লে হাসিটিট্‌কিরী করত! লোকে...

বিকাশ প্রদীপ্ত নেত্রে চাহিয়া রহিল, কথা বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। হীরক অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে কহিতে লাগিল—কাকীমা যে আপনাদের বাড়ী গেছলেন, আপনার ঠিকানা চেয়ে ছিলেন—মা এ সবের কিছু জান্তেনই না, তবু জ্যেঠাইমা একদিন মা'কে ডেকে নিয়ে গিয়ে .....

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়া পড়িতেই বহু লোকের কলরবে ও ফিরিওয়ালার উচ্চ চিৎকারে সংজ্ঞা পাইয়া হীরক থামিয়া আবার মুখে কাপড় চাপা দিল। বিকাশ শেষ অবধি শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার ব্যাকুলতা মিটিবার পূর্ব্বেই অদূরে ঝুড়ি মাথায় একটা ফিরিওয়ালার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাগমহাশয়কে আসতে দেখিয়া সে কি জানি কেন—ওদিকের দরজা খুলিয়া টুপ করিয়া নামিয়া গেল।

নাগ মহাশয় ডাকিলেন—ও নতুন বৌ।

হীরক মুখ তুলিতেই নাগ মহাশয়ের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল।

হীরক চকিতে একবার কামরাটা দেখিয়া লইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—এটা পুরুষের গাড়ী,—আমায় মেয়ে গাড়ীতে নিয়ে চল।

না, গো. না এটা মেয়ে গাড়ীই।

ফিরিওয়ালা বলিল—কি নিবে বাবু?

নাগমহাশয় পত্নীর দিকে ফিরিয়া সস্নেহে বলিলেন—একটু কিছু খাও, নতুন বৌ!

না, না। আমি খাব না। তুমি আমায় অন্য গাড়ীতে নিয়ে চল।

নাগমহাশয় সাশ্চর্য্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—তাই চল। কিন্তু গাড়ী যদি ছেড়ে দেয়……

অন্য গাড়ী নেই? এর পরে?

নাগমহাশয় অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন—কেন? কেন?

হীরক ফিরিওয়ালাকে দেখাইয়া কহিল—ওকে যেতে বলে দাও-না।

সত্যি তুমি কিছু খাবে না? কখন্ সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছ ……

নাগ মহাশয় দ্বারের নিকটে আসিয়া লোকটাকে কি বলিলেন, সে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত, বিড় বিড় করিতে করিতে চলিয়া গেল। নাগমহাশয় বলিলেন—অন্য গাড়ীতে যাবে ত চল এই বেলা! দেরী হ'লে গাড়ী ছেড়ে যাবে যে!

হীরক শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল—থাক্—গে। তুমি যাও।

নাগমহাশয় ম্লানমুখে বলিলেন—তাহ'লে আমি এখানে থাক্‌ব? কেউ কিছু বল্‌বে না ত?

কি জানি!

এ কথায় নাগমহাশয় ভয় পাইলেন। কিন্তু কি করিবেন ভাবিয়াও পাইলেন না,—হীরক বলিল—জিনিষপত্র?

ও গাড়ীতে! আমি সেখানেই যাই—বুঝ্‌লে? না হয় পরের ষ্টেশনে এসে……

না, না তুমি এখানেই থাক। একা আমার বড় ভয় করে!

—গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বৃদ্ধ নাগমহাশয় সস্নেহে হীরকের গায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—ভয় কি হীরে?

'হীরে' সম্বোধনটি হীরকের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ইহা লইয়া অনেকে ঠাট্টা পরিহাসও করে কিন্তু হীরক তাহা গ্রাহ্য করিত না। সে ধীরে ধীরে সিক্ত মুখখানি স্বামীর কোলের উপর রাখিয়া বলিল—না, আর ভয় নেই।

নাগমহাশয় বলিলেন—এবার গাড়ী থাম্‌লে বাক্স-পেঁটরা গুলো এখানেই নিয়ে আসব। কি-বল?

তাই এনো—বলিয়া সে শ্রান্তভাবে শুইয়া পড়িল। নাগ মহাশয় উত্তরীয় প্রান্তে হীরকের চক্ষুর্দ্বয় মুছাইয়া দিয়া তাহার ডান হাতখানি হাতের মধ্যে পুরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ট্রেন আবার থামিল, নাগমহাশয় বলিলেন—এইবারে যাই, ওগুলো আনি।

পরের ষ্টেশনে এনো।

আচ্ছা—বলিয়া নাগমহাশয় হীরকের হাতখানি নাড়া চাড়া করিতে লাগিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে গাড়ী আর একটা ষ্টেশনে থামিতেই কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ ভিড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। হীরক উঠিয়া বসিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া লইয়া, বলিল—এইবারে আন।

নাগমহাশয় নামিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হীরক জানালায় মুখ বাড়াইয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল—উঠে পড়, উঠে পড়।

গাড়ী নাগমহাশয়কে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। বাহ্যজ্ঞান শূন্যা নারী অর্দ্ধেক দেহ বাড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া বলিতে লাগিল—ওগো, এখানে ওঠ, এখানে ওঠ—গাড়ী জোরে চল্লে আর পারবে না যে গো!

কিন্তু তাহার মুখের কথা হাওয়ায় চলিয়া গেল, নাগ-মহাশয় উন্মত্তের মত একবার করিয়া গাড়ীর দরজাগুলির দিকে অগ্রসর হন, আবার তখনি পিছাইয়া পড়েন, হীরক চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

অন্য যাত্রীদের সঙ্গে একটি যুবক ছিল, সে'ও বোধ করি ও পাশের জানালায় দাঁড়াইয়া সবই লক্ষ্য করিয়াছিল, হীর-কের উদ্দেশে কহিল—ব্যস্ত হ'বেন না, আমি গাড়ী থামাচ্ছি।

হীরক একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া আবার বাহিরেই দৃষ্টি মেলিল। গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইয়া গাড়ী থামিয়া গেল। যুবক বলিয়া উঠিল—ঐ যে তিনিও উঠেছেন দেখ্‌ছি—প্ল্যাটফরমে ত নেই!

লাল ঝাণ্ডি হাতে গার্ড ও সর্ব্বাঙ্গে তেল কালি মাখিয়া ড্রাইভার দু'জন দু'দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া লাফ্ মারিয়া গাড়ীতে উঠিয়া চক্ষু পাকাইয়া ইংরেজীতে কি বলিলেন। যুবক হাত নাড়িয়া ইংরেজীতেই তাহার জবাব দিল। গার্ড নামিয়া পড়িয়া আবার কি কহিলেন। ঠিক সেই সময়ে নাগমহাশয়ও আসিয়া বলিলেন- ভগবান রক্ষা করেছেন।

জনৈক বর্ষিয়সী মহিলা এতক্ষণ এই সব কাণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, একটু রাগতস্বরে এখন কহিলেন—সোমথ মেয়ে বাছা, তোমারও কি একটু হুঁস্ থাকতে নেই। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে বুড়ো বা......

গার্ড ঘরে ঢুকিয়া আবার কি বলিলেন; নাগমহাশয়ের দিকে চাহিয়া কেবল চোখের দৃষ্টি দ্বারা মনের রাগ বাহির করিয়া দিয়া প্রস্থান করিতেই নাগমহাশয় বলিলেন—সেই তিনি নতুন বৌ! হাওয়াগাড়ী......

হীরক জিজ্ঞাসিল—কে?

তিনিও এই গাড়ীতেই যাচ্ছেন যে! হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে আমায় টেনে তুললেন। তার পরেই ত গাড়ী থেমে গেল।

যে মহিলাটি মুখের কথা অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়াই বসিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে চাঁচা ছোলা গলায় বলিলেন—ভাগ্যে আমাদের নগু ছিল বাছা, নইলে তোমাকে যে মাঠের মধ্যে পড়েই থাকতে হত বাছা। তোমার মে...

'নগু' বিরক্ত হইয়া বলিল—নগু ত তোমার ভারী কাজ করেছে দিদিমা! সিগনল ত যে-সে টানতে পারে। ওর আবার বাহাদুরী কি!

নগুর অসামান্য বিনয় দর্শনে নগুর দিদিমা যে খুব খুসী হইয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না, তবে তাঁহার নিজের দলের দশ পনেরোটি স্ত্রী পুরুষের মধ্যে তাঁহার দৌহিত্রই যে কেবলমাত্র শিক্ষিত ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ ইহা প্রতিপন্ন করিতেই তাঁহার রসনা উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সমবেত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—দেখলে ত ইঁরুর মা, নগু আমার কেমনটি হ'য়েছে। গাড়ী থামালে, দু'দুটো গোরা পল্টনকে ডেকে ফস্ ফস্ করে কত কথা বলে দিলে! দেখলে ত গা মুখুয্যে গিন্নী, তুমি যে বড় বলেছিলে নগুর সঙ্গে বিদেশ যেতে আমার সাহস হয় না! কেমন দেখলে ত?—নগু কি আমার যে-সে ছেলে? অন্য লোক হ'লে ঐ গোরা পল্টনগুলো এতক্ষণে ঐ পঞ্চাশ টাকা আদায় করে তবে ছাড়ান দিত!

শ্রোত্রীবর্গের মনের ভাব নগুর প্রতি নিশ্চয়ই সে-সময় শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে ভরিয়া গিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু নগু অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল—ঐ জন্যেই তোমাদের সঙ্গে কোথাও যেতে চাই নে আমি। ভালো জ্বালাতন!

নগুর কথা শেষ হইতে, সকলেই সাশ্চর্য্যে চাহিয়া দেখিল, হীরক উঠিয়া আসিয়া নগুর দিদিমা'কে বলিতেছে-সত্যি দিদিমা, উনি না গাড়ী থামালে......

নগুর দিদিমা বুদ্ধি বিবেচনাশূন্য মুখুয্যে গিন্নীর দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—মাসে মাসে যে দশ গণ্ডা বার গণ্ডা টাকা খরচ করে' ওর মামারা ওকে কালিজে পড়ালে সে কি বৃথায় যাবে গা? ও যে বছরে বছরে জলপানি পায়......

হীরক কৃতজ্ঞ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—আমাদের বড্ড বাঁচিয়েছেন উনি, দিদিমা!

সে কথা আর বলতে বাছা! ও না থাকলে তোমার বুড়ো বা...

নগু বলিল আমি অন্য গাড়ীতে চল্লুম, দিদিমা! যত পার বক তুমি!

গাড়ীখানা ইতোমধ্যে থামিয়া গিয়াছিল। পাছে এতগুলি অসহায়া, অভিভাবকহীনা বর্ষিয়সীকে ফেলিয়া সত্যই নগু অন্য গাড়ীতে চলিয়া যায়, নগুর দিদিমা ভয়চকিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আর কিছু বলব না, নগু, বোস্, দাদা, বোস্।

অগত্যা নগু বসিয়া পড়িল। তাহার দিদিমা মুখুয্যে গিন্নীর উদ্দেশেই বলিতে লাগিলেন—অত যে লেখাপড়া শিখেছে, অত টাকা জলপানি পেয়েছে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে! তবে হ্যাঁ, সামনে বল্লেই নাতির আমার...

দিদিমা!—

আর ত কিছু বলি নি দাদা! সুখ্যাতিটি করবার যোটি নেই—এমনি ছেলে, বুঝলে গা মুখুয্যে গিন্নী!

নগু সত্য সত্যই দ্বার খুলিয়া নীচে নামিয়া পড়িল। তাহার দিদিমা বৃহৎ বৃহৎ দু'তিনটি পুটলী ধপাস্ ধপাস্

করিয়া এধারে ওধারে নামাইয়া ফেলিয়া যখন দ্বার সমীপে দাঁড়াইয়া ও দাদা, আয়—আয়—বলিয়া ক্রমাগত নাতিকে সম্বোধন করিতে করিতে বাহিরে চাহিলেন—তখন নগুর মূর্ত্তি আর কোথাও দৃষ্ট হইল না।

তাহার দিদিমা আকুলি বিকুলি করিতেছেন, মুখুয্যে গিন্নী বলিলেন— ও-যা ভালোবাসে না ভাই যখন তুমি ওকে না শুনিয়ে ছাড়বে না তখন ও বেচারা থাকেই বা কেমন করে বল?

তুমি বল্‌ছ কি গা মুখুয্যে গিন্নী! ও যে কোন্ গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল, কোথায় রইল...

ভয় কি গা নগুর দিদিমা! নগু তোমার লেখাপড়া করে জলপাণি পেয়েছে...

এমনই তোমার বুদ্ধি বটে বাছা! সাধে কি আর বলে লক্ষ টাকায় বামুন ভিখারী—এই বে-আক্কেলের জন্যেই বলে! এই ক'টি মেয়ে মানুষ আমরা একা, আর ওর ভরসাই ভরসা......

মুখুয্যে গিন্নী সত্য কথাই বলিলেন—দিনের বেলা, এক গাড়ী লোক, ভয় কি গা নগুর দিদিমা?

তা যা বলেছেন—বলিয়া নাগমহাশয় নগুর দিদিমার দিকে চাহিলেন। নগুর দিদিমা এই অসাবধান বৃদ্ধের ফোঁড়ন দেওয়া সহিতে না পারিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—তুমি আর নাক নেড় না বাছা! ভাগ্যে আমার নগু ছিল নইলে তুমিও পড়ে থাকতে, তোমার মেয়েটিও···

নাগ মহাশয় হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন; হীরক সকলের অসাক্ষাতে তাঁহার বাহুতে একটু চাপ দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল—চুপ!

নগুর দিদিমা কথাটাকে এই ভাবে শেষ করিয়া অন্য দিকে ফিরিলেন যে এতক্ষণে তোমার মেয়ের কান্নাকাটির জ্বালায় আমাদেরই অস্থির হ'য়ে পড়তে হ'ত।

হীরক নাগমহাশয়কে বলিল—এবার গাড়ী থাম্‌লে যেখানে আমাদের জিনিষপত্র আছে সেইখানে যাব।

নাগ মহাশয় সানন্দে কহিলেন—ঠিক বলেছ নতুন গিন্নী, তাই যাব।

গাড়ী থামিতেই নাগমহাশয় হীরককে সঙ্গে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। নগুর দিদিমা দ্বার সমীপে আসিয়া বোধ করি নগুর সন্ধানই করিতেছিলেন. ইহাদের নামিতে দেখিয়া বলিলেন—এইখানে বুঝি তোমাদের বাড়ী বাছা? —বাপের বাড়ী?

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া হীরক নামিয়া গেল।

চলিতে চলিতে নাগমহাশয় বলিলেন—মাগী কি জাঁহাবাজ, তা বল! আর ঢের ঢের ছ্যাচড়া মেয়ে মানুষ দেখিছি বাবা, অমন মাগী আমার এই সাড়ে তিনকুড়ী বছর বয়সের মধ্যে আর দেখিনি।

হীরক কথা কহিল না। তবে এই কথাটা তাহার মনের মধ্যে কোন এক স্থানে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু এ ভাব দমন করিতেও হীরকের অধিক কাল লাগে নাই। গাড়ীর সম্মুখে আসিতেই কে বলিয়া উঠিল—এই যে আপনি!

সঙ্গে সঙ্গেই নাগ মহাশয় মুখ তুলিয়াছিলেন, চক্ষের পলক না পড়িতেই হীরকের চক্ষু নত হইয়া পড়িল। নাগ মহাশয় কৃতজ্ঞ স্বরে কহিলেন—বড্ড বাঁচিয়েছেন মশাই আপনি!

লোকটি কি জবাব দিল, হীরক তাহা শুনিতে পায় নাই। গাড়ীতে উঠিয়া একখানা বেঞ্চের এক কোণে মুড়ি সুড়ি দিয়া বসিয়া পড়িতে, নাগমহাশয় তাঁহার রক্ষাকর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—আপনি এ গাড়ীতেই যাচ্ছেন বুঝি? তা বেশ—বেশ। কতদূরে যাওয়া হ'বে?

যাওয়া?—বিকাশ কি জবাব দিবে ভাবিতেছিল, নাগমহাশয়ের পূর্ব্ব কথা মনে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—আপনার মেয়েছেলে? তাঁরা বুঝি অন্য গাড়ীতে?

বিকাশ বলিল—মেয়েছেলে! মেয়েছেলে কেউ নেই।

নাগমহাশয় কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—কিন্তু সেই যে হাওড়ার ওটিং ঘরে ছিল।

বিকাশ বলিল—না। কেউ ছিল না আমার!

নাগমহাশয় আর কিছু বলিলেন না, অন্য দিকে মুখ করিয়া বসিলেন।

গাড়ীর আর এক কোণে চারজনে একযোড়া তাস পাড়িয়াছিলেন, অন্য আরোহীরা সব সেই দিকেই ঝুঁকিয়াছে—এদিকটা একদম খালি ছিল। মাঝে মাঝে তাদের

বাজীর এক একটা উত্থিত কলরব সমস্ত গাড়ীখানাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

হীরক নাগমহাশয়কে ডাকিয়া বলিল—উনি আমাদের চেনা লোক!

নাগমহাশয় বলিলেন—সে ত জানি গো!

হীরক আরও কিছু বলিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু আর একটা কথাও ভাবিয়া পাইল না। নাগ মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন—তোমার সঙ্গে কথা কন্?

হীরক বলিলেন—কন্ বৈ কি!

তবে ডাক না! তোমরা কথাবার্ত্তা কও-না—লজ্জা কি!—তিনি একটু থামিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন—আমি আছি তাই লজ্জা—বুঝি?

না—বলিতে গিয়া না পারিয়া হীরক মাথা নত করিল। নাগমহাশয় একটি মিনিট ধরিয়া হাস্য করিলেন; শেষে বলিলেন—দোষ কি! আপনার জন, চেনা শুনো লোকের সঙ্গে কথা কইতে দোষটা কি! ডাকব?

হীরক বলিল—ডাক।

নাগমহাশয় বলিলেন—ও মশাই, শুনছেন?

বল বিকাশ বাবু!

বিকাশ বাবু!

বিকাশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসিল—আমাকে?

আসুন না এদিকে!

বিকাশ এদিকে ফিরিতে হীরকের দু'টি চোখ দেখিতে পাইল। সে চোখের দৃষ্টিতে কি ছিল কে জানে—সে তৎক্ষণাৎ বেঞ্চি টপকাইয়া এদিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

নাগমহাশয় বলিলেন—আপনারা চেনা লোক, কথা বার্ত্তা ক'ন না। আমিও শুনি! আপনারা দু'জনেই সহরে লোক, আমি মশাই পাড়াগেঁয়ে আপনাদের কথা হয়ত সব বুঝতে পারব না, তা শুনতে দোষ কি, আর বুঝি না বুঝি শিখতেও ত পারব! এই দেখুন না, ওদিকের একটা গাড়ীতে এক বুড়ী এঁকে দেখিয়ে বল্লে—আমার মেয়ে! আমাদের গেঁয়ো লোক হ'লে কখন বলত না; তারাও সব সহরে কি না।

বিকাশ চাহিতে গিয়া দেখিল, হীরকের মাথাটা কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, আর নাগমহাশয়ের মুখখানি অত্যন্ত প্রফুল্ল, হাস্যরঞ্জিত। দেখিয়াই তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু বিষম ক্রোধের সময়েও মনোভাব গোপন করিবার মত শিক্ষা সংযম তাহার ছিল। সে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

নাগমহাশয় বলিতে লাগিলেন—তা সত্যি কথা বল্‌তে কি মশাই, সেই রকমই দেখায়।

একটু থামিয়া, আবার হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া লইয়া বলিলেন—এই জন্যেই নতুন গিন্নীকে নিয়ে আমি কোথায় যেতে আসতে চাই নে। আমার খুড়তুতো ভাই মাধবই আনত, রেখে আসত নতুন গিন্নীর কি বাই চাপলো, আমি ছাড়া আর কারু সঙ্গে আসবেন না। কাজে কাজেই বুঝতেই ত পারছেন……

বিকাশ তাঁহার হাসিতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবারেও সে তাহা অপ্রকাশ রাখিয়াই হাসিমুখে বলিল—আপনাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রকারও ঐ কথাই বলেছেন, নূতন নয়।

বলেছেন না-কি?—নাগমহাশয় হাসিতে লাগিলেন।

ট্রেণ ব্যাণ্ডেল জংশনে থামিল। "কোন্ ষ্টেশন, কোন্ ষ্টেশন" করিতে করিতে নাগমহাশয় উঠিয়া আসিয়া দ্বার সন্নিধানে দাঁড়াইতেই, হীরক মুখ অনাবৃত করিয়া বলিল—আপনিও এখানেই নাম্‌বেন?

বিকাশ সাশ্চর্য্যে কহিল—তোমরা?

আমরা সোমড়া যাব। আপনি ত এখানেই নাম্‌বেন?

বিকাশ—নাম্‌ব—বলিয়াই সোজা দ্বারের নিকট আসিল, নাগমহাশয় বলিলেন—এখানেই নাম্‌বেন্? নমস্কার মশাই, নমস্কার। আমাদের মশাই এখনো অনেক দূর যেতে হ'বে। চার পাঁচটা ষ্টিশান্ ত বটেই, তারপর আবার গরুর গাড়ী, সেও দু'তিন ঘণ্টার ধাক্কা! আমাদের কলকাতা আসা-যাওয়া কষ্টের একশেষ বুঝলেন না। গরুর গাড়ীতে তিন ঘণ্টার পথ যেতে—অদূরে উপবিষ্ট পত্নীর পানে চাহিয়া বলিলেন—প্রথমবার ত উনি গিয়ে তিন দিন বিছানা থেকেই উঠতে পারেন নি! কি আর করা যাবে বলুন, পাড়া গাঁর লোক আমরা! পাড়া গাঁ আপনি দেখেছেন মশাই?

না।

নাগমহাশয় বলিতে লাগিলেন—ভালোই করেছেন মশাই। আপনাদের দেখবার মত নয়।

আমার কিন্তু দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।

হয়? দেখ্‌বেন? তা চলুন আমাদের সঙ্গে—দেখে আস্‌বেন, অনেক দিন মনে থাকবে। শীগ্‌গির যে ভুলতে পারবেন তার যো'টি নেই!

হঠাৎ হীরক মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—হাঁা, একবার ম্যালেরিয়ার ডিপুতে নিয়ে চল, সহরের লোকটিকে! তাহলেই হয়।

নাগমহাশয় ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন—কোথায় ম্যালেরিয়া নতুন বৌ! আমাদের গাঁয়ে ম্যালেরিয়া আছে?

হীরক বলিল—নাঃ। থেকে কাজ কি! ঘর ঘর জ্বর, পেট্‌পেট্‌ পিলে……সে ম্লান হাসি হাসিল।

নাগমহাশয়ের বুকে দেশের নিন্দা গুরুতর ভাবেই আঘাত দিয়াছিল, তিনি কাতর স্বরে বলিলেন—শুনেছ তুমি?

হীরক হঠাৎ স্বামীর মুখের কাতরতায় সচেতন হইয়া বলিল—ওখানে যদিও না থাকে, পাড়া গাঁয়ের অনেক যায়গাতে যে ম্যালেরিয়া আছে তা আর না শুনেছে কে বল?

তাই বল—নাগমহাশয় একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তাই বল! না মশাই, আমাদের ওখানটা অজ পাড়াগাঁ বটে, ম্যালেরিয়া নেই। নির্ভয়ে আস্‌তে পারেন!

বিকাশ এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই সব শুনিতেছিল। হীরকের অবাধ সহজ ভাবটিতে সে প্রথমটা আরামই অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু এই সময়ের একটি কথাতে তাঁহার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

ঘণ্টা বেজে গেল যে, গাড়ী ছাড়ছে!

—শুনিয়াই বিকাশ নামিয়া পড়িল। ও কোণে তাসের বাজীতে এক পক্ষ "ব্যোম" ধরিয়া বিরাট হুঙ্কার ছাড়িল।

নাগমহাশয় বলিলেন—তাহলে একবার আস্‌বেন, বুঝ্‌লেন?

বিকাশ কি উত্তর দিল, "ব্যোমের" শব্দ ভেদ করিয়া তাহার কথাগুলা আর কাহারই কাণে আসিয়া পৌছিল না।

প্রথম ঘণ্টাই বাজিয়াছে, ট্রেণ ছাড়িবার তখনও দেরী ছিল। নাগমহাশয় নিশ্চিন্ত হইয়া সেই তাসের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

———

(৪)

মাধব নাগ সম্পর্কে নাগ মহাশয়ের খুড়তুতো ভাই। নাগমহাশয়ের বিশেষ অনুগত।

মাধব ষ্টেশনে গরুর গাড়ী ও দুইটা হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া নাগমহাশয়ের অপেক্ষা করিতে ছিল,—ট্রেন থামিতেই ইঁহাদের নামাইয়া লইয়া হাসিমুখে কহিল—ভালো ছিলে ত গো?

হীরক মাথা নাড়িয়া জানাইল, ছিল। সে ঘোমটা একটু দীর্ঘ করিয়া দিল।

মাধবের সঙ্গে নাগমহাশয়ও বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হীরক চিরদিন মাধবের সঙ্গে কথা কহিয়াছে ঠাট্টা রহস্যের সম্পর্ক ধরিয়া ব্যঙ্গ করিয়া আসিয়াছে, আজ হঠাৎ তাহাকে অবগুণ্ঠন টানিতে দেখিয়া বিস্মিত না হইবে কে?

মাধব বলিলেন—নতুন বৌ সহর থেকে নতুন হ'য়ে এসেছে, হারু দা!

হারু দা একটুখানি হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। অল্পক্ষণ পরে মাধব বলিল—নাথেদের দোকানে হঠাৎ পরশু রাত্রে আগুণ ধরে……

নাগমহাশয় চিৎকার করিয়া বলিলেন—আগুণ ধরে। আমার যে ওখানে অনেক টাকা জমা দেওয়া আছে, মাধব।

মাধব অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল—কত টাকা হারু দা?

অনেক রে ভাই অনেক! ও মাধব,

কি?

তুমি এক কায কর ভাই। এদের নিয়ে এসো। আমি বলাগড় ঘুরে আসি।—বলিয়া সসব্যস্তে কোঁচার খুঁটে আবদ্ধ টিকিট দু'খানি বাহির করিয়া ছোট মাষ্টার বাবুর হাতে দিয়া চলিবার উপক্রম করতেই হীরক সরিয়া

আসিয়া বলিল—এখন নয়। আগে বাড়ী গিয়ে একটু জিরিয়ে......

নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন—না নতুন বৌ! জিরুতে পারব না। আমার সর্বস্ব যে তাদের ঘরে!

তা হোক্। বাড়ী চল।

নাগমহাশয় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন—কি পাগলের মত কথা বলছ নতুন বৌ! আমার যথা সর্বস্ব......

হীরক বাধা দিয়া বলিল—সে আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়ব না। আগে বাড়ী চল; তার পর না-হয় ঐ গাড়ী খানা করেই যেয়ো।

আবার অনর্থক কতকগুলো পয়সা দেব? এখান থেকে কোশ্ দুই বৈ ত নয়, সেরেই কেন আসি না?

সমস্ত দিন গাড়ীতে না শুয়ে না বসে এসেছ; না একটু জল না কিছু, পেটে পড়েছে এরকম অবস্থায় কিছুতেই আমি তোমায় যেতে দেব না। পয়সা আগে না প্রাণ আগে?

নাগমহাশয় এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন—ও মাধব, কি করি ভাই?

মাধব অন্যদিকে মুখ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল—যা বোঝ।

হীরক বলিল—ঠাকুরপোকে বল-না, উনি খবরটা নিয়ে আসুন।

মাধব নিজেই এ কথা শুনিতে পাইয়াছিল, সে মুটে দু'টিকে সঙ্গে লইয়া ফটক পার হইতেছিল, নাগমহাশয় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—একটু কষ্ট স্বীকার না করলে ত চলছে না ভাই!

এ আর কষ্ট কি হারু-দা! তবে কি না আমার সেই গেঁটে বাক্সটা......

তবে আর কি হবে? চলো, বাড়ী থেকেই আসব'খন।

নাগমহাশয় ও হীরক গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই মাধব বলিল—ওরে হাবু, তুই বাপু হেঁটেই চল্—গাড়ী আমিই হাঁকিয়ে যাচ্ছি। জানিস্ ত কি রকম ছুপ্‌ছি গাঁটের বাক্সটি নিয়ে!

হাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিল—তাই ওঠ, কর্ত্তা!

নাগ মহাশয় খড় বিছানো সতরঞ্চ ঢাকা বিছানায় শুইয়া পড়িলেন; হীরক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাধব হেট্ হেট্ টো-টো শব্দে ক্রমাগত বলদ দুইটির লাঙ্গুল মর্দ্দন করিতে লাগিল।

ঘণ্টা খানেক পথ চলিয়া মাধব ভিতরের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিল—দাদা কি ঘুমুলেন, নতুন বৌ?

হীরকেরও বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছিল, সে মাথা নাড়িল। কথা কহিল না।

মাধব বলিল—তুমিও যে ঢুলছ নতুন বৌ!

হীরক এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

মাধব একবার এহাতে একবার ও হাতে গরু দু'টিকে আধ মারা করিয়া বলিল—আমরা বুঝি নূতন লোক হলুম গো?

হীরক নীরব। মাধব মনের খেদে বলিতে লাগিল—এমনই সহরে লোকের ব্যাভার বটে!

হীরক একটুখানি নড়িয়া বসিল, কিন্তু মুখে সে একটি কথাও বলিল না।

মাধব আর একবার চতুষ্পদ দুইটিকে সবেগে চলিবার ইঙ্গিত করিয়া কহিল—আমি কোথায় কত আশা করে ইস্‌টিশানে এলুম, নতুন বৌ আসছে, কতদিন পরে দেখা শুনো হ'বে নইলে ত গাড়ীখানেই শুধু পাঠিয়ে দিতে পারতুম, তবু এলুম কেন গো—তুমি আসছ বলেই ত! না-কি?

নাগ মহাশয় সত্যই নিদ্রিত হন্ নাই। নাথেদের আড়তে যে হাজার টাকা দাদন দেওয়া আছে তাহারই দুশ্চিন্তায় তাঁহার মনঃ প্রাণ তখন ভরিয়াছিল। নীরবে মুদ্রিত নেত্রে মনে মনে তাহারই ভাঙ্গ গড় করিতেছিলেন, মাধবের দুঃখে তাঁহার হৃদয়টি গলিয়া গেল। বলিলেন—সত্যি নতুন বৌ, এ তোমার অন্যায়!

দৃপ্ত স্বরে হীরক বলিল—তুমি শুয়ে আছ, শুয়ে থাক।

নাগ মহাশয় আর একটি কথাও কহিলেন না। কিন্তু মনটি তাঁহার এতই অশান্ত হইয়া উঠিল যে তিনি আর কোন দিকে চাহিতে না পারিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মাধব বোধ করি সেই ধরণের লোক যাহারা বিপদ কালেও

অধৈর্য্য হইয়া নিজের লক্ষ্যচ্যুত হয় না; সেই সব দলেরই একজন সে, যাহারা মনের পাপ পুণ্য, রাজ্যের দুরভিসন্ধি গোপন করিয়া হাসিমুখেই বিচরণ করিতে পারে, যাহাদের মুখের আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরের পরিচয় পাওয়া বোধ হয় অন্তরযামীরও অসাধ্য ছিল,—মাধব হাসি হাসি মুখে কহিল—আমরা পাড়াগেঁয়ে মনিষ্যি দাদা……

দাদাকে নির্ব্বাক দেখিয়া মাধব আর বলিল না। একবার সে হীরকের দেহের দিকে চাহিয়া লইয়া নিজমনে গাড়ীর গতি বৃদ্ধি করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

যুগলকিশোর নাথ নাগমহাশয়ের বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, গাড়ী থামিতেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—নাগমশাই গো!

নাগমশায় সসব্যস্তে নামিয়া পড়িয়া বলিলেন—নাথ মশাই?

হ্যাঁ—আমি যুগল। বড়ই দুঃসম্বাদ,—নাগম'শাই।

নাগমশায়ের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। গাড়ীর ছত্রি ধরিয়া বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নাথমহাশয় বলিতে লাগিলেন—সকাল বেলায় মাধব খুড়োর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, তাঁরই মুখে শুনলুম আপনি বিকেলের গাড়ীতে আস্‌বেন, শুনে তাঁকেও বলে দিয়েছিলুম যে, আমিও সন্ধ্যেবেলা থাকব'খন। যে বিপদ হ'য়ে গেল!

লোকটার বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে নাগ মহাশয়ের জীর্ণ বুকের অস্থিপঞ্জরগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, দু'টী কাণের মধ্যে রাজ্যের অশ্রান্ত ঝঙ্কার ঢুকিয়া সর্ব্বাঙ্গ অবশ করিয়া ফেলিতেছিল, তিনি কোন মতে দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন।

মাধব খুড়ো বল্লেন বটে যে দাদা এলে আমি সব বলব, নাথমশাই, আপনাকে কষ্ট ক'রে আস্‌তে হবে না আর, আমি কিন্তু বল্লুম তা কি হয় গো? লোকটা একে আস্‌ছে বিদেশ থেকে তেতে পুড়ে, শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে যে! আমি আসব।

নাথমশাই, তাই পড়েছে। মাথায় আমার আকাশ ভেঙ্গেই পড়েছে।

নাথমহাশয় অশ্রুপুরিতস্বরে বলিলেন—আর জন্মে কত পাপ করেছিলুম নাগমশাই, নইলে ঘর দোরই বা পুড়বে কেন? ব্রহ্ম হত্যা গো হত্যার পাপ ছাড়া কি অমন সর্ব্বনাশ কারু হয়?—ভদ্রলোক বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন—কিন্তু আপনাকে একটু দয়া করতেই হ'বে নাথ মশাই, নইলে আমি একেবারে মারা পড়ব। আসলটি আপনার আমি দিতেই এসেছি, সুদটা কিন্তু আমায় রেহাই দিতে হ'বে দয়া ক'রে! অবিশ্যি দু'বছরে অনেকগুলো টাকা জমে গেছে কিন্তু সে আর আমি দিতে পারব না।

নাগ মহাশয় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এমনই একটা ভয় হইয়াছিল যে এ কথার পরেও তাঁহার কাণ দু'টিকে তিনি প্রকৃতই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। নাগমহাশয় ইহাকেই অসম্মতি কল্পনা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিয়া নাগমহাশয়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—একান্তই না ছাড়েন যদি কিছু সময় দিন আমাকে। নইলে কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে আমাকে গাছতলায় দাঁড়াতে হ'বে। দু'মুঠো ভাতের জন্যে মারা যাবে!

নাগমহাশয় উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিলেন—আমার আসল?

এই যে—বলিয়া ভদ্রলোক লাল খেরো জড়ানো দশখানা নোট বাহির করিয়া দিলেন; বলিলেন—রসিদটা একদিন এক সময়ে এসে নিয়ে যাব।

এখনি নিয়ে যান।…নতুন বৌ, মেয়ে এস ত।

না, না, এখনই কেন? অন্য একসময় এসে নিয়ে গেলেই হ'বে। আপনাকে ত আমার অবিশ্বাস নেই, নাগ মহাশয়!

হীরক নামিতে নামিতে অনুচ্চ মৃদুস্বরে কহিল—ওঁকে বস্‌তে বল। রসিদ এখনি বের করে দিচ্ছি।

নাগ মহাশয় সেই কথাই জানাইলেন। অগত্যা নাথ মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া বসিলেন।

বৃদ্ধ হারাধন ডাকিলেন—মাধব বোস্ ভাই, আস্‌ছি। —কিন্তু মাধবের সাড়া পাওয়া গেল না।

হীরক একটা কাঠের সিন্দুক খুলিয়া একখানি কাগজ হারাধনের হাতে দিয়া বলিল—সুদ নেবে না-কি?

নিতে ত চাই। গচ্ছিত রাখা ত সেই জন্যেই, কিন্তু

দিতে যখন পারবেন না বলছেন তখন আর কি করি বল? নাথ ম'শাই পারলে কখনই অমন করে বলতেন না, ওর মত ধর্ম্মভীরু লোক আর অঞ্চলটে নেই নূতন বৌ! যাক্—আসলটা যে যায় নি, এই যথেষ্ট! মাধব ষ্টিশনে যে রকম ভয়টা দেখিয়ে দিলে, আমার ত ভয়ে প্রাণটা উড়েই গেল যে মূলে হা-ভাত না-হয়!

হীরক বলিল—ওর ভয় দেখাবার কারণ বুঝলে না?

নাগমহাশয় চিন্তিত মুখে কহিলেন—ছেলে মানুষ, বুঝতে পারে নি হ'বে।

যত ছেলেমানুষ তুমি ভাব ওকে, ঠিক তত-টি উনি নন্।

এবার নাগ মহাশয় হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—পাগল! ওর আর বয়েস কি! বাড়ন্ত গড়ন তাই ও-রকম মদ্দটা দেখায়। ওকে যে আমি জন্মাতে দেখেছি......

সে ত অনেকেই অনেককে দেখে থাকে।

হা-হা! ওর বয়স আর কত? তোমার চেয়েও দু'এক বছরের ছোটই হ'বে। এই ধর না, ১১ সালে আমার দ্বিতীয় পক্ষের কাল হয়, তার এক বছর পরেই ওকে প্রসব করে' ওর মা মারা যান, তাহ'লে কত হল, হিসেব করলেই···

হীরক বিরক্ত হইয়া বলিল—হিসেবে আর কায নেই! তোমার নাথমশাই বসে আছেন, তাঁকে রসিদটা দিয়ে এস।

যাই। আর সুদটা তাহ'লে?

এই যে বল্লে ছেড়ে দেবে?

তাই দিই—কি বল?

আমি আবার কি বলব? উনি যখন অপারক, তুমি জান বলছ।

সত্যি—বলিয়া নাগমহাশয় প্রস্থান করিতেই অন্ত একটা দরজা দিয়া মাধব ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দিদি আসছে গো! রাত্রে আর রান্না বান্নার কৈজুত করো না যেন, গরীব মাধবের ঘরে যা দু'টি জুটবে—তাই হ'বে। দিদিকে সেই খবর দিতেই আমি ছুটে গেছলাম। তিনিও আসছেন এখনি! যাক্ ভাই, একটা মস্ত ভাবনা কেটে গেল। অতগুলি টাকা গেলে কি আর দাদা বাঁচতেন, শোকেই প্রাণটা বেরিয়ে যেত। তবে মিছে সুদটা বোধ হ'চ্ছে ফাঁকী দেবে।

ফাঁকী দেবেন না! অপারক, দিতে পারবেন না।

এই প্রথম হীরক কথা কহিল। মাধব পরম সন্তুষ্ট মনে কহিল—অপারক, বলেছে বুঝি! তুমিও যেমন নতুন বৌ!

দাদার স্ত্রীকে সহরে বৌ-দিদি বলে।

জানি গো জানি! সহরের কথা ছাড়ান দাও।

তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট, জান ঠাকুরপো?

মাধব অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—কে বল্লে? —ক্ষেপেছ! ছোট কক্‌খনো হয়। এক বয়সী হ'তে পারি বটে!

হীরক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—না, তুমি ছোট। তোমার দাদা বলেছেন।

দাদা! হাকন্দা?

হীরক পুনশ্চ কহিতে লাগিল—বৌ-দিদি না বল্লে তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কইতে পারব না!

মাধব কি একটা কথা বলিতে গেল, কিন্তু বলিবার আগেই নাগমহাশয় ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিলেন—এই যে! কি কথা হ'চ্ছে দু'টিতে গো!

মাধব দাদার মুখের প্রশান্ত হাস্যে সাহস ও অভয় পাইয়া প্রসন্নকণ্ঠে কহিল—নতুন বৌ-কে বলতে এসেছিলুম, দাদা, যে ঘরে আজ আর রান্নাবান্নার হাঙ্গামা কর-না, দিদি ওখানেই তোমাদের জন্যে রাঁধাবাড়া করছেন।

বেশ ত ভাই।

তা নতুন বৌ বলছেন—বৌ-দিদি না বল্লে আমার সঙ্গে উনি কথা কইবেন না!

নাগমহাশয় হাসিয়া বলিলেন—ও একই কথা!

হীরক—একই কথা নয়—বলিয়া ত্বরিতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নাগমহাশয় একবার তাহার পানে একবার বিমর্ষ মুখ মাধবের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে ক'দিনের পরিত্যক্ত হুঁকা কলিকার সন্ধানে বহির্বাটিতে গমন করিলেন।

মাধব মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া ছিল,—হীরক তখনি ঘরে

ঢুকিয়া নতমুখে বলিল—তোমার দিদিকে বল গে ঠাকুর পো, আমি এখানেই রাঁধব।

মাধবের চৈতন্য যেন ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে হীরকের মুখের পানে একটা তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—কেন বলত? আমরা কি হাঁড়ী, মুচী, ডোম্ ডোকলা যে আমাদের ঘরে খেলে তোমার মত নৈকষ্যি কুলীনের জাত যাবে!

মাধব হয় গাঁজা, নয় সিদ্ধি, না-হয় তীব্র মদ খাইয়াছিল, নতুবা এ-সময়ে হীরকের চোখের জ্বালাপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে নিশ্চয়ই সে স্থির থাকিতে পারিত না। কিন্তু সে তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া পুরা দুই মুহূর্ত্ত হীরকের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া শ্লেষপূর্ণস্বরে আবার বলিল—কলিতে ভালো কারো করতে নেই কি বল গা নতুন-গিন্নী! আমি কোথায় মরি হা—নতুন বৌ নতুন-বৌ করে, কতদিন পরে এসেছ, বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আদর করে সামনে বসে একটু খাওয়াব দাওয়াব, তা'তেও বঞ্চিত করবে! কেন খেলে কি হ'ত? জাত যেত না……

হীরক তাহারই মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তিক্তকটু কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ, জাতই যেত! হাজারবার যেত! তোমার বাড়ীতে যাওয়ার চেয়ে মুচী মুদ্দফরাসের বাড়ী যেতে আমার আপত্তি নেই, ডোম-ডোক্লার বাড়ীও খেলে আমার জাত যাবে না, কিন্তু তোমার বাড়ী যেতেও পারব না, আমি খেতেও পারব না।

মাধবের চক্ষু দু'টী হইতে খানিকটা আগুন বাহির হইয়া গেল, আরও খানিকটা গলার মধ্য দিয়া বহির্গমনোদ্যোগ করিতেছিল, মাধব জিজ্ঞাসিল—আমি মুচী মেথর মুদ্দফরাসেরও অধম?

এ কথা আবার জিজ্ঞেস্ করছ! নিজে জান না তুমি কি?

আমি কি?

সে আমি বলব না, বলতে পারব না। আর বল্লেও হয় ত ঠিক তুমি যা—তা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। তুমি কি, সে তুমিই জান; আর আমার চেয়ে ভাল করেই তুমি বলতে পারবে।

মাধব রক্তচক্ষে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল—বটে! এতদূর!

সে আরও কি বলিবার চেষ্টা পাইতেছিল, কিন্তু হীরক তৎপূর্ব্বেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আর একটি কথা না কহিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

মাধব কালো মুখ আরও কালো করিয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

মৃত্যু

এমন তাজা দাঁড়িয়ে আছি এমন বলবান,
মরবো আমি! সে কি কথা! আমার অবসান?
শোণিত বহে, শক্ত পেশী, অস্থি প্রাচী ঘেরা
এমন দেহ হতে পরাণ পালাবে, নয় ফেরা?
দীপ্ত চলন, মত্ত ভাষা, দীপ্ত হেন দেখা—
মৃত্যু পরশ মাত্রে এরা লুটবে একি লেখা!
বুকের মাঝে ক্ষিপ্র গতি পরাণ আলোড়িছে,
এমন প্রবল এতই চপল, বাঁচাটাকি মিছে?
এত বয়স এই ধরাকে আঁকড়ে করি মিতে,
মৃত্যু শুধু ডাক দিলে কি হবেই ছেড়ে দিতে?
মরবো কেন, থাম্‌বো কেন, চলছি এত জোরে,
একটি ডাকে পালাবে প্রাণ, রাখবু যারে ধরে'?
লুটিয়ে যাব কে বলে রে, টলছে তেজে দেহ,
মরণ এলে মারবো লাথি, মারতে নারে কেহ।
এ দেহত ছাড়বো নাক, ছাড়বো নাক ধরা,
স্বর্গসম দেহেতে প্রাণ বদ্ধ, নহে মরা।

শ্রীপ্যারী মোহন সেনগুপ্ত।

বৃহৎ আলু

ডাবলিনের এক চাষার ক্ষেতে এক একটি আলু উৎপন্ন হইয়াছে ওজনে দুই সের। আরও মজা এই ক্রেতা একটি আলু লইয়া দুই সেরের দাম দিয়া চলিয়া যান; ওজনের প্রয়োজন হয় না।

কুশদহ-সমিতি

কুশদহ-সমিতির ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন স্থান কাল নির্ণয় সম্বন্ধে প্রস্তাব। কুশদহবাসী সকলে জানেন সমিতির ১ম, ২য়, এবং ৩য় বার্ষিক অধিবেশন সংবাদ। যথা ক্রমে ইছাপুর, খাঁটুরা দত্তবাটী এবং গোবরডাঙ্গা জমিদারবাটী। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আগামী বর্ষের স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়াই প্রার্থনীয়। কিন্তু সমিতির অবস্থানুসারে এই তিন বৎসরে সেরূপ হয় নাই। তাই কেহ কেহ দুঃখের সহিত বলেন, "দেশ যে এখনও জাগে নাই। সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এ পর্য্যন্ত স্থান কাল নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন স্থান—সময় শীঘ্র স্থির হওয়া আবশ্যক। এবার কার্য্যের একটি সুবিধা হইয়াছে—এই "কুশদহ" পত্রিকা বাহির হইতেছে তাই আমরা প্রস্তাব করিতেছি—কুশদহবাসী মাটকোমরা, ঘোঁজা, চৌবেড়ে অথবা হাবড়া-টাবাবেড়ে গ্রামবাসী মধ্যে এমন কেহ কি নাই যিনি বা যাঁহারা সমিতিকে নিজগ্রামে অধিবেশন জন্য আহ্বান করেন? অবশ্য এবার সমিতির অধিবেশন ক্ষেত্রে তৎসঙ্গে যে শিল্প কৃষি প্রদর্শনী হয় তাহা হইবে না। কারণ এবার বারাসাত সাবডিভিসনের উপর গবরমেণ্ট তরফ হইতে প্রচুরায়োজনে তাহার কার্য্য হইবে। তবে সমিতির পক্ষ হইতে কেবল কুশদহ জাত ফল-শস্য দেশী তাঁতের কাপড় গামছা চরকারসুতা প্রদর্শনের ব্যবস্থা এবং তৎসহ কেবল দেশী জিনিষের কেনাবেচা মেলা ও তুলার বীজ বিতরণ হইতে পারে। এ বিষয় সমিতির কলিকাতাস্থ কার্য্যালয়ে সম্পাদকের নিকট প্রস্তাব করিলে আশাকরি সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষ আনন্দিত হইবেন।

ঘরের কথা

দেশ কি জাগিবে না? বিশ্বাসী ব্যক্তি ভিন্ন একথার উত্তর কে দিতে পারেন? ৩য় বার্ষিক অধিবেশন ক্ষেত্রে লেখা ছিল, "ঐ দেখ, আশার আলোকে জাগ্রত কুশদহ" সে ক্ষেত্রে কেহ কেহ ঐ বাণী যেমন উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, পরে আর তেমন ছিল না। ঐ লেখাটী কি কেহ রচনা করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন? না, উহা মানসিক কল্পনায় রচিত বাণী নয়। উহা স্বতঃসিদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশিত ভগবানের প্রেরিত বাণী। অনুরাগীর—হৃদয়ে আশার আলোকে বিশ্বাসের কথা যুগে যুগে দেশে দেশে ভগবান প্রেরণ করিয়াছেন, দেশের দুর্দ্দিনে কোথায় এক পল্লিতে—শান্তিপুরগ্রামে বসিয়া শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য প্রার্থনা করিতেছিলেন দেশে ভক্ত এবং ভক্তি অবতীর্ণ হউক। তার ফলে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। উপমা গুরুতর হইলেও উপায় নাই; সত্য বলিতে সত্যই বলিতে হইবে।

দেশ কি জাগিবে না? বিশ্বাসী বলেন, জাগিবে। আবার প্রশ্ন হইল, প্রমাণ কি? উত্তর; প্রমাণ প্রত্যক্ষ। ঐ দেখো কোথায় একপ্রান্তে একটী প্রার্থনা উঠিল সে প্রার্থনা সফল হইল। নিদর্শন পাওয়া গেল. ২।৪টী হৃদয়ে প্রথমে সাড়া পড়িল। আরো পাঁচটীতে পড়িল। আবার ঘুম ঘোরে চক্ষু আবৃত হইবার উপক্রম হইল, ভয় পাইও না। ওদিকে প্রার্থনারও জোর হইতেছে। কখনই ব্যর্থ হইবে না। নর-জগতের সঙ্গে অমৃত লোকে খেলা ঐরূপই হয়। একদিনে কিছু হয় না, একস্ফুলিঙ্গ দেখিতে দেখিতে গ্রাম ছাইয়া পড়ে। হৃদয়ে হৃদয়ে গূঢ় খেলা আরো অদ্ভুত! গোপনে তার কাজ হয়, যথাসময়ে ফল প্রসব করে। এক হৃদয়ের বিশ্বাস একের পরিত্রাণের জন্য নয়। আসে প্রথমে একটী হৃদয়ে, কিন্তু তাহা দেশের জন্য। চিরদিন এই খেলা চলিয়াছে। কোনো ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। আশা বিশ্বাস ধরিয়া চলো—অন্য পথ নাই।

চিরদাস—

গৈপুর শাখার কার্য্যবিবরণী

গত ৺মহাষ্টমীর দিন প্রাতে ৯টার সময় গৈপুর মিত্র বাটীতে কুশদহ-সমিতির গৈপুর শাখার একটী সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। গৈপুর নিবাসী কাশ্মীর প্রবাসী শ্রীযুক্ত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত পতিরাম চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র মিত্র, কালিদাস সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, অমিয়নাথ বসু, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পতিরাম দে ক্ষিতীশচন্দ্র বসু প্রবোধচন্দ্র মিত্র।

আরও ৭।৮জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে গত সভার কার্য্যবিবরণী ও হিসাবাদি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশবাবু পাঠ করেন। পরে কার্য্যকরী সমিতির পুনর্গঠন প্রস্তাব গৃহীত হইয়া নিম্নলিখিত সভ্যগণ নিযুক্ত হন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত পতিরাম চট্টোপাধ্যায়—

সহকারী ঐ—চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রজকিশোর মিত্র

সম্পাদক—সুরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সহঃ ঐ—ক্ষিতীশচন্দ্র বসু

কোষাধ্যক্ষ—বিনয়কৃষ্ণ বসু।

কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। নলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পতিরাম দে। প্রবোধচন্দ্র মিত্র। ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র। কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমিতি স্থাপনের এই ছয় মাসের মধ্যেই সমিতির কার্য্য বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

গ্রামের লোকের জলকষ্ট দেখিয়া ও তাহাদের কষ্টে দুঃখ অনুভব করিয়া সহৃদয় শ্রীযুত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—স্বয়ং প্রবাসী হইয়াও একটী পুষ্করিণী কাটাইয়া দিতে আপনিই প্রস্তাব করেন। সমিতি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট পতিরামবাবুর দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা করিতেছেন।

অতঃপর সমিতি নিজব্যয়ে গ্রামস্থ দুঃস্থ বিধবাদিগকে ছয়টী চরকা কিনিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর তাহার বিবরণের ভার অর্পণ করেন।

কুশদহ সমিতির গৈপুর শাখা,—কুশদহ পত্রদ্বারা গৈপুর নিবাসী সহৃদয় ব্যক্তিদিগের নিকট গ্রামের উন্নতির জন্ত তাঁহাদের যথাসাধ্য অর্থসাহায্য, ৬০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে কোষাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। আশা করি, গ্রামবাসীর করুণ প্রার্থনা বিফল হইবে না।

প্রতিধ্বনি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য

ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় যখন ভাইস্ চান্সেলার ছিলেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চল্লিশ হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পরীক্ষার জন্ত এক কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটির নাম Students Welfare Commite.। ১৯২০ সালের ২৮এ মার্চ কমিটির কার্য্য আরম্ভ হয়, তদবধি এ পর্য্যন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশ, প্রেসিডেন্সী, কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, সিটী কলেজ, ও বিদ্যাসাগর কলেজের ৩৮০০ জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিয়াছেন। শীঘ্রই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে, তবে যতটুকু আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অবস্থা বড়ই খারাপ। ১৯২১ সালের ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পরীক্ষিত ছাত্রসংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

কলেজ	ছাত্র সংখ্যা
স্কটিশচার্চ্চ কলেজ	৯১৩
বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস	১৪০
সিটী কলেজ	১৭১০
প্রেসিডেন্সি কলেজ	৬৯২
বিদ্যাসাগর কলেজ	৩৪৯
মোট	৩৮০৪

এই ৩৮০৪ জন ছাত্রের মধ্যে ১০৩৪ জন ব্রাহ্মণ, ৯৮৫ জন কায়স্থ, ২৯২ জন বৈদ্য, ২৯ জন ক্ষত্রিয়, ২৮ জন বৈশ্য, ১৭ জন গন্ধবণিক, ৪৫ জন সুবর্ণবণিক, ৭৮ জন মাহিষ্য, ৫৪ বৈশ্যসাহা, ৪৯ জন ব্রাহ্ম, ৭ জন বৌদ্ধ, ৩২ জন খ্রীষ্টান, ২৮৩ জন মুসলমান, ১ জন আর্য্য সমাজভুক্ত, ও ২ জন জৈন। শতকরা ১০ জন ছাত্রকে হৃষ্টপুষ্ট ও মাংসপেশীযুক্ত দেখা গিয়াছে। নিম্নের তালিকা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে—

কলেজ	মাংসপেশীযুক্ত	মোটা	দোহারা	কৃষ
স্কটিশচার্চ্চ কলেজ	১৩	৯	৪৭·৮	২৮·৯
ইউনিভার্সিটী ক্লাস	৬·৪	১৩·৬	৪৭.১	৩.৭
সিটি কলেজ	৮·৭	৫.৭	৫৩·২	৩৫·৪
প্রেসিডেন্সী কলেজ	১০·৪	৬·৬	৫৫·২	২৭·৭
গড়পড়তা	১০·১	৭·২	৫০·৫	৩১·৯

শতকরা প্রায় ৪১ জন ছাত্র কুঁজা। শতকরা প্রায়

৬৪ জন ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক, বাকী—শতকরা ৩৬ জনের চোখের দৃষ্টিশক্তি কম। এই ৩৬ জনের মধ্যে শতকরা ১৩ জন ঠিক চশমা লইয়াছে।

ছাত্রগণের তিন ভাগের এক ভাগ দাঁত খারাপ। নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট দেখিলে ইহা বেশ বুঝা যাইবে—

কলেজ	স্বাভাবিক
স্কটিশচার্চ্চ কলেজ	৫৮'৬
ইউনিভার্সিটী ক্লাশ	৬০'৭
সিটি কলেজ	৭৭'০৬
প্রেসিডেন্সী কলেজ	৬০'২
গড়পড়তা	৬৬

হৃদপিণ্ড, নাড়ী, গলায় বীচি, ফুসফুস, গলা, প্লীহা, যকৃৎ আলজিব, চোখ নাক, প্রভৃতির ব্যারাম যাহাদের, তাহাদের তালিকাও নিয়ে দেওয়া হইল—

কলেজ	ছাত্র সংখ্যা	সাধারণ ব্যাধি	শতকরা
স্কটিশচার্চ্চ কলেজ	৯১৩	১৪৫	১৬ জন
ইউনির্ভাসিটি ক্লাশ	১৪০	৪০	৩৬ জন
সিটি কলেজ	১৭১০	৩৫৩	২১ জন
প্রেসিডেন্সী কলেজ	৬৯২	৩৬১	৪৯ জন
	৩৬৫৫	৮৯৯	

সাধারণ ব্যাধি যাহাদের অ্যছে, তাহাদের শতকরা হিসাবঃ—

কলেজ	হৃৎপিণ্ড	ফুসফুস	যকৃৎ	প্লীহা	গলার বীচি	একশিরা
স্কটিশচার্চ্চ	৮'১	০'৭	০'৭	১০'৬	২'৩	০'০
ইউনির্ভাসিটি	১০১	০'৭	২ ৮	২'১	৫'০	২'৮
সিটি	৪'৮	০'৫	০'৬	৩'৯	৪'৫	১'১
প্রেসিডেন্সী	৩'৩	০'১	০'১	৫'৫	১৪'৫	০'৫
	৫'৪	৪'০	০৬	২'৬	৫'৮	০'৯

সমস্ত শ্রেণীর ব্যধিগ্রস্ত ছাত্রদিগের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মোট ব্যাধি বা দোষযুক্ত		শতকরা
স্কটিশচার্চ্চ কলেজ	...	৬৪
ইউনির্ভাসিটি ক্লাস	...	৭৭
সিটি কলেজ	...	৬৪
প্রেসিডেন্সী কলেজ	...	৯১
গড়পড়তা	...	৬৬ জন

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রতি তিনজন ছাত্রের মধ্যে দুই জনের স্বাস্থ্য খারাপ।

"কলিকাতা রিভিউ" মার্চ্চ, ১৯২২।

কাশীর পথে

কাশীর কথা আগে বলেছি। পথের কথা কিছু বলা আবশ্যক। ষষ্ঠীর দিন (২১ এ আশ্বিন সোমবার) বৈকালে কলিকাতা ছাড়ি। গিরিধি এসে দিন ১০—৫টার মধ্যে মধুপুর—আসানসোল ৩ দিন ঘুরে যাই। তারপর দেওঘর—যম্পান টাউনে সহায় নারায়ণ ভবনে (তিনি স্বয়ং অনুপস্থিত হলেও) জামাতা বাবাজী শ্রীমান্ কালীচরণ বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়ে অসুখ বিসুখে ন্যাতা যোবড়া হয়ে আছেন এক রকম; তাঁর খোঁজ খবরটাও নেওয়া গেল। তা ছাড়া এবার দেওঘরে আর একটা কাজ ছিল, যোগীন্দ্র সিংহ মহাশয়কে খুজে বার করা—তিনি এখানে অনেক দিন হতে আছেন তা জানিতাম না—সন্ধানটা পাওয়া গেল এবার গত আষাঢ় মাসে পুরীর ফেরতা কটকে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রের নিকট। যা হোক্ কাষ্টার্স টাউনে অন্নদা কুটীরে" (অবশ্য ভাড়া বাড়ী) তাঁকে পেলাম। পেলাম শুধু নয়—খুব আনন্দও পাওয়া গেল।

যোগীন্দ্রনাথ সিংহ, নিবাস সৈপুর। ইনি বিদেশে চিরদিন, ইহাঁর অগ্রজ অন্নদা বাবুকে দেশের অনেকেই চিনেন। যোগীন্দ্রবাবু ডাক বিভাগে চাকরী করে এখন এখানে বাস করচেন। বয়স ৬১ বৎসর হয়েচে—এ অবস্থায় যা কাজ তাতেই যে তার মন পড়েছে এটা খুব আহ্লাদের কথা,—ইনি দেওঘরের প্রসিদ্ধ মহাত্মা বালানন্দ স্বামী জীর শিষ্যত্ব স্বীকার করে বিশিষ্টভাবে ধর্ম্মসাধনে রত হয়েচেন। এঁর ভক্তিভাবের সঙ্গে জীবনের স্বাভাবিক সরলতা এবং বিচক্ষণতা মিলে বেশ ভাবটী গড়ে উঠচে। ২।৩ দিন এঁর সঙ্গলাভে বিশেষ আনন্দ পেলাম। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সচীন্দ্রনাথ এম এস্ সি পাস করে এখন পোষ্টাল ইন্সপেক্টর পদে প্রেসিডেন্সি বিভাগে চাকরী করচেন। ২য় পুত্র শ্রীমান নলিনীরঞ্জন বাঁকুড়া কলেজে বি-এ পড়চেন।

দেওঘর থেকে কুণ্ডায় শ্রদ্ধেয় বন্ধু অনাথনাথ মুখো-

পাধ্যায়ের ভ্রাতা ব্রহ্মচারী ভায়ার সঙ্গে ২ দিন থাকা গেল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ "মণিলাল কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দোপাধ্যায় ভায়ার আদর আহ্বানে ১ দিন "রামপদ ভবনে" আতিথ্য গ্রহণ করা হলো। তারপর ফেরবার একটু আগে দেখি অতুল ভায়া—(শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—) এখানে বেড়াতে এসেচেন। তাঁকে দেখে খুব আনন্দ হলো।

তারপর বক্তিয়ারপুর—এখানে ষ্টেশনে বুকিং ক্লার্ক পাঁচুভায়া—(গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়) গয়া থেকে সম্প্রতি এখানে এসেচেন। ইনি এই চাকরীতে কত ষ্টেশনে ষ্টেশনে (ই; আই আরে) যে ঘুরলেন! হবে বয়স ও প্রায় ৪০ এর কাছে ইনি "কুশদহ"র একজন প্রধান হিতৈষী। আর এখানে আছেন (ইয়ংম্যান) গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাড়ীর শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবিহারী চাটাজ্জির ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ বটকৃষ্ণ; ইনি এখানে বাড় কোম্পানির কর্ম্মচারী। এখানে ইতি পূর্ব্বে—বেহার বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ে (মোটান কোংর) (ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ছিলেন, পঙ্কজ ভায়া—কুঞ্জবাবুর পুত্র) এখন তিনি কদমতালা থেকে সম্প্রতি আবার পাতিপুকুরে বদলি হয়েচেন। কিন্তু তাঁর স্মৃতি চিহ্ন বেহার রাজগিরি লাইনে ২।১টী কুশদহবাসী রেল কর্ম্মচারী রয়েচেন। বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগিরি যাতায়াত আমার খুব সহজ হয়েচে। তাই এবার আবার রাজগিরি একদিনের জন্য গেলাম।—সেই গণ্ডির দৃশ্য রাজগিরি পাহাড়—শান্তিপ্রদ নিস্তব্ধতা পবিত্র বাটাস—উষ্ণ—প্রস্রবণ—সে জলে স্নান—পান কি স্বাস্থ্যকর। রাজগিরি ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—বনগ্রাম অঞ্চলের হলেও ভাবে সম্পূর্ণ "কুশদহবাসী" তাঁকে সস্ত্রীক পেয়ে বড় খুসী হলাম। যদি কোন কুশদহবাসী রাজগিরি আসেন যোগীন্দ্রবাবুকে পেয়ে নিশ্চয়ই সুখী হবেন। তাঁর ইচ্ছে এখানে বাঙ্গালীদের একটী "ধর্ম্মশালা" হয়—তিনি এ কাজে খাটতে চান। আমি বলি ঐ "শুভস্য শীঘ্রং"।

তারপর একেবারে আসি বাঁকীপুর—(পাটনা জং) এখানে আছেন পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল অফিসে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। ইনি গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিন চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়। ইহাঁর বাসা আমলা পাড়া (ষ্টেশন লাইনের পশ্চিম—দক্ষিণ ধারে—নূতন কোয়াটার পল্লি) ৮নং রাস্তার ৩নং বাড়ী। পাঁচুবাবু এই পোষ্টবিভাগে অনেক দিন কাটাসেন, এখন বয়স ৩৫।৩৬ এর উপর হবে ২য় সংসার বটে, কিন্তু সংসারে বেশ শান্তি আছে; প্রথম পক্ষের পুত্র (মটর) পাঠ্যাবস্থা। এ পক্ষে ছেলে মেয়ে ২টী মাত্র।

তারপর একেবারে কাশী—কাশীর পত্র আগেই দিয়েচি।

চিরদাস

কুশদহে কংগ্রেস পতাকা

(প্রেরিত পত্র)

ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণী।

গত ১লা মাঘ হইতে ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর অধীনে গোবরডাঙ্গায় কেন্দ্র করিয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। বিভিন্ন জেলার স্বেচ্ছাসেবকগণ আসিয়া কেন্দ্রে কাজ করেন।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে চাতরা, চণ্ডীপুর, খাঁটুরা, কাঁচদহ, সরকারপাড়া, টিবি, গাজনা, বড়া রঘুনাথপুর ও গোবরডাঙ্গা এই ১০টী গ্রামে সভা করা হয় এবং গ্রামবাসীদের "বর্ত্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বলা হয়। গোবরডাঙ্গার বাজারে এবং চারঘাট, লোকপুল, বাহুড়ে, বাগজালা, গাজনা, সুঁটে, রামনগর, পাঁচপোতা, সাঁড়াপুল ও বাউডাঙ্গা এই ১০টী হাটে কাপড়ের ক্রেতাগণকে স্বদেশী কাপড় ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং সাধারণকে উহার আবশ্যকতা ও উপকারীতা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন কংগ্রেসের কাজের জন্য ইচ্ছাপুর, ঘোষপুর, আটঘরা, মির্জ্জাপুর, সলুয়া, দক্ষিণচাতরা, পাঁপলে, সগুণা, যাদবপুর, বেলিসি, ঝনঝনে, ভেড়াডাঙ্গা ও কুঁচলে এই ১৩টী গ্রামেও যাওয়া হয়। এখন খটুরা, গোবরডাঙ্গা ঐ গৈপুর এই তিনটী গ্রামের মধ্যেই ৪৫টী চরকা বসিয়াছে। কিছু দিন স্বদেশী মিলের কাপড়, খদ্দরের কাপড়, জামা ও চাদর

গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য বিক্রয় করা হইয়াছিল। কিছু কিছু চরকা ও তুলাও বিক্রয় করা হইতেছে। গোবরডাঙ্গায় একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহাতে এবং খাঁটুরার বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদের চরকায় সুতা কাটা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। স্থানীয় লোকদিগের সাহায্য প্রাপ্তি ১১৯॥/১০ মৌজুত (১লা চৈত্র) ২৫।/১৫

নিবেদন :—

প্রাণে একটা মস্ত আশা নিয়ে সেদিন এখানে এসে কাজে নেমেছিলাম, কত আশা ও নৈরাশের মধ্য দিয়ে আজ তিনটী মাস অতীত হ'ল। এই গোবরডাঙ্গায় যখন প্রথম আসি তখন ভেবেছিলাম—যে মহাশক্তি সমস্ত ভারতকে কাঁপিয়ে তুলেছে—সেই জাগরণের সাড়া বুঝি এখানকার তিমিরাচ্ছন্ন গ্রামগুলির মাঝেও এসে পড়েছে। সত্যই এস্থান সুপ্ত নহে, কারণ অভ্রান্ত স্পন্দন আমরা অনুভব করেছি। তবে সত্য লুকাইতে পারিব না ঘোর এখনও আছে—জড়তা এখনও সম্পূর্ণ ঘোচে নাই। লোক এখনও নিজেদের চিনতে পারেনি, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসের অভাব এখনও বর্ত্তমান।

এই তিন মাসে যেরূপ উন্নতি দেখিব আশা করিয়াছিলাম তাহা হইল কি ? আশা পূর্ণ হয় নাই বটে তবে নিরাশ মোটেই হই নি। আশানুরূপ কার্য্য হয় নি তাহার কারণ স্থানীয় কর্ম্মীর একান্ত অভাব। বাহিরের স্বেচ্ছা-সেবক আসিয়া চিরকাল কাজ করিতে পারে না আর তাহাদের উপর সমস্ত নির্ভর করাও উন্নতির পথ নয়।

এখানে কাপড়ের দোকানে অনুরোধ (picketting) করার ফলে দেশী কাপড় বাজারে বেশ আসিতেছিল এবং অনেক বেশী বিক্রয় হইতেছিল। কিন্তু picketting বন্ধ হওয়ায় পুনরায় বিলাতি বিক্রয় বাড়িতেছে। দেশের লোককে চিরকালটা জবরদস্ত করিয়া দেশী কাপড় পরান চলিতে পারে না। কাপড় যাহাতে এস্থানেই প্রস্তুত হয় সেইজন্য চরকা প্রচলনের দিকে অধিক মনোযোগ দিতে হইবে—ইহাতেই স্থায়ী কাজ হইবে।

স্থানীয় কুশদহ সমিতির এই চরকা প্রচলনের জন্য লাগিয়া পড়া একান্ত কর্ত্তব্য।

কুশদহ সমিতি সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। কুশদহ সমিতির creed এ non political কথাটা দেশে এমন অবস্থাতেও আছে ইহা দুঃখের বিষয়। 'এই ভয়জাল এই মৃত আবর্জ্জনা এই মৃত্যু আজ ছেদিতে হইবে'। ইহাতে ভয় ছাড়া আর কিছুই নহে নচেৎ non social non religious ইত্যাদি লেখা হয় না কেন ? সমিতি যদি বাস্তবিকই কুশদহ বাসীদের সৎসাহসী ও সত্যের পথে অগ্রসর করাতে চান তবে সমিতি তার তোরণ দ্বার থেকে ঐ আত্ম অবমাননাকারী কথাটা মুছে ফেলুন। পথ চলবার আগেই সঙ্কল্প করার সময়েই ভয়ে অসত্যের গুরুভার শৃঙ্খল কুশদহ বাসীর চরণে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে!

কুশদহের কর্ম্মী যুবক, কুশদহের আবালবৃদ্ধবণিতা প্রত্যেকে সাধ্যমত আজ এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে কুশদহেরই প্রোথিত রথচক্রে স্কন্ধ দেবেন না কি ? কুশদহের আত্মোন্নতির আত্মশক্তির উদ্বোধন, আত্ম মর্য্যাদা রক্ষা, কুশদহের স্বরাজ, একমাত্র কুশদহ বাসীর উপরেই নির্ভর করে। এই আত্ম বিকশিত করার সংগ্রামে কুশদহবাসীর কার্য্য বিবরণী কুশদহ বাসীর সাধনার কথা ভারতের ইতিহাসে কোন স্থানে কি ভাবে চিত্রিত থাকিবে তাহার জন্য দায়ী তাঁহারাই।

সেবক—বসুভূতি রক্ষিত।

প্রতিধ্বনি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চরকার উপযোগিতা কি ?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিবেদন।

একটি প্রাচীন সভ্যজাতি যখন মরণের পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহার ব্যাধির অন্ত থাকে না—সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক। বাঙ্গালী আজ ধ্বংসোন্মুখ। দুই চারিটি জেলা বাদ দিলে দেখা যায়, প্রত্যেক জেলাতেই জন্ম-সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা বেশী। কেবল ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর বাঙ্গালা দেশে ১১ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবন-

সংগ্রাম দিন দিন ভীষণ হইতেছে—অন্নসমস্যার কোন সমাধান হইতেছে না। কলিকাতার অর্দ্ধাংশ লোক অ-বাঙ্গালী। কলিকাতা এসিয়ার সেরা সহর বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি কিন্তু ভুলিয়া যাই—কলিকাতার ধনের শতকরা ৯০ ভাগ ইয়ুরোপীয়, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শি, আর্ম্মেনী ও দিল্লিওয়ালা প্রভৃতির করতলে—আর আমরা কেবল কেরাণীগিরি করিয়া দিনপাত করি।—কুলিমজুর, ছুতোর, কামার পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আসে। আবার সম্প্রতি দেখিতেছি, কাঠের গোলা গুলোও আস্তে আস্তে চীনা আসিয়া দখল করিতেছে। আজ বার বৎসর যাবৎ "বাঙ্গালীর মস্তিক ও তাহার অপব্যবহার" "অন্ন-সমস্যা" ইত্যাকার প্রবন্ধে এই সকল আসন্ন বিপদের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছি, কিন্তু অহিফেন-সেবীর ন্যায় মোহ ও নেশায় বাঙ্গালী জাতি বিভোর, তার সাড়া নাই।

অন্ন-সমস্যার পর বস্ত্র-সমস্যা উপস্থিত। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে বিদেশী বস্ত্র আমদানী হইত না। জিজ্ঞাসা করি, তখন কি বাঙ্গালী জাতি বিবস্ত্র ছিল! না, তখন ঘরে ঘরে চরকা চলিত—ঢাকা, চন্দননগর, শান্তিপুর প্রভৃতি নগরে হাজার তাঁত চলিত। বাঙ্গালা দেশের অভাব মোচন হইয়া কয়েক কোটি টাকার বস্ত্র বিদেশেও রপ্তানী হইত। কিন্তু যখন সস্তা ও ক্ষণভঙ্গুর বিলাতী কাপড়ে বাজার ছাইয়া ফেলিল, তখন মোহ-তমসাচ্ছন্ন আমরা দেশী বর্জ্জন করিয়া বিদেশী গ্রহণ করিলাম। আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ৪০ কোটি টাকা বিদেশীকে উপহার দিতেছি।

একবার তলাইয়া দেখা যাউক। এই ৪০ কোটি টাকা কি প্রকারে খরচ হয়। প্রথমতঃ ম্যানচেষ্টারের কাপড় লম্বা আঁশের তুলার সূতায় ছাড়া হয় না। ইহা প্রধানতঃ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসে। তারপর ম্যানচেষ্টারের কলে এই তুলা হইতে সূতা এবং এই সূতা হইতে কাপড় হয়। একবার ভাবিয়া দেখুন, এইরূপে জাহাজে আনাগোনায় কত ব্যয় হয়—তার পর কত পাইকার ও ব্যবসাদারদিগকে মুনাফা দিতে হয়। এই বিষয়টি অন্য ভাবে একবার হৃদয়ঙ্গম করা যাউক। ভারতবাসীর আয় গড়পড়তায় মাসিক দুই টাকা অর্থাৎ প্রতিদিন ⁄০, আর মার্কিন দেশের শ্রমজীবীর দৈনিক আয় এক ডলার, প্রায় ৩।⁄০ তিন টাকা পাঁচ আনা। ইংরাজ শ্রমজীবীর আয়ও প্রায় তদনুরূপ। তবেই দেখা যাইতেছে, এই ⁄০ আনা আয়বিশিষ্ট ভারতবাসী তাহার পরিধেয় বস্ত্রের জন্য ৩।⁄০ রোজের মজুর নিযুক্ত করিতেছে।

আর একটি কথা—চরকায় সূতা তৈয়ারী হইলে সঙ্গে কার্পাসেও চাষ আরম্ভ হইবে, এবং প্রতিবৎসর যে ৪০ কোটি টাকা এখন আমরা বিদেশে প্রেরণ করি, তাহা দেশেই থাকিয়া যাইবে এবং উত্তরোত্তর আমাদেরই শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আর এই বিদেশী শব্দের একটা খোলাখালা মানে চাই। বাঙ্গালীর পক্ষে বিদেশীর অর্থ কেবল ম্যাঞ্চেষ্টার নয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে ১৯৭টী তুলার কল ছিল, কিন্তু ১৯১৬ অব্দে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ২৬৬ হয়। এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ বাঙ্গালায় "স্বদেশী যুগ।" এই তুলার কলগুলি প্রধানতঃ বোম্বাই ও আমেদাবাদ সহরে অবস্থিত। বাঙ্গালী যেমন পণ করিলেন বিলাতী কাপড় পরিবেন না—অমনি বোম্বাই-ওয়ালারা সুযোগ পাইয়া কেবল যে, কল বাড়াইলেন তা নয়, কাপড়ের দর দ্বিগুণ বাতি নগুণ বাড়াইলেন; অর্থাৎ বাঙ্গালীর স্বদেশানুরাগের অপব্যবহার করিয়া নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের সুবিধা করিয়া লইলেন।

গত বৎসর বোম্বাই আমেদাবাদের কাপড় কল-ওয়ালারা ১৬॥০ কোটী টাকা মুনাফার একটা বড় অংশ বাংলা হইতে লইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীরা স্বদেশী কাপড় কিনিয়া কয়েক কোটী টাকা বাংলা হইতে অন্য প্রদেশে পাঠাইয়াছেন। আমি চাই চরকার প্রচলনে বাংলায় বুনিয়া এই টাকা বাঙ্গালীর ঘরে থাকে। তা ছাড়া ইদানীং ভারতে যত তুলা হয়, তাহার বেশীর ভাগ জাপানে রপ্তানি হয়। জাপান আবার ঐ তুলায় সেখানকার কলে কাপড় বানাইয়া কলিকাতার বাজার ছাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। আমি বাঙ্গালী—আমি চাই বাঙ্গালার টাকা বাঙ্গালার বাহিরে পারতপক্ষে না যায়—বাঙ্গালী এই প্রকারে না নির্দ্ধন হয়।

তবে এই চরকায় প্রচলন করিলে হইতে হইলে অতি কঠোর ব্রতের উদযাপন করিতে হইবে। প্রধানতঃ গৃহলক্ষ্মীদের এই ব্রত লইতে হইবে, তবে পুরুষদেরও এই

কাজে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে হইবে। বাঙ্গালীর প্রধান দোষ আলস্য। সহরে কয়জন লোক বাস করে? বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৯৩ জন পল্লীবাসী। তাহাদের মধ্যেই অনেকেই দিবানিদ্রা, খোস-গল্প, পরচর্চ্চা, তাসপাশা লইয়া সময় অপব্যয় করে। বরিশাল খুলনা প্রভৃতি "এক ফসলী" জেলায় চাষীরা গড়ে তিন মাসের বেশী খাটে না, অবশিষ্ট তিন মাস বসিয়া খায়। যদি চরকায় সূতা কাটা চলন থাকিত, তাহা হইলে এক বৎসর আমন ধানের অজন্মা হইলে তাহারা "হাহতোঽস্মি" করিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইত না, এই চরকার সূতা কাটায় রোজগারের অন্যতম বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ পেট-ভাতায় থাকিতে পারিত। এখন সকলেরই দৃঢ়ব্রত হইয়া প্রত্যহ অন্যূন ২ ঘণ্টা চরকা চালাইতে হইবে।

বসুমতী

ভারতের স্বায়ত্ত শাসন

আমেরিকার সাহচর্য্য

আমেরিকার নর্থক্লিফ্—মিঃ উইলিয়াম র‍্যাণ্ডল্ফ্ হার্ষ্ট ভারতীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও আমেরিকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ওয়াশিংটন টাইমস্ পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

কোন্ ন্যায় পরায়ণতার জোরে, কোন্ মঙ্গল সাধনের জন্য, কোন স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রদানের জন্য ইংলণ্ড ভারতকে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছে?

ভারতবর্ষ এমন দেশ যেখানে স্বনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রকৃষ্ট-রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ভারতবাসীগণ পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিদিগের মধ্যে অন্যতম এবং তাহারা অন্যান্য প্রাচীনতম সমস্ত জাতির জনক স্বরূপ।

এদেশের লোক সংখ্যাও অত্যন্ত বেশী উহারা সংখ্যায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রায় দ্বিগুণ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের প্রায় চতুর্গুণ।

এই ভূভাগ অতি বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ১৭৬৬৬৪২ বর্গ মাইল। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ পর্ব্বত ও সমুদ্র বেষ্টিত।

ইতিহাসের দিক দিয়াই হউক, মানব তত্ত্বের দিক দিয়াই হউক, আর ভৌগলিক অবস্থান বা রাজনৈতিক অবস্থার দিয়াই হউক, ইহাকে একটা 'নেশন' (জাতি) বলিতে হইবে। জগতের আর কোনও জাতির ইতিহাস এত দীর্ঘ অথচ গৌরবময় নহে। জগতের কার্য্যক্ষেত্রেও আর কোনও জাতিই এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

ভারত কেন যে ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিল, তাহার মাত্র দুইটি কারণ বিদ্যমান। এক কারণ ইংরাজদিগের সামরিক শক্তি। আর এক কারণ ভারতীয়গণের ধর্ম্ম ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক শান্তি-প্রিয়তা। এই স্বার্থপর হিংসাদ্বেষপূর্ণ জগতে এই শান্তি-প্রিয়তা যে কেবল বোকামী, তাহা নহে, উহা অনেক সময়ে ধ্বংসেরও কারণ। তাহাদের এই স্বভাব কতকটা আমাদের দেশের শান্তিপ্রয়াসী রাজনীতিজ্ঞদের মত।

ভারতও একদিন তাহার বিজেতা ইংলণ্ডের মতই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। বিজিত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয়গণই তাহাদের নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা ছিল। ভারতের সাহিত্যও জগতের অন্য যেকোনও দেশের সাহিত্য অপেক্ষা ন্যূন নহে। ভারত তাহার পদ্ধতিতে সুকুমার কলাবিজ্ঞানেরও পরম উন্নতি সাধন করিয়াছিল।

স্থাপত্যে ভারত সকলকে পশ্চাদপদ করিয়াছিল, ভারতীয়গণের শিক্ষা সভ্যতাও যে সময়ে ইংরাজগণ তাহা-দিগকে জয় করে সেই সময়কার ইউরোপবাসিগণের অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না।

ভারতীয়গণের অতিরিক্ত শান্তিপ্রিয়তার জন্য এবং যুদ্ধবিমুখতার জন্যই ইংরাজগণ ভারতকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা আমেরিকান। ইংরাজ ও ফরাসী, এবং অন্যান্য আধুনিক সভ্যজাতি সম্প্রতি যাহা ঘোষণা করিয়াছিল, এবং যাহার জন্য আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহার

পর কি আর ভারতকে চিরদাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখার কোন যুক্তিসঙ্গতকারণ বর্ত্তমান আছে ?

আমরা সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছি, সমস্ত জাতিকে স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইবে। এই নীতির সঙ্গে ভারতের অধীনতার কি কোন সুসঙ্গতি আছে ? উহা কি ন্যায়পরায়ণতা ও মানবহিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ?

মিঃ হার্ডিং, মিঃ হিউজেস্‌, এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক-ওয়ালাগণ আমাদের ঘাড়ের উপর ইংরাজের মিত্রতা চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাই বলিয়া আমরা কি নিঃসঙ্কোচে ও অক্ষুণ্ণ বিবেকে ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে ইহার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে অধীনতার পাশে আবদ্ধ রাখিবার জন্য ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে পারি ?

তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতার এবং সমস্ত জাতিই তাহাদের নিজেদের ইচ্ছা মত শাসিত হইবে, এই ঘোষণার অর্থ কি দাঁড়ায় ?

হার্ডিং শাসনতন্ত্র কি আমেরিকার নৌবহরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাধীনতা ঘোষণাটাকেও বিসর্জ্জন দিয়াছে ? আমরা কি আত্মরক্ষণ-নীতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কার্য্য-নীতিকেও পরিত্যাগ করিয়াছি।

এই নূতন মৈত্রী কেবল আন্তর্জাতিক বিষয়ে নহে, আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারেও আমাদিগকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমেরিকার সর্ব্ব মানবের স্বাধীনতার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া আমরা কিরূপে ভারতে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি ?

আমরা নিজের গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বী হইয়া অন্যকে কেন উহা হইতে বঞ্চিত করি ?

পৃথিবীর মানচিত্রে উক্রেণীয়া নিতান্ত নগণ্য বিন্দুবৎ। উহা কখনও একটা জাতি ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। এহেন উক্রেণীয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করিয়া, আমরা কি করিয়া ভারতের মত এত বড় জনবহুল ও ইতিহাসবিশ্রুত জাতির প্রতি বিরূপ হইতে পারি ?

হয়তঃ স্বাধীনতা, গণতন্ত্রিকতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছা-শাসন এসব কথা ভুল, না হয় ভারতকেও আমাদের মত উহার ভাগ দিতে হইবে।

যদি ভারত এ সবের অধিকারী হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড ও জাপানের সহিত মিত্রতার অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, এই দুই সমরপ্রিয় জাতির সাম্রাজ্যলিপ্সার সম্মুখে আমাদের গণতান্ত্রিকতাকে এবং তাহাদের স্বাধীনতাকে বলি দিতে হইবে ?

যে আমেরিকা আজ আধ্যাত্মিকতায় জগতে সমস্ত জাতির অগ্রণী, তাহারা কি তাহাদের সেই উচ্চনীতিগুলি এই জাতিদের সম্মুখে বিসর্জ্জন দিবে ?

আমরা কি আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা, এবং গণতান্ত্রিক নীতিকে পরিহার করিব ? ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আমরা গড়িয়া উঠিয়াছি। যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা চিরকাল লড়িয়া আসিয়াছি, যে নৌবহর ও সৈনিক বাহিনী আমাদের সেই স্বাধীনতা ও সেই সব উচ্চনীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, আমাদিগকে কি আজ সে সমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে ?

যে অস্বাভাবিক মিত্রতার বন্ধন আমাদের ইতিহাসের ধারার বিরোধী, যাহা আমাদের উচ্চনীতির পরিপন্থী, তাহা কি আমরা ছিন্ন করিয়া ফেলিব না ?

আমরা কি জগতের আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শক হইব না ? আমরা কি আমাদের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিব না ? এবং নিজেরাও স্বাধীন হইব না ?

সময়—৮।৪।২২

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঈশ্বর কৃপায় অবশিষ্ট চারি সংখ্যা কাগজ আমরা আবার গ্রাহকবর্গের হাতে দিতে সক্ষম হইলাম। অবশ্য চারি সংখ্যা একত্রে ছাপাইলে বস্তুতঃ তাহাকে এক সংখ্যা বলা যাইতে পারে। এক সঙ্গে ছাপাইবার ত্রুটি স্বীকার করতঃ মাত্র এই কথা বলিতে চাই যে—যে কারণেই হউক

গত ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্তও তখন ছয় সংখ্যা কাগজ বাহির হইল না তখন ইহার আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়া ছিলাম। সুতরাং এক মাসের মধ্যে এই দুই খণ্ডে (কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ১খণ্ড ও পৌষ হইতে চৈত্র ১খণ্ড) যে বৎসর সমাপ্ত করিতে পারা গিয়াছে তাহাই যথেষ্ট না হউক, সকল দিক বিবেচনা করিলে পাঠক গণের ক্ষমার দাবী করিতে পারে।

ছয় সংখ্যা স্বতন্ত্র কাগজে আমাদের ২৪ পৃঃ হিসাবে ১৪৪ পৃঃ বহি দিতে হইত। সেই জায়গায় আমরা প্রায় একশত পৃঃ বহি দুই খণ্ডে দিয়াছি। যে রকম অসুবিধায় পড়া গিয়াছিল তাহার হাত হইতে যে উদ্ধার পাইবার পথ দেখা গিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া পাঠকগণ পত্রিকার এ সকল দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

গত সংখ্যার পাঠকগণের অবগতির জন্য কয়েকটি নিবেদন জানান হইয়াছে। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য মণি-অর্ডার যোগে পাঠানই ভাল। ভি পিঃতে গ্রাহকগণকে বেশী মূল্য দিতে হইবে। আগামী ২৫ই বৈশাখ তারিখের মধ্যে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের ১৩২৯ সালের বার্ষিক চাঁদা মণি অর্ডার যোগে পাঠাইতে অন্যথা করিবেন না।

এ বৎসরও গ্রাহকগণের নিকট হইতে সময়মত টাকা না পাইলে কাগজখানিকে বাঁচাইয়া তোলা দায় হইবে। অনেকে হয়ত ইহার গত জীবনের অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিবেন এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক। তথাপি নিবেদন করিতেছি যে এই কথাটি মনে করিয়া রাখিতে হইবে যে একদিকে যেমন কাগজ নিয়মিত বাহির হইবার সম্ভাবনার অনুপাতে গ্রাহক গণ গ্রাহক থাকিবেন কিনা বিবেচনা করিবেন, অন্যদিকে গ্রাহকদিগের নিকট হইতে টাকা পাওয়ার পরিমাণের উপর কাগজ নিয়মিত বাহির হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিবে। সুতরাং কাগজ খানিকে বাঁচাইতে হইলে প্রত্যেক গ্রাহকই তাঁহার দেয় ১।৵০ চাঁদা সময় মত অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখের মধ্যে পত্রিকা কার্য্যালয়ে মণি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিতে অন্যমত করিবেন না। পাঠকগণ সময় মত টাকা পাঠাইলে কাগজ যে নিয়মিত বাহির হইবে ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। কিন্তু টাকা সময় মত না পাইলে কাগজ যে বাহির হইতে বিশেষ বেগ পাইবে ইহা নিশ্চিত। আমরা আশা করি দেশ বিদেশ বিস্তৃত 'কুশদহের' পাঠক পাঠিকাবর্গ এতদিন ইহাকে যে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন ও যে সহানুভূতির জল সিঞ্চনে ইহাকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিয়াছেন,তাহা হইতে কখন ইহাকে বঞ্চিত করিবেন না। কাগজখানি দেশের জিনিষ অযত্নে যাহাতে মরিয়া না যায় তাহা সকলেরই দেখা উচিৎ।

আজ যে-যে কারণে "কুশদহ" মরিতে বসিয়াছে ভবিষ্যতে সেই-সেই কারণের অনেকগুলি হয়ত থাকিবে না এবং আজ যাহা-যাহা কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে ভবিষ্যতে যোগ্যতর পরিচালকের হস্তে তাহা যে সরল ও সহজ যাইবে না একথা কে বলিতে পারে ? সুতরাং দেশব্যাপী গ্রাহক অনুগ্রাহক বর্গের নিকট আমাদের এই শেষ অনুরোধ যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের দিক হইতে এই পত্রিকার বিনাশের জন্য দায়ী না হয়েন।

বর্ত্তমান সময়ে কুশদহের ন্যায় একখানা মাসিক পত্র চালাইয়া দেশের যথার্থ উপকার কিছু করা হইবে কিনা এ সম্বন্ধে দু এক জন প্রশ্ন করিয়াছেন এ প্রশ্নের উত্তর পাঠকবর্গ দিবেন।

কোনও সুপরিচালিত মাসিকপত্র যে একেবারেই অনাবশ্যক নহে একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা হয়ত ঠিক যে যে ভাবে 'কুশদহ' এই ছয় মাস ধরিয়া চালান হইতেছে সেইভাবে কাগজ চালানর কোনও সার্থকতা নাই ইহার অর্থ এও হইতে পারে যে কাগজখানি নিয়মিত বাহির হওয়ার আবশ্যকতা খুব বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে বলিয়াই এরূপ কথা মনে আসে। জগতে কোনও জিনিষ বৃথা ও নিরর্থক নহে সুতরাং 'কুশদহ' সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। যাঁহারা ইহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ

করিতেছেন তাহারা ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুতরাং সর্ব্বদা ধন্ধবাদার্হ কিন্তু 'কুশদহ' কাগজ খানার আদৌ আবশ্যকতা নাই একথা বলিলে বোধ হয় অবিচার করা হয় এবং বোধ হয় কুশদহবাসী ও "কুশদহের" পাঠক পাঠিকাবর্গ এই মতে সায় দিতে পারিবেন না।

জগতে যে-কোন সামান্য ব্যাপারেও যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন ও ঐকান্তিকতা বিনা সফলতা লাভ করা যায় না। মাসিক পত্র পরিচালনা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। সুতরাং কাগজ খানিকে দেশের পক্ষে উপকারী এবং সুন্দর সময়পোযোগী ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে পূর্ণ করিতে হইলে সেইরূপ চেষ্টা যত্ন ও একাগ্রতা আবশ্যক। এই সকল গুণের অনুপাতে কাগজ 'ভাল' বা 'মন্দ' হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। তবে যাহা বা যে মন্দ তাহাকে ভাল করাই যথার্থ কাজ— "কুশদহ" ও কুশদহ-সমিতির উদ্দেশ্যও বটে।

ভীষণ জল কষ্টের সময় আসিতেছে। প্রতি বৎসরই এই দুর্ভাগা দেশের তাবৎ অধিবাসী জলাভাবে হাহাকার করিয়াই আপন কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে মনে করে, সুতরাং এ বৎসরও গ্রীষ্মের সময় আমরা এই জলাভাবের আর্ত্তনাদ শুনিব ছাড়া আর নূতন কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশের মধ্যে যদি এখনও এমন কেহ থাকেন যিনি বিশ্বাস করেন যে ডিষ্ট্রিকট বোর্ড, কিম্বা লোকাল বোর্ড, কিম্বা খাস গবর্ণমেন্টের অনুচর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সকলের দিক হইতে এ সম্বন্ধে কোনও প্রতিকার চেষ্টা আসিবে তাহা হইলে তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত। সে ভুল ভাঙ্গিয়া যাওয়া উচিৎ। যাঁহারা আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে "কর্ত্তৃপক্ষ" তাহাদের বাঁচিবার উপায় করিয়া দিবেন তাহাদের বোধ হয় সে আশা এ জীবনে আর পূরণ হইবে না। জলকষ্টেই হউক বা ম্যালেরিয়ায় হউক এই প্রতিকারের আশা বুকে বহন করিতে করিতে তাহাদের শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যাইবে এ কথা বলিতে পারে যায়।

এখন একমাত্র উপায় নিজে কোমর বাধিয়া নিজের দুঃখ দূর করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হওয়া। কুশদহ-সমিতি জলকষ্ট নিবারণ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। অন্ততঃ পক্ষে এবার অভাবগ্রস্থ গ্রামে কয়েকটা অল্পব্যয়ে পাতকুয়া খোঁড়ান খুব উচিত। যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই এ কার্য্যে অধিকতর উৎসাহী হইলে অতিঅল্প ব্যয়ে ও চেষ্টায় আংশিক ভাবেও জলকষ্ট দূর হয়।

গত ছয় মাস ধরিয়া দেশময় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিকূলে কর্ত্তৃপক্ষ যে পীড়ননীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে আজ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানে, অর্থে, মানে, মর্য্যাদায়, ত্যাগে যাঁহারা সমগ্র পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করিবার উপযুক্ত তাঁহারা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী আজ কারাগারে। যে গান্ধীর তুলনা খুঁজিতে যীশুখৃষ্ট, নানক, চৈতন্যের কথা মনে আসে, —যাহার জ্ঞান ও রাজনীতির সম্মুখে Tolstoy নিস্প্রভ হইয়া পড়েন, যাহার ত্যাগ ও পরার্থপরতা বর্ত্তমান কালে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতুলিত। যাহার ইঙ্গিত মাত্রে এই ত্রিশকোটী ভারতবাসী নরনারী যন্ত্র চালিতবৎ ঘুরিতেছে—সেই ঐশী শক্তি-সম্পন্ন নরদেহ ধারী জীবন্ত দেবতা মহাত্মা গান্ধী আজ কারাগারে। কাহার কথা বলিব—পাঞ্জাব-কেশরী, আজীবন দেশের সেবায় শাসকবর্গের হস্তে নিগৃহীত, শিখকুলাবতংস লালা লাজপত রায় আজ কারাগারে। ঐশ্বর্য্যের ললামভূত ক্রোড়ে লালিত পালিত, কোটিশ্বর, জ্ঞানদৃপ্ত পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আজ কারাগারে।

এই সকল নর-রত্ন যে কোনও স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম আসন অলঙ্কৃত করিয়া রাখিতেন—পরপদানত শৃঙ্খলিত ভারতমাতার ভাগ্যে আজ তাহার এই মণি মাণিক্য কারাগারের ধূলায় লুন্ঠিত।

মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন "চরকা চালাইলে ও খ'র কাপড় ব্যবহার করিলে আমরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব।" মহাত্মা যখন যাহা বলিয়াছেন তখনই তাহা দেশবাসীর নিকট যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আজ ভারতবর্ষের এই উজ্জ্বল রত্ন সমূহকে কারা-

গারের লৌহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে হইলে দেহ প্রাণ সমস্ত মহাত্মার নির্দ্দেশিত পথে নিয়োজিত করা উচিৎ। এই বিশাল ভারতবর্ষের ভাগ্য কি অপরিবর্ত্তিত রহিবেই? ইহার উত্তর দেশবাসীর উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতেছে।

কুশদহ-সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালার অন্যতম আদিপুরুষ ও বর্ত্তমান বঙ্গ ভাষার গঠন ও পরিচালনা এবং অধ্যাপনার জন্য যে কয়েক জন দায়ী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম, আজীবন শিক্ষাদান ব্রতী খাটুরা ২৪ পঃ নিবাসী ও শ্যামবাজার মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পারিচালক পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক গত ২৬শে মাঘ ১৩২৮ তারিখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী এই কুশদহ সন্তানের পরলোক গমনে আমাদের দেশ একজন অতুলিত চরিত্রের ও আদর্শের জ্ঞানী মহাত্মাকে হারাইলেন। কবে এবং কাহার দ্বারা পণ্ডিত জগদ্বন্ধুর স্থানে পূরণ হইবে কে জানে। কুশদহবাসী এই মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য কি করিতেছেন? আগামী সংখ্যায় আমরা ৺পণ্ডিত মহাশয়ের সবিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত করিব।

এবার কুশদহ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন গৈপুরে হইবে।

গৈপুর নিবাসী কুশদহ সমিতির শীর্ষস্থানীয় সভ্য শ্রীযুত পতিরাম বন্দোপাধ্যায় বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হইয়াছেন। ভগবান এই কৃতি কুশদহ সন্তানের দীর্ঘজীবনে দান করুন।

কুশদহ সমিতির ও 'কুশদহ' কাগজের এবং সমস্ত কুশদহের নিয়ামক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি মায়া কটাইতে চাহেন কিন্তু দেশ কি তাঁহাকে ছাড়িয়া উঠিতে পারে? তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানা চিঠি দেশবাসীর পাঠের জন্য ছাপাইয়া দিলাম। কোথায় যেন আমাদের একটা মহান্ কর্ত্তব্যের হানি হইতেছে বলিয়া মনে হয়:—

"... ... ..."

"আমার এখন ঠিকানা নাই। দেড় মাস হইল পথে পথে দীন হীন কাঙ্গাল বেশে ভিক্ষার অন্নে দিন যাপন করিয়া বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম। এ কঠোর তপস্যা আমার আমার প্রিয় দেশেরই জন্য; অবিশ্বাস, নাস্তিকতা সংসার-আসক্তি যতকিছু পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেশের প্রতিনিধিরূপে আমাকে করিতে হইবে। পুণ্যফল, ভগবানের আদেশে আমি মনপ্রাণের সহিত, দেশকে দিয়া মহাপ্রস্থান করিব। বীজ কখনই নষ্ট হইবে না। একদিন ফল ফলিবেই।

এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর নাসিক, পঞ্চবটী, ত্রৈম্বক হইয়া বম্বে আসি। এবং জাহাজ পথে সমুদ্রে দ্বারকা যাই। তথা হইতে ৪০ ক্রোশ পথ সাতদিনে হাঁটিয়া পোর বন্দর বা সুদামপুরী আসি। তথা হইতে গীরনার পাহাড় সাত মাইল চড়াই বহু কষ্টে অতিক্রম করিয়া আবার বরোদা পথে বম্বে আসিয়াছি। এখন সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইব ইচ্ছা করিতেছি। একস্থানে অন্ততঃ ৫।৭ দিন না থাকিলে তোমাদের উত্তর পাইব না। পাইবার জন্য ইচ্ছা আছে। কাগজ কি বাহির হইল? সাম্বৎসরিক হইল কি? সুবিধা হইলে ঠিকানা দিব। শরীর মন বেশ চলিতেছে। তবে বড় পরিশ্রম করিতে হয় সময় সময়। জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। দাস।"

গ্রন্থ-সমালোচনা

হীরার কষ্টি—শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার—প্রণীত। ২২৪ পৃষ্ঠা মূল্য ১॥০।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্রন্থকারের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। বহু সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাসে গ্রন্থকার চরিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। পাঠকের মনে বেশ একটা সহজ সরল ভাব প্রবাহ ফুটাইবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের বিশেষত্ব।

আলোচ্য পুস্তকখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি ভালই হইয়াছে। বিষয় বর্ণনার যে চমৎকার শক্তি গ্রন্থকারের করায়ত্ত দেখিতেছি তাহাতে কোন কোন গল্পের প্লটগুলির দিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে ইহার প্রত্যেক চিত্রই নিখুঁত হইত। গল্পগুলির মধ্যে 'বড়বাবু' ও 'সুপারিশ' গল্প দুটী আমাদের খুব ভাল লাগিল।

"শ্রীগাল্পিক"

কুশদহের কামনা

অনেক বাধা বিপত্তি রোগ ভোগের হাত এড়াইয়া নবপর্য্যায় "কুশদহের প্রথম" বর্ষ শেষ হইল। নবপর্য্যায়ের "কুশদহকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত কল্প দেখিয়া অনেকেই ভয় পাইয়াছিলেন। এত রুগ্ন যে সন্তান, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ ধারণা যে পত্রিকা পরিচালনের ভার যাঁহাদের উপরে আছে তাঁহাদেরও কম ভয় দেখাইয়াছিল, তাহা নহে। তবে শ্বাসের সঙ্গে আশাটুকুকে সন্তর্পণে ধরিয়া থাকিতে কেবলমাত্র তাঁহারাই পারেন, রুগ্ন মরণোন্মুখ সন্তান যাঁহাদের একান্ত আপনার, একেবারেই নিজের!

কুশদহ-গৃহস্থ এই রুগ্ন মৃতকল্প কুশদহের একমাত্র প্রিয়জন। কুশদহ-সমিতি এই রুগ্ন শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আশা তাঁহারাই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কুশদহ-গৃহস্থ সন্তানটিকে, মায়ের মত বুকে চাপিয়া রক্ষা করিতেছেন। সাহসের দীপ্তি ফুটিয়াছে, চক্ষে আনন্দের জ্যোতিঃ দেখা দিয়াছে, ভয় নাই—সন্তান বাঁচিবে।

তবে বাঁচাইতে ঔষধ চাই। ব্যাধি কঠিন, চিকিৎসার প্রয়োজন। উত্তম পথ্যাভাব, পথ্য চাই। এত বড় সংসারের একমাত্র শিশু সে, কুশদহ গৃহস্থের একমাত্র সন্তান—কুশদহ সমিতির প্রত্যেক নরনারীর অন্নমুষ্টির উপরে তাহার পূর্ণ দাবী আছে। কুশদহ-গৃহস্থ সন্তানকে উপবাসী থাকিতে দিবেন না, মৃত্যুপাণ্ডু নেত্রে চাহিয়া কুশদহ তাহার এই দাবীই জ্ঞাপন করিতেছে। কুশদহ এক-মা-বাপের সন্তান নয়, সে কুশদহ-সমিতির যেখানে যত গ্রাম আছে, যত নর-নারী আছে—সে সকলের! সকলের উপর তাহার সমান দাবী, তাহার উপরে অধিকার সকলের সমান। এ-ঘরের হাসিটি ও-ঘরে ছড়াইয়া, দরিদ্রের দুঃখের কথা, দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া দেশের ও দশের কীর্ত্তি গৌরবের খবর দিয়া বেড়ানোই "কুশদহের" কাজ। কুশদহ একান্ত কুশদহ সমিতির মুখপত্র। কুশদহের দীর্ঘজীবনে সমিতির কল্যাণ, কুশদহের অকালমৃত্যু অভিশাপ। "কুশদহ" পত্র যেমন কৌশদহিক নর-নারীর গৌরব করিয়া থাকে, সন্তান দীর্ঘজীবি হইলে, সন্তান কীর্ত্তিমান হইলে সন্তানের গর্ব্ব করে না এমন জনক-জননীরও কল্পনা করাও ক্লেশদায়ক।

কুশদহের আজ সেই অবস্থা হইয়াছে। আজ সে সাহায্যের জন্য তাঁহাদেরই পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছে, যাঁহাদের সে ঘরের জিনিষ, কুশদহ পরিচয় যাঁহাদের কাছে গর্ব্বের বস্তু। অথচ তাহার কামনা একটী মুষ্টিমাত্র! তাঁহার ত স্বতন্ত্র দাবী নাই, বিলাস ভূষণের ব্যয়ভূষণ নাই, গৃহস্থেরই অন্নমুষ্টির সঙ্গে একটি মুষ্টি! কোন কুশদহবাসীই তাহার কামনা বিফল করিবেন না, করিতে পারেন না,—এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই "কুশদহ" এই বর্ষ বিদায় কালে কম্পিত কণ্ঠে বলিতেছে—রোগী বাঁচিবে।

"কুশদহ" তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হেলা করিবে না। বিনিময়ে সে কুশদহ সমিতির প্রত্যেকের কাছে তাহার প্রতি কর্ত্তব্যের দাবী করিতেছে। "কুশদহ" তাঁহাদের সহানুভূতি চায়। বর্ত্তমান বর্ষে যাঁহারা গ্রাহক ছিলেন তাঁহারা যে তাঁহাদের ঘরের সন্তানকে ত্যাগ করিবেন, আমরা ইহা কল্পনা করিতেও পারি না। তাঁহারা প্রত্যেকে যদি একজন গ্রাহক বা গ্রাহিকা করিয়া দেন, আগামী বর্ষের কুশদহ যে সুস্থ ও সবল দেহ হইয়া তাঁহাদের নয়ন মন রঞ্জন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আগামী বর্ষের "কুশদহ" যাহাতে সকলকেই সুখী করিতে পারে, সে চেষ্টা চলিতেছে—

ভাল গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি

যাহা অন্যান্য কাগজের বক্ষশোভা হইয়া প্রকাশিত হয়—কুশদহে তাহার অভাব ঘটিবে না। কুশদহ যাহাদের অন্নে পালিত, যাঁহাদের আনন্দে "কুশদহে"র আনন্দ, যাঁহাদের দুঃখে "কুশদহে"র বিষাদ—তাঁহাদেরই কাছে কুশদহ কামনা জানাইয়া ভবিষ্যতের আশায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিল।

Printed at the Sastraprachar Press. 5 Chidammodi Lane by
N. N. Mukerjee & Published by him from 87 Durga Charan Mitter St., Calcutta.